তাবলীগ জামাতের

সমালোচনা ও জবাব

মূল লিখক

শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাফেজ

মুহাম্মদ যাকারিয়্যা ছাহেব সাহারানপূরী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মাওলানা সাঈদ আল-মিসবাহ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা — ১২১১

অনুবাদকের অন্যান্য বই

সালামের ফযীলত

কিতাবুল হজ্জ

শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্দা

মুসলিম নারীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপদেশ

গোলামানে ইসলাম

বিপদ থেকে মুক্তি

অনুবাদকের আরয

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব গোষ্ঠীর হেদায়েতের লক্ষ্যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়েকটি দায়িত্ব প্রদান করে প্রেরিত করেছেন। সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল মানবজাতিকে গোমরাহী থেকে হিদায়েতের পথে আহবান করা। দ্বিতীয়তঃ তাদেরকে আল্লাহ পাকের যাবতীয় হুকুম আহকাম শিক্ষা দেয়া। তৃতীয়তঃ তাদের বাতেনী যাবতীয় রোগ ব্যাধির ইসলাহ করে তাদেরকে পুতঃপবিত্ররূপে গড়ে তোলা। চতুর্থতঃ তাদের মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা করা এবং শরীয়তের বিধান জারী করা। পঞ্চমতঃ প্রয়োজনে কাফেরদের মুকাবেলায় জেহাদে অবতীর্ণ হওয়া।

এককথায়, তিনি ছিলেন একাধারে দাঈ তথা মুবাল্লিগ, মুআল্লিম (দ্বীন শিক্ষা দানকারী) সমস্যার সমাধান বা ফতোয়া প্রদানকারী, মুসলিহ, সংস্কারক, কাযী বা বিচারপতি, রাষ্ট্রনায়ক ও সিপাহসালার মুজাহিদ। এগুলো সবই ছিল তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগুলোর প্রতিটিই অপরিহার্য।

পরবর্তী পর্যায়ে এ দায়িত্বগুলো আঞ্জাম দিতে গিয়েই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন, তাবলীগ জামাত, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

তাবলীগ জামাত

মূলতঃ তাবলীগ জামাত নতুন কোন দল বা সংগঠনের নাম নয় বরং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর সাহাবা কেরাম (রাঃ) থেকে নিয়ে প্রত্যেক যুগেই কমবেশী সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতের এ দায়িত্ব পালিত হয়ে আসছিল।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) ব্যাপক আকারে ও সংগঠিতরূপে সেটির পুনঃজাগরণের চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই যেমন কিছু কর্মধারা ও সূচী থাকে তিনিও তেমনি এই জামাতের জন্য কিছু কর্মধারা তৈরী করেছেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর এ আন্দোলন আশাতীত সার্থক ও সফল বলে বিবেচিত হয়েছে, যা সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এ

জামাতের কর্মধারার সাফল্য ও উপকারিতা জামাতের সঙ্গে বের না হয়ে উপলব্ধি করা মোটেই সম্ভব নয়।

মাদ্রাসা

শরীয়তের বিধিবিধান শিক্ষা দেয়া তথা ইলমের প্রচার প্রসারে মেহনত মুজাহাদা করা অন্যতম নববী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যারা আঞ্জাম দেন তারা হলেন আহলে ইলম। আর এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোই হল মাদ্রাসা।

বলাবাহুল্য এ 'মাদ্রাসা'ও শরীয়তে নতুন কোন সংযোজন নয়; বরং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই চলে এসেছে এর ধারা।

মসজিদে নববীর চত্বরে (সুফ্ফায়) কতক সাহাবা কেরাম (রাঃ) ইলম আহরণের জন্য সার্বক্ষণিক ইলম চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন, যাঁদেরকে আসহাবে সুফ্ফা নামে স্মরণ করা হয়। সেটাই ছিল ইসলামী ইতিহাসের প্রথম মাদ্রাসা।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) ছিলেন এই মাদ্রাসার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য ছাত্র, যার জীবনের সিংহ ভাগ কেটেছে ইলম আহরণে ও বিতরণে। আর এ মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

খানকাহ

বস্তুত উম্মতের ইসলাহ বা সংস্কার অর্থাৎ তাযকিয়া তথা বাতেনী রোগ ব্যাধির চিকিৎসার এটি অন্যতম নববী দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব যারা আঞ্জাম দেন তারাই হলেন হক্কানী পীর বা মাশায়েখ। শরীয়তের দৃষ্টিতে হক্কানী পীর মাশায়েখের গুরুত্ব সর্বাধিক।

তাবলীগ জামাতের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামসহ সর্বস্তরের ওলামা কেরামের কেউ এটির গুরুত্বকে হেয় বা ক্ষুণ্ন করেননি। এজন্যই তাবলীগী বয়ানগুলোতে হককানী পীরের অজীফা আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কোন জামাতে বিভিন্ন পীরের মুরীদ থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ পীরের বাতানো পদ্ধতিতে যিকির করতে বলা হয়।

তাছাড়া তাবলীগের মুরব্বীদের মধ্যেও অনেকেই হক্কানী পীর ছিলেন

এবং মুরীদ করতেন। যেমন, স্বয়ং মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ) প্রমুখ। তবে পীর হক্কানী হতে হবে।

সুতরাং বুঝা গেল, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দাওয়াত তাবলীগ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি কোনটিরই গুরুত্ব কম নয়। আল্লাহ না করুন দাওয়াতের এ আন্দোলন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে খুব অল্প সময়েই মাদ্রাসা ও খানকাহগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেননা, এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মাদ্রাসার তালেবুল ইলমদের উল্লেখযোগ্য অংশ এসেছে তাবলীগ জামাতের মেহনতের বদৌলতেই। কারণ এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, মানুষের মধ্যে দ্বীনী জযবা পয়দা হলেই দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ জন্মাবে। অন্যথায় তারা ইলম ও আহলে ইলমের ধারে কাছেও ভীড়বে না।

অনুরূপভাবে মাদ্রাসাগুলোর অবর্তমানে দ্বীনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। কারণ সহীহ ইলম ব্যতীত দ্বীনের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়। তদুপরি তাবলীগ জামাতের সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ স্বয়ং হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) দেওবন্দ মাদ্রাসারই সন্তান। আর এজন্যই হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) ও এ জামাতের অন্যান্য আকাবীর সর্বদা ওলামা কেরাম ও মাদারেসের অপরিহার্যতার কথা প্রকাশ করেছেন। যেমন, ৪ ও ৫ সমালোচনার জবাবে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ)-এর সুযোগ্য সন্তান তিনি নিজেও একটি মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষক ছিলেন। অন্যদিকে তাবলীগ জামাতেরও মুরব্বী ছিলেন।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর আচরণ ও উচ্চারণ থেকে যে কয়টি বিষয় বুঝে আসে তা হলঃ

[এক] মাদ্রাসা ও ওলামা কেরামের অপরিহার্যতার অনুভূতি তার মাঝে ছিল পূর্ণ মাত্রায়। তারপরও এ উক্তি কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, তাবলীগ জামাত কিংবা জামাতের মুরব্বীগণ মাদ্রাসা বিদ্বেষী। নিতান্ত কারো মুখে এ ধরনের কোন উক্তি বের হয়ে থাকলে সেটা নিছক তার ব্যক্তিগত অসতর্কতা ও অজ্ঞতা।

অনুরূপভাবে এ কথা বলাও সমীচীন নয় যে, আহলে মাদারেস তাবলীগ জামাত দেখতে পারে না। যদি তাই হয় তাহলে কি বলব যে, হযরত শায়খুল হাদীছ, হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এরাও তাবলীগ দেখতে পারেন না।

কেননা, তারাও তো মাদ্রাসার সাথে শুধু জড়িতই নন বরং মাদ্রাসার শিক্ষকও ছিলেন। অপরপক্ষে মাদ্রাসার অসংখ্য ওলামা কেরাম তাবলীগে অংশগ্রহণ করছেন কেন।

[দুই] তাবলীগ জামাতের সাথে মাদ্রাসার এবং মাদ্রাসার সাথে তাবলীগ জামাতের সম্পর্ক একই পাখীর দু'টি ডানার মত। একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোৎভাবে জড়িত।

[তিন] তিনি আহলে ইলম ও আহলে যিকির বলতে আহলে মাদারেস ও আহলে খানকাহকেই বুঝিয়েছেন।

সমালোচনা

এ কথা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই যে, নবী-রাসূল ছাড়া কেউ নিষ্পাপ নয়। কোন দল বা সংগঠন যতই উন্নত কর্মসূচীর ধারক বা বাহক হোক; তারা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সুতরাং তাবলীগ জামাতের সাথীদেরও যে কোন ভুলত্রুটি নেই এমনটি মোটেই নয়। এমনটি তবলীগ জামাতের মুরব্বীদের কেউ দাবী করেননি। বিশেষতঃ যখন এ জামাতের অধিকাংশই নতুন নতুন সাথী এবং গ্রাম্য অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। সুতরাং তাদের দ্বারা তো ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এও সত্য যে, এ ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করার জন্য মারকাজ থেকে সর্বদা জীবনপণ চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপরও কিছুটা ভুলত্রুটি অবশ্যই থেকে যায়। সেটার সংশোধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সেটাকে কেন্দ্র করে গোটা জামাতকে অভিযুক্ত করা এবং বিরূপ সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ে নেয়া মোটেই সমীচীন নয়।

তাবলীগ জামাতের বিরুদ্ধে যারা সমালোচনা করে থাকেন তারা কয়েক ধরনেরঃ

[এক] নিছক জেদের বশবর্তী হয়ে।

[দুই] কোন মুবাল্লিগ ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগত কোন কোন্দলের ভিত্তিতে।

[তিন] নিছক শোনা কথার ভিত্তিতে।

[চার] আকাবীর ও বর্তমান ওলামা কেরাম অনেকে ইসলাহের উদ্দেশ্যে সত্যিকার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন। যেমন, শায়খুল হাদীছ

সাহেব নিজেও অনেকের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অনেকে সেগুলোকে মূলধন ধরে সমালোচনা জুড়ে দেন।

অথচ সমালোচনার এ একটি পদ্ধতিও যুক্তি সঙ্গত নয়। তাই সকল সমালোচকদের খেদমতে আরয এই যে,

প্রথমতঃ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নিছক বিতর্কের মনোভাব না নিয়ে হযরত শায়খুল হাদীছের এই বইখানা পড়ুন।

দ্বিতীয়তঃ কিছু সময়ের জন্য এ জামাতের সাথে উঠাবসা করে নিজেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেষ্টা করুন।

তৃতীয়তঃ সমালোচনার দৃষ্টিতে নয়; বরং ইখলাসের সাথে কোন ভুলত্রুটি সংশোধন করার ইচ্ছা থাকলে মারকাযের মুরব্বীদের সাথে যোগাযোগ করুন। বই-এ প্রকাশ করার মত কোন প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে লিখুন।

জামাতের সাথী ভাইদের প্রতিও আরয এই যে, মারকায থেকে যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয় এবং জামাত রওনা হওয়ার সময় যে সব হেদায়েত দিয়ে দেয়া হয় সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনুন। নিজের মধ্যে আনতে চেষ্টা করুন। সাথীদের মধ্যে মুযাকারা করুন। মারকাযের মধ্যে বোর্ডে যেসব সতর্কবাণী টানিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন; তাহলে আর কারো কোন সমালোচনার সুযোগ থাকবে না।

কেউ কোন সমালোচনা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করলে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে তাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মারকাযের বয়ানে এনে বসিয়ে দেয়ার এবং তাশকীল করার চেষ্টা করুন।

আর এ কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, আমার কোন আচরণ উচ্চারণের কারণে যেন গোটা জামাত সমালোচনার পাত্র না হয়।

আল্লাহ পাক সকলকে আমল করার তৌফীক দান করুন। এ অনুবাদ কার্যে যাদের কাছে আমি ঋণী আল্লাহ পাক তাদের যথাযোগ্য জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন।

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربنا و رب الحق – و الصلوة على رسوله الذى خلق له الحق و على اله

و اصحابه الذى هم خير الحق

দাওয়াত ও তাবলীগের নামে হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)-এর এ সুবিশাল আন্দোলনের গোড়া থেকেই এ অধমের কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন, অভিযোগ-অনুযোগ আসা আরম্ভ হয়। আর তখন শরীরও যেহেতু সুস্থ ছিল তাই প্রতিটি পত্রেরই জবাব কম বেশী দিয়ে এসেছি।

আমার ধারণায় এ বিষয়ে অন্তত এক হাজার চিঠি লিখেছি। এর মধ্যে দু' একটি ছাড়া প্রায় সবগুলো একই ধরনের চিঠি ছিল। কিন্তু অধুনা কয়েক বছর যাবৎ বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে প্রতিটি চিঠির ভিন্ন ভিন্ন জবাব লেখানো আমার পক্ষে আয়াস সাধ্য হয়ে পড়েছে। তাই ইচ্ছা হল কতগুলো বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব পুস্তিকাকারে পাঠকের হাতে তুলে দেব।

তাছাড়া আরেকটি আশংকাবোধ করছি যে, হযরত থানুভী (রহঃ), হযরত হুসাঈন আহমদ মাদানী (রহঃ) প্রমুখ পূর্বসুরীদের অনেকেই বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে ভুল ধরিয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই সমালোচনার শিকার হয়েছেন যে, এরা তাবলীগ বিরোধী। সুতরাং আমার ব্যাপারেও এ ধরনের আশংকা হচ্ছে। কেননা, আমি নিজেও তাবলীগ জামাত ও তাবলীগ জামাতের মুরব্বীদের ভুলত্রুটির সংশোধন করে থাকি। বরং আমার বোকামীই বলুন কিংবা সৎসাহসই বলুন, শ্রদ্ধেয় চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর যুগে তাঁর ব্যাপারেও কোন প্রকার সমালোচনা করতে সংকোচবোধ করতাম না এবং তারপর স্নেহাষ্পদ হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) ও হযরত মাওলানা এনামুল হাসান (রহঃ) সহ অন্যান্য নতুন-পুরাতন মুরব্বীদের ব্যাপারেও ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। অনুরূপভাবে মক্কা, মদীনা, পাকিস্তান ও আফ্রিকার বন্ধু-বান্ধব এক

কথায় কাউকেই ছাড়িনি। সুতরাং আমার বহু চিঠিতেই সমালোচনা ও অভিযোগ অনুযোগমূলক উক্তি মিলবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তবে তাবলীগ জামাত সম্পর্কে অর্থহীন ও অনির্দিষ্ট কোন সমালোচনার প্রতি আমি কখনও কর্ণপাত করিনি। কেননা, এগুলো নিছক কথামাত্র। যেমন, দিল্লীর ওলামা কেরামের ব্যাপারে অনেকের অভিযোগ, তাঁরা সমালোচকদের সমালোচনাকে বাতাসের মত উড়িয়ে দেন; কোনই গুরুত্ব দেন না। এ ব্যাপারে আমি তো তাদের চেয়েও বেশী অগুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ হলে, তা যে কোন বড় ব্যক্তি সম্পর্কেই হোক না কেন, আমি তার প্রতিবাদ করতে এবং সতর্ক করতে কোন প্রকার ত্রুটি করিনি।

বুখারী শরীফে রয়েছে– হযরত উসামা (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, কতই না ভাল হত যদি আপনি হযরত উছমান (রাঃ)-এর সাথে এ ফিৎনাগুলো সম্পর্কে যা তাঁর আমলে দেখা দিচ্ছে আলোচনা করতেন। জবাবে হযরত উসামা (রাঃ) বললেন, তুমি কি বল, তাঁর সাথে আমার সব আলোচনা তোমার কাছেও বলে বেড়াই। নিভৃতে আমার সাথে তাঁর অনেক কথাই হয়ে থাকে। তবে আমি ফিৎনার বন্ধ দরজা খুলে দিতে চাই না।

যাহোক, আমারও আশংকা ছিল যে, আমার কোন সমালোচনা কিংবা সংশোধনমূলক কোন পত্রকে কেন্দ্র করে তাবলীগ বিরোধীরা এই অপপ্রচার না করে বসে যে, মাওলানা জাকারিয়া সাহেবও তাবলীগ পছন্দ করতেন না, যা মোটেই ঠিক নয়। কেননা, এ মুবারক আন্দোলনকে আমি এ যুগের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বের অধিকারী মনে করি। আমি নিজে মাদ্রাসা ও খানকার সাথে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করি যে, এ গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনটি কোন কোন ক্ষেত্রে মাদ্রাসা ও খানকা থেকে অধিক ফলপ্রসূ ও উত্তম।

যাহোক, তাবলীগ জামাত সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ

সমালোচনা– ১

জেহাদ সংক্রান্ত হাদীছগুলো তাবলীগ জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট করা।

তাবলীগী জামাতের বিরুদ্ধে সবচে' বড় অভিযোগ এই যে, এরা জেহাদ

সংক্রান্ত সকল হাদীছগুলো টেনে এনে তাবলীগের সফরের সাথে জুড়ে দেন। আরও মজার কাণ্ড এই যে, এ প্রশ্ন আহলে ইলমদের পক্ষ থেকেই বেশী এসেছে। বুঝেই আসে না যে, আহলে ইলম এ ধরনের প্রশ্ন কিভাবে করেন। কেননা, যদিও জেহাদ বলতে যুদ্ধ বিগ্রহই অধিক প্রচলিত, কিন্তু আভিধানিক অর্থে এবং কুরআন হাদীছের ব্যবহারে জেহাদ শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের সাথেই নির্দিষ্ট নয়; বরং মূলতঃ জেহাদ অর্থ আল্লাহর দ্বীন জিন্দা করার লক্ষ্যে চেষ্টা সাধনা করা। আর এ চেষ্টার সর্বশেষ ও অনন্যোপায় পথ হল যুদ্ধ-বিগ্রহ। যুদ্ধ-বিগ্রহই জেহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তফসীরে মাজহারীতে–

كتب عليكم القتال و هو كره لكم

এর ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ জেহাদ সকল আমল অপেক্ষা উত্তম হওয়ার কারণ হল, তা ইসলাম প্রচার ও মানব গোষ্ঠীর হেদায়েতের একটি কারণ। সুতরাং মুজাহিদের প্রচেষ্টায় যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে এ মুজাহিদও তাদের যাবতীয় নেক আমলের অংশীদার হবে।

এও মনে রাখতে হবে যে, যাহেরী ও বাতেনী ইলম শিক্ষাদানের ফযীলত এরচেও বেশী। কেননা, এর দ্বারাই ইসলামের প্রচার প্রসার বেশী হয়ে থাকে। এবার একটু বুকে হাত রেখে বলুন তো; সম্প্রতি তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে হেদায়েতের যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে তা অস্বীকার করার কোন জো আছে কি? এঁদের মেহনতের উসীলাতেই কি হাজার হাজার বরং লাখো লাখো বে-নামাযী পাক্কা নামাযী বনে যাচ্ছেন না? এঁদের প্রচেষ্টাতেই তো আজ শত শত অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে (গীর্জাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে মসজিদ বানানো হচ্ছে।)

জেহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ অধমের গ্রন্থ 'আওযাজুল মাসালেক' ও 'লা-মেউদ্‌দারারির' টীকায় আলোচিত হয়েছে। জেহাদের আভিধানিক অর্থ হল, কষ্ট সহ্য করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ বলতে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহসহ নফস, শয়তান ও ফাসেক, ফাজেরদের সাথে মুজাহাদা করা সবগুলোকেই বুঝায়। আর কাফিরদের সাথে জেহাদ হাতের সাহায্যে, মুখের সাহায্যে ও অর্থের বিনিময়ে বিভিন্নভাবে হতে পারে। এ সবগুলো অর্থেই কুরআন ও হাদীছের বিভিন্ন জায়গায় জেহাদ শব্দটি

ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

المجاهد من جاهد نفسه

"প্রকৃত মুজাহিদ যে নফসের সাথে জেহাদ করে।"

[হাদীছখানা ইমাম বায়হাকী রচিত শি'আবুল ঈমান গ্রন্থের বরাতে মিশকাত শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।]

ইবনে আরাবী তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ সুফিয়া কেরামের মতে নফসের সাথে জেহাদই হল, জেহাদে আকবর তথা বড় জেহাদ। আর পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে و الذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে– শত্রুর মুকাবেলায় যে জেহাদ করে সে প্রকৃত মুজাহিদ নয়; বরং প্রকৃত মুজাহিদ হল যে, ঐ দুশমনের সাথে জেহাদ করে যে দুশমন সর্বদা তার সাথে রয়েছে।

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ইরশাদ করলেন,

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।[১]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এখানে জেহাদে আকবর বলতে তরবারীর যুদ্ধ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়।

তাতে এও রয়েছে যে, আল্লামা রাযী (রহঃ) লিখেছেন, 'সাবিলুল্লাহ (আল্লাহর পথ) বলতে সকল নেক আমলকেই বোঝায়।

হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ) 'আত্তাশাররুফ বি মা'রিফাতি আহাদীছিত্ তাসাউউফ' গ্রন্থে তাফসীরে রুহুল মাআনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি

১। এ হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'লা-মিউদ্দারারি'-এর টীকায় দেখা যেতে পারে।

পবিত্র কুরআনের আয়াত–

و جاهدوا فى الله حق جهاده ،

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত জাবের (রাঃ)-এর একটি রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি জামাত যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের আগমন অত্যন্ত শুভ। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে প্রত্যাবর্তন করলে। এসব রিওয়ায়েতগুলোতে সনদগত কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও প্রথমতঃ ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তা ক্ষমার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ বহুল সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এই দুর্বলতা ক্ষমার যোগ্য।

ওলামা কেরাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, নামায-রোযা প্রভৃতি ফরয ইবাদতগুলো মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে জেহাদ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, ঈমান ও নেক আমল প্রতিষ্ঠাই জেহাদের মূল উদ্দেশ্য।

'লা-মিউদ্দারারি'র টীকায় আল্লামা ইবনে আবেদীনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, এতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নিয়মিত যথাসময়ে ফারায়েযের আদায় জেহাদ অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এগুলো ফরযে আইন; আর জেহাদ ফরযে কেফায়া। তাছাড়া ঈমান ও নামায প্রতিষ্ঠার জন্যই জেহাদ জায়েয করা হয়েছে (অন্যথায় নিছক মারামারি, কাটাকাটি বৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই)। সুতরাং বুঝা গেল জেহাদ সত্ত্বাগতভাবে নয়; বরং কারণবশতঃ উত্তম। অপরপক্ষে নামায-রোযা ইত্যাদি স্বত্ত্বাগতভাবেই নেক আমল ও উত্তম। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নামায প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে কোন প্রচেষ্টাই করা হবে তা উত্তম জেহাদ বলে পরিগণিত হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) জুমআর নামাযের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত আবু আবাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে–

من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرم الله على النار

আল্লাহর পথে যার পা দু'টি ধূলিধূসরিত হবে, আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দিবেন।

একটু ইনসাফের সাথে বলুন তো; ইমাম বুখারী (রহঃ) যদি এই হাদীছখানা জুমআর নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে টেনে আনতে পারেন তাহলে তাবলীগী ভাইদের আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে ঘুরাফিরার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীছ পেশ করাতে অপরাধটা কোথায়?

হযরত দেহলুভী (রঃ) (অর্থাৎ, মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইরশাদ করেন, তাবলীগী সফরে যুদ্ধ বিগ্রহের সফরের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এ সফরেও যুদ্ধ সফরের মতই পূর্ণ ছওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। এ সফরে যুদ্ধ না থাকলেও জেহাদের একটি অংশ অবশ্যই রয়েছে, যা কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ অপেক্ষা কম হলেও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ অপেক্ষা উর্ধ্বে। যেমন, যুদ্ধের সময় রাগ দমন করতে হয়, এখানেও একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাগ-ক্রোধ দমন করতে হয় এবং তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে তাদের খোশামোদ, তোষামোদ করতে হয়। এরচে' অপদস্থতা আর কি হতে পারে?

"জেহাদে গোস্‌সা (ক্রোধ) দমন করতে হয়" হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর এ বক্তব্যটি বুখারী শরীফে হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক রিওয়ায়েত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি এসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, অনেকে গনীমত লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। আর অনেকে বল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লড়াই করে (এদের কার যুদ্ধ আল্লাহর জন্য বলে গণ্য হবে?)। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যে জিহাদ একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে হয়ে থাকে সেটাই প্রকৃত 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'।

হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, "আল্লাহর কালিমা" অর্থ ইসলামের দিকে আহবান।[১]

১। হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) আরও বলেন, আলোচ্য হাদীছে যেসব কারণে মানুষ জিহাদ করে থাকে বলে বলা হয়েছে তার মধ্যে 'রিয়া' (লোকদেখানো) ও প্রসিদ্ধি অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় (সাম্প্রদায়িকতার জন্য)ও এসেছে। আর এক রিওয়ায়েতে يقاتل غضبا (রাগের বশতর্তী হয়ে) এভাবে সবগুলো রিওয়ায়েতকে একত্রিত করলে মোট পাঁচটি উদ্দেশ্য হয়।

স্বয়ং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক এমন বিভিন্ন আমলকে জেহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা আলিম সম্প্রদায়ের অজানা নেই। যেমন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ইসলামী সীমান্তে রাত্রি জাগরণ দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তদপেক্ষা উত্তম। আর বলা বাহুল্য যে, সীমান্তে অবস্থান ইসলামের হেফাযতের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন গাযী (ইসলামী যুদ্ধে গমনকারী)-কে তার প্রয়োজনীয় সামান যুগিয়ে সহযোগিতা করবে, সেও গাযী বলে গণ্য হবে। আর যে তার অবর্তমানে তার পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে, সেও গাযী বলে গণ্য হবে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাবাহিনী প্রেরণকালে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের প্রত্যেক দু'জনের একজন যুদ্ধে বের হবে (অপরজন তার পরিবার পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে) এতে উভয়ে সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে।

বলাবাহুল্য, এসব সেনাবাহিনী নিছক মারামারি কাটা-কাটির জন্য প্রেরণ করা হত না। ঈমানের দাওয়াতই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। যেমন বুখারী শরীফে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলী (রাঃ)-কে ঝাণ্ডা হাতে দিয়ে খায়বর বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন, হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, হুজুর! যেয়েই কি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিব, যাতে তারা মুসলমান হয়ে যায়? ইরশাদ করলেন, কস্মিন কালেও নয়; বরং সেখানে গিয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তোমার প্রচেষ্টায় একজন লোকও যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে তা তোমার জন্য (গনীমতের) অনেকগুলো লাল উট অপেক্ষাও উত্তম। আর যদি তারা অস্বীকার করে, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে 'কর' আদায় করার প্রতি উদ্বুদ্ধ কর। এতেও যদি তারা সম্মত না হয়, তবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

এ ছাড়াও বিভিন্ন রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত জেহাদেও নিছক যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয়; বরং এতেও ঈমানের প্রতি আহবান ও আল্লাহর কালিমা

বুলন্দ করা উদ্দেশ্য।

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) নাটোরায় ওলামা কেরামদের বিশেষ মজলিসে এক বয়ানে বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে যেসব প্রতিনিধিদল ও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন সবগুলো দাওয়াতের উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছিলেন।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২৩টি আর এক রিওয়ায়েত মতে ৩৯টি।[১]

এর মধ্যে নয়টি সম্পর্কে লিখা হয়েছে بعث مقا تلا (যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছেন) অবশিষ্ট সব কয়টির ব্যাপারে লিখা হয়েছে যে, দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফী আযীযী)

সত্যি আশ্চর্য হয় যে, ওলামা কেরাম কি করে 'ফী সাবিলিল্লাহ' শব্দটিকে যুদ্ধের সাথে নির্দিষ্ট করেন, অথচ কুরআন ও হাদীছে এর ব্যাপকতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন পবিত্র কুরআনের আয়াত انما الصدقات للفقراء এতে 'ফী সাবীলিল্লাহ'-র ব্যাখ্যায় ওলামা কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আওজাযুল মাসালেকের তৃতীয়খণ্ডে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে। যেমন, আল্লামা রাজী (রহঃ)-এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে জেহাদ করা। ইমাম মালেক প্রমুখ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মত হল, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সকল নেক আমল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রচেষ্টাই এর অন্তর্ভুক্ত।

মিশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, একবার জনৈক সাহাবী এসে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সাহাবী আরয করলেন, জি হ্যাঁ; জীবিত আছেন। ইরশাদ করলেন, তবে তাঁদের মধ্যেই জিহাদ করো। অর্থাৎ, তাঁদের খেদমত কর। লক্ষ্য করুন; এখানে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১। এখানে সংখ্যা লিখতে গিয়ে কাতেবের ভুল হয়ে গিয়েছে। সঠিক সংখ্যা হবে ১৯ আর ২৭।

পিতা-মাতার খেদমতকেও জিহাদ বলে আখ্যায়িত করছেন।

মিশকাত শরীফে হযরত খুরায়েম বিন ফাতেক (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি কোন কিছু খরচ করে, তা বৃদ্ধি পেয়ে সাত শ' গুণে পরিণত হয়।

মোটকথা, এসব রিওয়ায়েতগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহর রাস্তা বলতে শুধু যুদ্ধ বিগ্রহই বুঝায় না। তাহলে তাবলীগী সফরে খরচ করার ফযীলত প্রসঙ্গে এ হাদীছগুলো পেশ করাতে অপরাধটা কি হল? অনুরূপভাবে আর একটি হাদীছে হযরত আলী, আবুদ্ দারদা, আবু হুরায়রাহ, আবু উমামাহ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আমর, জাবের বিন আব্দুল্লাহ ও ইমরান বিন হুসাঈন (রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাড়ী বসে থেকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দিবে সে প্রতিটি দিরহামের পরিবর্তে সাত শ' দিরহাম লাভ করবে। আর যে স্বয়ং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে বের হয়ে খরচ করবে সে সাত লক্ষ দিরহামের ছওয়াব লাভ করবে। কোন সন্দেহ নেই যে, তাবলীগী সফর এবং মাদ্রাসার চাঁদা এর অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরে মাযহারীতে

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

الجهاد او غير ذلك من ابواب الخير

জিহাদ ও অন্যান্য নেক আমল।

অনুরূপভাবে

الذين احصروا فى سبيل الله

এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে–

فى تحصيل العلوم الظاهرة

অর্থাৎ সাবীলুল্লাহ অর্থ যাহেরী ও বাতেনী ইলম অর্জন।

মিশকাত শরীফে তিরমিযী ও দারিমীর সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য ঘর থেকে বের হবে, সে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় আছে বলেই গণ্য হবে।

মিশকাতের টীকায় লিখা রয়েছে, "অর্থাৎ যে ইলম অন্বেষণের জন্য বের হয়, সে জেহাদে বের হওয়ার ছওয়াব পায়। কেননা, তালেবুল ইলমও মুজাহিদের ন্যায় দ্বীন জিন্দা করার জন্য এবং শয়তানকে অপদস্থ করার জন্য সাধনা করে এবং বিভিন্ন দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এসব কিছু তাবলীগের সফরেও পাওয়া যায়।

'এতেদাল' গ্রন্থে এ ধরনের রিওয়ায়েত প্রচুর পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, উত্তম জিহাদ হল জালিম বাদশাহর সামনে হক কথা বলা। আর জালিম বাদশাহ কাফির হওয়া আবশ্যক নয়, বরং জালিম বাদশাহ মুসলমান হলেও তার সামনে হক কথা বলা এ হাদীছের আওতাভুক্ত হবে। তবে প্রধানশর্ত হল, এসব চেষ্টা সাধনা একমাত্র আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। যেমন ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে।

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে, প্রকৃত জিহাদ হল, যা একমাত্র আল্লাহ পাকের নাম বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে করা হয়। 'এতেদাল' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

১৩২৮ হিজরী সালে মাযাহেরুল উলূম মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণকালে চাঁদার আবেদন করে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর লিখা এবং হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) ও হযরত শাহ আব্দুর রহীম (রহঃ)-এর সত্যায়িত একখানা পত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। মাওলানা লিখেনঃ

"আমি এ বিষয়ে একমত যে, মাদ্রাসার ছাত্রাবাস এই মুহূর্তে 'বাকিয়াতে সালেহাত' (অর্থাৎ সদকায়ে জারিয়া)-র অন্যতম একটি খাত। সহী হাদীছে মৃত্যুর পর যে সব আমলের ছওয়াব বরাবর জারী থাকে বলে বলা হয়েছে। সেসব আমলের মধ্যে মুসাফিরের জন্য ঘর নির্মাণ করা'ও উল্লেখ রয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তালেবুল ইলমগণও নিঃসন্দেহে মুসাফির; বরং উত্তমতম মুসাফির।

কেননা, এরা আল্লাহর রাস্তার মেহমান। সুতরাং সাধারণ মুসাফির এর সাহায্যই যদি এতটুকু ফযীলতপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর রাস্তার মেহমানদের খেদমতের ফযীলত কতটুকু হবে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আল্লাহর রাস্তার সকল খাতে এবং বিশেষতঃ ইলমের দৈন্যতার এ আশংকাজনক মুহূর্তে বিশেষ এই খাতে দান করা সবচে' বেশী ফযীলতের কাজ। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই মুহূর্তে ছাত্রাবাস নির্মাণ সর্বোত্তম 'বাকিয়াতে সালেহাত'। আশা করি সকল মুসলমান ভাই সাধ্যানুযায়ী এ সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না এবং কম-বেশী অবশ্যই এতে অংশগ্রহণ করবেন।

ওয়াস্‌সালামু আলা মানিত্‌তাবায়াল হুদা"

বান্দা আশরাফ আলী থানুভী

সত্যায়ণ

নিঃসন্দেহে হযরত আশরাফ আলী থানুভী যা কিছু লিখেছেন, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সংগত।

বান্দা আব্দুর রহীম (উফিয়া আনহু)

সত্যায়ণ

মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী যা কিছু লিখেছেন তা সত্য ও নির্ভুল।

বান্দা মাহমুদ (উফিয়া আনহু)

এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়াকে শুধু প্রচলিত জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত করেন তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' শুধু প্রচলিত জিহাদের মধ্যে সীমিত নয়। তফসীরে মাজহারীতে قل قتال فيه এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে سبيل الله অর্থ الاسلام ইসলাম ও আনুগত্য লিখেছেন। এ ছাড়াও উক্ত তফসীর গ্রন্থে অসংখ্য জায়গায় আল্লাহর রাস্তা বলতে 'আল্লাহর আনুগত্য করা' বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্যে বাধা দানকারীদের সাথে সামর্থ্য থাকলে এবং কোন ফিৎনার আশংকা না থাকলে কঠোরতা করাতে কোন ক্ষতি নেই।

আমার সবচে' বেশী আশ্চর্য হয়, উপরোক্ত তিন বুযুর্গের অনুসারীদের মুখ থেকে যখন তাবলীগী জামাতের লোকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শুনি যে, "এরা আল্লাহর রাস্তার হাদীছগুলো তাবলীগে সময় লাগানোর সাথে এনে জুড়ে দেন। অথচ আল্লাহর রাস্তা অর্থ শুধু জিহাদ"।

যাহোক, এই অধমের দৃষ্টিতে আল্লাহর রাস্তার ফযীলত সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদীছের সাথে প্রচলিত তাবলীগের সফরকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়াতে আপত্তির কিছু নেই এবং আমার এই ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে কোন মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরের উক্তিতেই আল্লাহর রাস্তা শব্দটি শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত বলে পাইনি। তাই তাবলীগী ভাইদের প্রচলিত তাবলীগে সময় লাগানোর ফযীলত বয়ান প্রসঙ্গে এসব আয়াত ও হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করা অসংগত নয়।

এই বিষয়টি যৌবনকালে অসংখ্য পত্রের জবাবে লিখিয়েছি।

সমালোচনা- ২

তাবলীগী জামাতের প্রচলিত পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গেও আমার কাছে বহু পত্র এসেছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এভাবে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে জামাত প্রেরণের প্রচলন ছিল না। তখন জামাত কাফেরদের জন্যই পাঠানো হতো। সুতরাং এ পদ্ধতি বিদআত বৈ কিছুই নয়। এ প্রশ্নেরও অসংখ্য জবাব আমি লিখেছি। এ প্রশ্নটিও আলিমদের মুখে শুনলে আমার খুব আশ্চর্য হয়। এ কথা কারও অজানা নেই যে, 'আমর বিল মা'রুফ নেহী আনিল মুনকার' অবশ্য পালনীয় একটি বিষয়। তাছাড়া ইতিপূর্বের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে, দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে যে কোন প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এরপরও এ উক্তি করা যে, "এ পদ্ধতি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল না" প্রথমতঃ মোটেই ঠিক নয়। যেমন, পরবর্তী আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে।

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এ প্রচলন ছিল না, তবুও এ কথা স্বীকৃত যে, শরীয়তের কোন নির্দেশ

পালনের জায়েয মাধ্যমগুলোও নির্দেশের আওতাভুক্ত। যেমন ধরুন বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি, খানকার যাবতীয় কার্যক্রম, বই পুস্তক রচনা, টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার এসব প্রচলন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আবশ্যকীয় ও শরীয়ত সম্মত। কিন্তু বলুন তো; এসব পদ্ধতিগুলো ঠিক এভাবে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল কি? অনুরূপভাবে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তোপ কামানের যুদ্ধ ছিল না বলে এগুলোকে বিদআত বলে দিয়ে কাফেরদের জঙ্গীবিমান আর রাসায়নিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মত বোকামী কি কেউ করবে?

উপরন্তু, এ কথা মোটেই ঠিক নয় যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মুসলমানদের জন্য এভাবে জামাত প্রেরণের প্রচলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা ইউসূফ (রহঃ) প্রণীত হায়াতে সাহাবা গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অধীনে একাধিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও মুসলিম সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বিভিন্ন জামাত প্রেরণ করা হত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু' একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

হযরত আসিম বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমল ও কারাহ গোত্রের কতক লোকের অনুরোধে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানকার মুসলমানদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য ছয়জনের একটি জামাত প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ইরশাদ করেন যে, প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায ও আবু মূসা (রাঃ)-কে ইয়ামান প্রদেশের লোকেদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসার (রাঃ) বলেন, একবার পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়েস গোত্রীয় এক সম্প্রদায়কে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। সেখানে গিয়ে আমি তাদেরকে জংলী উটের মত দেখতে পেলাম। উট আর ছাগল ছাড়া তারা যেন আর কিছুই বুঝে না। আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাদের এ দুরবস্থার কথা জানালাম। তিনি ইরশাদ করলেন, আম্মার! এর চেয়েও আশ্চর্যের

কথা শুনবে কি? তারা হল এমন এক সম্প্রদায় যারা দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দ্বীন থেকে উদাসীন থাকবে। যাহোক এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনা হায়াতে সাহাবা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

আর এ কথাও স্পষ্ট যে, কাফেরদের কাছেও জামাত তাদের হেদায়েতের জন্যই প্রেরণ করা হত। আর এও জানা কথা যে, অধুনা মুসলিম সম্প্রদায় দ্বীন ও হেদায়েত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুফরির পর্যায় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার থেকেও অধম হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে হেদায়েতের দিকে আহবান করারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর মালফুযাতে তাঁর একটি ইরশাদ উল্লেখিত রয়েছে যে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতপূর্ব দাওয়াতের আমল অর্থাৎ 'লোকদের দুয়ারে দুয়ারে যাওয়া' মদীনা পৌছার পর অনীবার্য কারণে অব্যাহত থাকেনি। বরং সেখানে গিয়ে তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু এটি কখন হয়েছিল? যখন মক্কী জীবনের এ দাওয়াতের আমল সামলে নেয়ার মত এবং তা সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার মত এক বিরাট জামাত তৈরী হয়ে গিয়েছিল এবং তখন পরিস্থিতির দাবী ছিল যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসে এ কাজকে আঞ্জাম দেবেন এবং অন্যদের দ্বারা কাজ নিবেন। আর এর ভিত্তিতেই হযরত উমর (রাঃ)-এর জন্য মদীনায় অবস্থান করা তখনই সংগত ছিল যখন রোম ও ইরানে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তখন পরিস্থিতির দাবী ছিল যে, একজন শাসক মারকাযে বসে এ হক্বের দাওয়াত ও আল্লাহর পথে জেহাদের পূর্ণ বিষয়টি পরিচালনা করবেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুভী (রহঃ)-এর ভাগ্নে হযরত মাওলানা জাফর আহমদ থানুভী (রহঃ) হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর শেষ বয়সে তার ইয়াদত (অসুস্থতার সময় খোঁজ খবর নিতে) গেলেন। ইতিপূর্বে তিনি তার সাথে নিজামুদ্দীনে এক চিল্লা দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তাকে সে অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, আপনার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ আছে কি? এ কথার উপর তিনি হযরতের মৃত্যু পর্যন্ত নিযামুদ্দীনেই অবস্থান করেন। হযরতের তখন কঠিন অসুস্থতার কারণে

একাধারে দীর্ঘ সময় কথা বলা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

একবার হযরত বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রথম যুগে যখন দ্বীন ছিল অত্যন্ত দুর্বল, দুনিয়া ছিল শক্তিশালী, তখন অনাগ্রহী লোকেদের ঘরে ও মজলিশে গিয়ে তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। তাদের পক্ষ থেকে আহবানের অপেক্ষা করতেন না। অনেক সময় সাহাবা কেরামকে নিজে থেকেই তাবলীগের জন্য বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। তখনকার মত এখনও গোটা সমাজে ঈমান ও আমলের দৈন্যতা বিরাজ করছে। সুতরাং আমাদেরও অনাগ্রহী লোকদের কাছে অনুরূপভাবে মুলহিদ ও ফাসেকদের সমাবেশে গিয়ে হক কথা বুলন্দ করতে হবে (এ কথা বলার পর হযরত মাওলানার পীড়া বেড়ে গেলে আর কথা বলতে পারছিলেন না)। তখন মাওলানা জাফর আহমদকে লক্ষ্য করে বললেন, মাওলানা! আপনি আমার কাছে বিলম্বে পৌছেছেন। এখন তো বিস্তারিত কিছু বলাও আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। যাহোক যা কিছু বললাম এতটুকুই গভীরভাবে প্রণিধান করতে চেষ্টা করুন।

(মলফুযাতে দেহলুভী)

বস্তুত, হাদীছ ও সীরাতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অভাবেই মানুষ এ ধরনের উক্তি করে থাকে। অন্যথায় যেমন এই কেবল বলে এসেছি যে, হায়াতে সাহাবায় এ যাতীয় বহু ঘটনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য জামাত প্রেরণ করা হত। আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দলের ঘটনা তো সকল হাদীছ গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ।

ঘটনার বিবরণ হলঃ তারা এসে আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ও আপনার মাঝে 'মুযার' গোত্র অন্তরায় হয়ে আছে। সুতরাং আমরা একমাত্র পবিত্র মাসগুলোতেই আপনার কাছে আসতে পারি। তাই আপনি আমাদের ঈমান সংক্রান্ত এমন কিছু বিষয় বলে দিন যার উপর আমল করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি এবং ফিরে গিয়ে আমাদের সম্প্রদায়কেও জানিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চারটি বিষয়ের নির্দেশ করলেন। আর চারটি বিষয় থেকে বারণ করলেন। যার বিস্তারিত বিবরণ ৬ নং প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে আসবে।

মুসনাদ তায়ালসীর বর্ণনায় এই ঘটনাটিতে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা গিয়ে তোমাদের সম্প্রদায়কে এসব বিষয়ে দাওয়াত দিবে। (হায়াতুস্ সাহাবা)

হায়াতুস্ সাহাবাতেই মুসতাদরাক ইমাম হাকেমের বরাতে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আল-কামাহ বিন হারিছ বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের সাত ব্যক্তিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? আমরা আরয করলাম, আমরা মুমিন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সব বিষয়েরই হাকীকত থাকে। বলত, তোমাদের ঈমানের হাকীকত কি? আমরা আরয করলাম, পনেরটি জিনিস, যার পাঁচটি আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আর পাঁচটি আপনার দূতের মাধ্যমে পেয়েছি।

হাদীছটি সুদীর্ঘ তবে এখানে আমার এতটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক মারফত অনেক সময় বিভিন্ন নির্দেশ প্রেরণ করতেন।

বিখ্যাত ইতিহাস ও সীরাত বিশারদ মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) কর্তৃক প্রণীত সাওয়ানেহে দেহলুভীর ভূমিকা থেকে কিছু অংশ হযরত সৈয়দ সাহেবের আলোচনা প্রসঙ্গে সামনে আসছে। এতে তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দাওয়াতের উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলোর একটি হল, 'আরজ' অর্থাৎ কারো আগমনের অপেক্ষা না করে তিনি এবং তার অন্যান্য দায়ীরা নিজেই লোকদের কাছে পৌছে যেতেন। এমনকি অনেক সময় লোকদের বাড়ী বাড়ী পর্যন্ত হকের দাওয়াত নিয়ে পৌছে যেতেন (এ আলোচনা বেশ দীর্ঘ যা সামনে আসছে)।

যাহোক, এরপর তিনি বলেন, এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, দায়ী এবং মুবাল্লেগের জন্য আবশ্যক, নিজেই লোকদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে হকের দাওয়াত পৌছানো। (মুকাদ্দামা সাওয়ানেহে হযরত দেহলুভী)

একবার দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তো দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে কাফেরদের কাছে যাওয়া হত। এখনকার মত এভাবে

মুসলমানদের কাছে জামাত যাওয়ার কোন প্রমাণ কি হাদীছ শরীফে আছে? থাকলে কিতাবের হাওয়ালাসহ লিখুন। জবাবে মুফতী সাহেব লিখেছেন, ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহাবা কেরাম দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কুফা ও 'কারকীসিয়া' গমন করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মা'কিল বিন ইয়াসার ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রহঃ) প্রমুখের এক জামাত সিরিয়ায় প্রেরণ করেছেন। এসব জামাত মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করেই প্রেরিত হয়েছিল। [ইযালাতুল খাফা]

বিস্তারিত জানার জন্য হযরত মুফতী সাহেব রচিত 'কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হাঁয়?' দেখা যেতে পারে।

সমালোচনা– ৩

মাদ্রাসা ও খানকার প্রয়োজনীয়তার অস্বীকার

এ প্রশ্নও বেশ শুনা যায় যে, তাবলীগী জামাতে মাদ্রাসা ও খানকাকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করা হয়। আমার ধারণায় এ প্রশ্নের মূল উৎস তাবলীগী জামাত সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা চিত্তের অনুদারতা। অন্যথায় তাবলীগী জামাতের মূল ছয়টি উসূলের একটি অন্যতম উসূল হল ইলম ও যিকির। তাছাড়া এ জামাতের উদ্যোক্তা হযরত দেহলুভী (রহঃ) এবং তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এ বিষয়ের প্রতি যতটা গুরুত্বারোপ করতেন আর কোন বিষয়ের প্রতি এরূপ করতেন বলে আমার জানা নেই। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর এ বক্তব্য তো সুপ্রসিদ্ধ যা তিনি প্রায় বলতেন যে, আমার এ আন্দোলনের জন্য ইলম ও যিকির দু'টি ডানা তুল্য; তার একটিও ভেঙ্গে গেলে পাখীর জন্য উড়া মুশকিল।

এ সমালোচকরা যদি হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মাওঃ ইউসুফ (রহঃ)-এর জীবনী ও তাঁদের মলফূযাত দেখার শ্রমটুকু স্বীকার করতেন, তাহলে হয়ত তাদের কলম ও কালাম থেকে এ ধরনের উক্তি বের হত না। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর মলফুযাতে রয়েছে–

১। হযরত থানুভী (রহঃ)-এর ভাগনে হযরত মাওঃ যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) তাঁর নিযামুদ্দীন অবস্থানকালে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর যে মালফুযাত

লিপিবদ্ধ করেছিলেন যা হযরতের মলফুযাতেও সংকলিত হয়েছে; তাতে তিনি একবার বলেন, আমার এ আন্দোলনে ইলম ও যিকিরের গুরুত্ব অনেক বেশী। ইলম ছাড়া না আমল হতে পারে আর না আমলের পরিচয় লাভ হতে পারে। আর যিকির ছাড়া ইলমের নূর হাসিল হতে পারে না; বরং যিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার বৈ কিছুই নয়। (হযরত মাওঃ যাফর আহমদ (রহঃ) বলেন,) আমি বললাম, হযরত! স্বয়ং তাবলীগই তো একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সুতরাং তাবলীগ করতে গিয়ে ইলমের পরিমাণ যদি কিছুটা কমে যায় তবে তার দৃষ্টান্ত তো এরূপ যেমন, হযরত সৈয়্যদ সাহেব বেরুলুভী (রহঃ) যখন জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন তখন তিনি তাঁর কর্মীদের যিকির আযকারের পরিবর্তে যুদ্ধ প্রশিক্ষণে ব্যস্ত করে দিলেন। এতে অনেকে আপত্তি তুলল যে, হযরত এ সময় পূর্বের ন্যায় নূর পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হযরত বেরুলুভী (রহঃ) জবাব দিলেন, হ্যা এখন যিকিরের নূর নেই ঠিকই কিন্তু জিহাদের নূর অবশ্যই রয়েছে। আর এই মুহূর্তে এরই তীব্র প্রয়োজন রয়েছে।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) বললেন, এরপরও আমার ইলম ও যিকিরের দৈন্যতার কারণে অস্থিরতা অনুভব হচ্ছে। আর এ দৈন্যতার কারণ হল, এখন পর্যন্ত আহলে ইলম ও আহলে যিকির এতে অংশ গ্রহণ করছেন না। এরা যদি এ কাজ সামলে নিতেন তাহলে এ ঘাটতি পূরণ হয়ে যেত। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ জামাতে আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের সংখ্যা অনেক কম।

ব্যাখ্যা ঃ এখন পর্যন্ত যেসব জামাত বাইরে পাঠানো হয় এতে আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের সংখ্যা নেই বললেই চলে। যার কারণে হযরত অস্থির ছিলেন। আহলে ইলম ও আহলে যিকির যদি এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করতেন তা হলে কতই না ভাল হত।

অবশ্য আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে মারকাযে আহলে ইলম ও আহলে নিসবত (আল্লাহওয়ালা) রয়েছেন। কিন্তু এদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এরা যদি মারকায ছেড়ে বাইরে চলে যান, তাহলে মারকায সামলানোর লোক থাকে না। [মালফুযাত]

২। একদিন ফযরের পর নিযামুদ্দীনের মসজিদে পুরাতন সাথীদের বিশাল এক মাজমা'আ ছিল। হযরত মাওলানা শারীরিকভাবে তখন এত দুর্বল ছিলেন যে, শুয়ে শুয়েও উচ্চস্বরে কিছু বলার মত সামর্থ্য ছিল না। তাই একজন বিশেষ খাদেমকে তলব করে তার মাধ্যমে পুরা মাজমাআকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের এ নকল-হরকত, চেষ্টা-সাধনা বিফল যাবে যদি আপনারা ইলম ও যিকিরের প্রতি পূর্ণভাবে মনোনিবেশ না করেন। বরং এ দু'টি বিষয়ে অবহেলা করলে এ সকল সাধনা ফিৎনা ও গোমরাহীতে পরিণত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে।

ইলমে দ্বীন ছাড়া ইসলাম ও ঈমান নিছক নাম ও আনুষ্ঠানিকতা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহর যিকির ছাড়া ইলম নিরেট অন্ধকার। অনুরূপভাবে ইলমে দ্বীন ছাড়া প্রচুর পরিমাণে জিকিরেও মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে।

মোটকথা, যিকিরের মাধ্যমে ইলমে নূর আসে আর ইলমে দ্বীন ছাড়া যিকিরের প্রকৃত বরকত ও ফল লাভ হয় না। বরং অনেক সময় এ ধরনের জাহেল সুফীদেরকে শয়তান নিজের হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। সুতরাং এ কাজের সাথে ইলম ও যিকিরের গুরুত্বের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়; বরং এ ব্যাপারে সর্বদা যত্নবান থাকা উচিত। অন্যথায় তাবলীগের আন্দোলন নিছক তামাশার আকার ধারণ করবে এবং আল্লাহ না করুন আপনাদের মারাত্মক রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

৩। একবার তিনি ইরশাদ করেন, আমি প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরণের যিকিরের তালীম দিয়ে থাকি (তার পর তিনি কিছু ওযায়েফের আলোচনা করে বললেন,) যিকির ছাড়া ইলম অন্ধকার বৈ কিছুই নয়। আর ইলম ছাড়া যিকির অসংখ্য ফিৎনার দরজা।

৪। একবার ইরশাদ করেন, দু'টি বিষয়ে আমি বেশ চিন্তিত। সুতরাং এ দুটি বিষয়ের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। একটি হল যিকির, যে ব্যাপারে আমার জামাতে বেশ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে যিকির শিক্ষা দেয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বিত্তশালীদের যাকাত যথাস্থানে ব্যয় হচ্ছে না। অধিকাংশই বেকার নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে যাকাতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উচিত। (সুদীর্ঘ আলোচনার অংশবিশেষ।)

৫। ইরশাদ করেন, ইলম থেকে আমল জন্ম নেয়া উচিত এবং আমল থেকে যিকির জন্ম নেয়া উচিত। তবেই ইলম প্রকৃত ইলমরূপে আর আমল

প্রকৃত আমলরূপে গণ্য হবে। ইলম থেকে যদি আমল জন্ম না নেয়, তাহলে তা নিছক অন্ধকার। আর আমল থেকে যদি আল্লাহর স্মরণ জন্ম না নেয়, তা হলে তা ঠুঙ্ক। আর ইলম ছাড়া যিকিরও ফিতনা।

৬। শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকির দূর্গ ও সুসংরক্ষিত প্রাচীর তুল্য। সুতরাং দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কোন খারাপ পরিবেশে যেতে হলে সে পরিবেশ যত খারাপ হবে ততই বেশী পরিমাণ যিকিরের প্রতি যত্নবান হতে হবে, যাতে মানব-দানব সব ধরনের শয়তানের প্রভাব থেকে পরিত্রাণ লাভ হয়।

৭। ইরশাদ করেন, আমি সব সময় মেওয়াত যাওয়ার সময় নেককার ও যাকেরীনদের জামাতের সাথে যেয়ে থাকি তার পরও সাধারণ পরিবেশের সাথে মেলা মেশার কারণে মনের মধ্যে যে ময়লা পড়ে যায় তা ই'তিকাফের দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত কিংবা কিছু দিন সাহারানপূর বা রায়পুরের বিশেষ পরিবেশে না কাটানো পর্যন্ত তা পরিষ্কার হয় না।

অন্যদেরও তিনি মাঝে মধ্যে বলতেন যে, দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যারা সফর করে তাদের উচিত গাস্তের সময় কিংবা অন্য কোন সময় বাহিরের পরিবেশে ঘুরা ফিরার কারণে মনে যে প্রভাব পড়ে তা নিভৃতে এবং একাকিত্বে যিকির ও ফিকিরের মাধ্যমে ধৌত করে নেয়া।

৮। ইরশাদ করেন, ইলম ও যিকিরকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরা একান্ত অপরিহার্য্য। (এরপর তিনি ইলম ও যিকিরের হাকীকত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন, যাতে তিনি বলেন,) ইলম নিছক জানার নাম নয়। লক্ষ্য কর, ইহুদী সম্প্রদায় তাদের নিজেদের শরীয়ত ও আসমানী ইলম সম্পর্কে কতখানি জ্ঞানের অধিকারী ছিল; রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েবের নায়েবদের হুলিয়া ও আকার অবয়ব এমনকি নবীজীর শরীরের তিল সম্পর্কে পর্যন্ত অবগত ছিল। কিন্তু এসব ইলম তাদের কি কাজে এসেছে?

এখানে এই কয়েকটি উপদেশ বাণী লিখা হল। এছাড়াও হযরত দেহলুভী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা ইয়ুসুফ (রহঃ)-এর বয়ান, উপদেশবাণী ও চিঠিপত্র প্রচুর পরিমাণে সংকলিত হয়েছে। মেওয়াতের জিম্মাদারদের নামে লেখা হযরতের একটি চিঠির আংশিক এখানে উদ্ধৃত করা হলঃ

প্রিয় বন্ধুগণ! আপনাদের এক এক বৎসরের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর সংবাদ পেয়ে এতটুকু আনন্দিত হয়েছি যা পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার মত নয়। আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং আরো তৌফীক দান করুন। এখানে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(ক) প্রত্যেকে নিজ নিজ হালকার একটি ফিরিস্তি তৈরী করে আমার কাছে এবং হযরত শায়খুল হাদীছের কাছে পাঠিয়ে দিন যে, কারা যিকির আরম্ভ করেছে আর কারা আগে থেকেই করছে আর কারা ছেড়ে দিয়েছে।

(খ) যারা বাইআত হয়েছে তারা বাইআতের পর বাতলে দেয়া সবকের উপর কতখানি আমল করছে।

(গ) প্রত্যেক মারকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট মকতবগুলোর প্রতি দেখা-শুনা করা এবং যেখানে নেই প্রয়োজনমতে নতুন মকতব কায়েম করা আবশ্যক।

(ঘ) আপনারা নিজেরাও রীতিমত যিকির ও তালীমের আমল আরম্ভ করেছেন কিনা? না করে থাকলে এ অবহেলার কারণে অনুতপ্ত হয়ে সত্তর আরম্ভ করে দিন।

'ক' এর পেরা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য; যাদেরকে বারো তাসবীহের সবক দেয়া হয়েছে তারা পাবন্দীর সাথে পুরণ করছে কিনা আর তারা কি আমার কাছে জেনে এ আমল আরম্ভ করেছে, না অন্য কাউকে দেখে আমল শুরু করেছে। পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞাসা করে বিস্তারিত লিখুন।

(ঙ) নিজেদের মারকাযগুলো থেকে প্রত্যেক নাম্বারের বিস্তারিত কারগুজারী লিখে আমার নামে এবং হযরত শায়খুল হাদীছের নামে লিখে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

(চ) যারা বারো তাসবীহ রীতিমত পালন করছে তাদেরকে রায়পুর গিয়ে এক চিল্লা কাটানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

(ছ) বন্ধুগণ! আপনাদের আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানোর মূল লক্ষ্য হল তিনটি বিষয়কে জীবিত করা, যিকির, তালীম, তাবলীগ অর্থাৎ তাবলীগের জন্য বের হয়ে তাদেরকে যিকির ও তালীমের পাবন্দ করা। (মাকাতীব)

'সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী' (হযরত মাওঃ ইয়ূসুফ (রহঃ)-এর জীবন চরিত)-তে লিখা রয়েছে যে, তিনি তাওহীদ ও নামাযকে এ কাজের বুনিয়াদ মনে করতেন। তার বক্তব্য ছিল ইলম ও যিকির হল দাওয়াত ও তাবলীগের এ আন্দোলনের জন্য দু'টি ডানা তুল্য। এ ছাড়াও তিনি তাঁর বয়ানে এবং চিঠি পত্রের মাধ্যমে সর্বদা এ দু'টি বিষয়ের প্রতি জোর তাগীদ দিতেন। তিনি তার গুরুত্বপূর্ণ এক চিঠিতে লিখেনঃ

"ইলম ও যিকির এই কাজের দু'টি ডানা তুল্য। এর কোন একটিতে দুর্বলতা কিংবা অবহেলা মূল কাজের জন্য মারাত্মক রকমের হুমকী। প্রত্যেকটিই স্ব স্ব স্থানে একান্ত অপরিহার্য ও আবশ্যকীয়। ইলম ও যিকিরের মারকায হল, মাদ্রাসা এবং খানকা। আমরা আমাদের এ দু'টি ডানাকে শক্তিশালী করার জন্য ওলামা-মাশায়েখদের কাছে সর্ব অবস্থায় সর্বভাবে মুহতাজ। তারা বিশেষতঃ এ দু'টি বিষয়ে আমাদের অনুসরণীয়। এই ইলমে নববী ও নূরে নববীর অধিকারী হওয়ার সুবাদেই তাঁদের কদর করা, তাঁদের খেদমত করা, তাঁদের সান্নিধ্য লাভকে নিজের ইসলাহ ও নাজাতের উপায় মনে করা আমাদের উপর আবশ্যক; এজন্যই ওলামা মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাত করা, তাদের থেকে দু'আ নেয়া, তাদের সামনে তাবলীগের কারগুজারী শুনানো, সৎ পরামর্শ নেয়া তাবলীগের মৌলিক নীতিমালার একটি অন্যতম।

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব 'সাওয়ানেহে হযরতজী' (হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ (রহঃ)-এর জীবনী)-তে লিখেন, একবার আমি হযরত মাওলানার কাছে নিজের মাদ্রাসার ব্যস্ততার কথা বলে আরজ করলাম যে, হযরত! পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। এখন ইচ্ছা হয় কাউকে নিজের পড়ানোর দায়িত্ব সঁপে দিয়ে কিছু দিনের জন্য তাবলীগে বের হয়ে যাবো। জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, কস্মিনকালেও নয়, তাবলীগের আগেও এ কাজ করতে হবে এবং তাবলীগের পরও করতে হবে।

মানুষের ধারণা; আমরা মাদ্রাসার বিরোধিতা করি। কস্মিনকালেও নয়; সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা বরং মাদ্রাসায় পড়ানোকে বুনিয়াদী কাজ মনে করি। শুধু তাই নয় নিজেও শিক্ষকতা করি। আমাদের তো ইচ্ছা, মাদ্রাসায় পড়ানোর পাশা-পাশি তাবলীগের কাজটিকে জুড়ে নিবো। (সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী আযীযী)

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তার এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, সকাল-সন্ধ্যা এবং নিজের অবস্থা মাফিক রাতের কিছু অংশ ইলম ও যিকির হাসিল করার পিছনে ব্যয় করবে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর জীবনীতে হযরত মাওঃ আলী মিয়া লিখেন, "তিনি মেওয়াতীদের দেওবন্দ, সাহারানপুর, রায়পুর ও থানাভুনের দিকে পাঠাতে আরম্ভ করেন এবং এ হিদায়েত দিয়ে দেন যে, বুযুর্গদের মজলিসে তাবলীগের আলোচনা করবে না। ৫০/৬০ জন আশে-পাশের গ্রামে গাস্ত করবে। অষ্টম দিন শহরে সমবেত হবে। তারপর সেখান থেকে পুনরায় গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য ওলামা কেরাম যদি নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে তাদের সামনে নিজেদের হালাত পেশ করবে; নিজে থেকেই কিছু বলবে না।"

হযরত মাওলানা একবার শায়খুল হাদীছ মাওঃ মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেবের নামে লিখা এক চিঠিতে লিখেন, বহুদিন ধরে আমার মনের বাসনা ছিল যে, এই জামাতগুলো বিশেষ উসূলের পাবন্দীর সাথে (হক্কানী) পীর মাশায়েখদের কাছে গিয়ে তাঁদের খানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে খানকার ফয়য লাভ করুক এবং কিছু সময় আশেপাশের গ্রামগুলোতে তাবলীগের কাজও জারী থাকবে। এ ব্যাপারে যারা আসবে তাদের সাথে পরামর্শ করে রুটিন তৈরী করে নিবেন।

খুব সম্ভব আমিও কতক দ্বীন-দরিদ্রদের নিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যে আসব। দেওবন্দ ও থানাভুনও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

মাওলানা ইয়ূসুফ সাহেব (রহঃ) তার সকল মুতাআল্লেকীন ও তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বরাবর দেওবন্দে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর খেদমতে এবং রায়পুরে হযরত মাওঃ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী (রহঃ)-এর খেদমতে গিয়ে কিছু সময় কাটানোর এবং অধিক পরিমাণ ফায়দা হাসিল করার জন্য বিশেষভাবে তাগীদ করতেন। (হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর মৃত্যু তো তাঁর সময়ের আগেই হয়ে গিয়েছিল।)

লক্ষ্য করুন, তিনি তাঁর এক পুরাতন বন্ধুকে লিখা এক চিঠিতে কতটুকু গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে হিদায়েত দিচ্ছেন। তিনি লিখেন, আপনার ব্যাপারে পরামর্শের পর রায়পুর অবস্থানেরই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরাং আপনি এক চিল্লা

নয়; বরং তিন চিল্লা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে হযরতের সান্নিধ্যে থেকে সেখানকার যাবতীয় আদব বজায় রেখে আল্লাহর যিকিরের আগ্রহ এবং আল্লাহর মহব্বত জন্মানোর চেষ্টা করুন।

আমার পক্ষে তো কিছুই সম্ভব হল না। আপনিই এ মহান দৌলত হাসিল করার জন্য লেগে যান। আল্লাহ পাক আপনার সেখানে অবস্থানকে আমাদের নাজাত ও মাগফিরাতের উসীলা করুন। হযরতের খেদমতে সালাম আরজ করে এ অধমের জন্য দু'আর দরখাস্ত করবেন। অন্যান্য মুরীদান ও হযরতের খেদমতে অবস্থানরত সকলের খেদমতেও সালাম ও দু'আর দরখাস্ত রইল।

বান্দা মুহাম্মদ ইয়ূসুফ গুফিরা লাহু

(সাওয়ানেহে ইয়সুফী)

সমালোচনা- ৪

মাদ্রাসার বিরোধিতা

আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, তাবলীগী জামাতের লোকেরা মাদ্রাসার বিরোধিতা করে থাকে। ফলে এদের দ্বারা মাদ্রাসাগুলোর বেশ ক্ষতি হচ্ছে। এ অভিযোগও অত্যন্ত উদ্ভট ও ভিত্তিহীন।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে তো এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, তাদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা, ইলম ও যিকিরের গুরুত্ব কতখানি। এরপরও এ মন্তব্য করা নিছক বাতুলতা বৈ কিছুই নয় যে, তাবলীগী জামাতের মাধ্যমে মাদ্রাসার ক্ষতি সাধন হচ্ছে এবং এরা মাদ্রাসা-বিদ্বেষী।

একবার এ অধমের কাছে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) এরশাদ করলেন, তাবলীগী লোকেরা মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ে বাধা প্রদান করে থাকে। আমি আরজ করলাম, নিশ্চয়ই অভিযোগকারী কোন চাঁদা আদায়কারী হবেন? তাদের মুখ থেকেই এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায়। আমি নিজেও যেহেতু মাদ্রাসার সাথে জড়িত; আমার কাছেও অনেক চাঁদা আদায়কারীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ পৌছে থাকে।

আমি আরজ করলাম, প্রকৃত বিষয় হল, তাবলীগী মুরুব্বীদের কাছে প্রচুর

লোক-সমাগম হয়ে থাকে এবং তাবলীগী এজতেমাগুলোতেও বিরাট লোক-সমাবেশ ঘটে। ফলে অনেক সময় চাঁদা আদায়কারীরা গিয়ে মুরুব্বীদের কাছে তাদের মাজমাআ থেকে কিছু চাঁদা আদায় করে দেয়ার কিংবা মাজমাআয় এ বিষয়ে তাদেরকে আলোচনা করার সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করেন। আর এঁদের পক্ষে এর কোনটিই রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এঁদের জন্য উচিতও নয়। কেননা চাঁদা চাওয়া এঁদের উসূলের পরিপন্থী।

যাহোক এঁরা যখন অক্ষমতা প্রকাশ করেন, তখন চাঁদা আদায়কারীরা মন্তব্য করে বসেন যে, এঁরা মাদ্রাসাকে দেখতে পারে না।

আমি হযরতের কাছে আরজ করলাম যে, আমার কাছেও চাঁদা আদায়কারীদের অনেকেই এ ধারনের অভিযোগ নিয়ে এসেছে। তাদের কাছে প্রকৃত বিষয় সন্ধান নিতে গিয়ে এ তথ্যই পেয়েছি যা আরয করলাম। হযরত নিজেও বললেন যে, আমার কাছেও মাদ্রাসার একজন চাঁদা আদায়কারী এ অভিযোগ করেছিলেন।

যাহোক, এ ধরনের প্রশ্ন সাধারণতঃ মাদ্রাসার চাঁদা আদায়কারীদের পক্ষ থেকেই এসে থাকে কিংবা ঐসব লোক করে থাকেন যাঁরা তাদের কাছ থেকে শুনেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চাঁদা চাওয়া তাবলীগ জামাতের উসূলের পরিপন্থী, আল্লাহ তাঁদেরকে এ উসূলের উপর অনড় থাকার তওফীক দান করুন।

আমাদের মাদ্রাসার মসজিদে কয়েকদিন আগে মাগরিবের পর জনৈক ব্যক্তি এসে ঘোষণা করল যে, "আমি নিজামুদ্দীন থেকে এসেছি। তাবলীগে যাওয়ার নিয়ত করেছি। কিন্তু আমার কাছে ভাড়া নেই, সুতরাং আশা করি দ্বীনদরদী ভাইয়েরা সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করবেন।"

আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম, এ লোক সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। কেননা, তাবলীগী মারকায থেকে এ ধরনের চাঁদা আদায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ঘোষণার পর লোকটি তৎক্ষণাৎ মসজিদ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, লোকটি এখান থেকে গিয়ে শহরের বিভিন্ন মসজিদে একই কথা বলে

চাঁদা আদায় করেছে।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর মালফুযাতে রয়েছে যে, ওয়ায নসীহত করে চাঁদা চাইলে ওয়াযের তাছীর বাকী থাকে না। দুই-আড়াই ঘন্টার জোরদার মেহনত সামান্য দু' একটি শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ, চাঁদা সংক্রান্ত) শেষ হয়ে যায়। সুতরাং ওলামা কেরামের শুধু দাওয়াত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা উচিত। তবেই দাওয়াতের আছর অব্যাহত থাকবে। (ইফাযাত)

কলকাতা ও বোম্বাই-এর কতক ব্যবসায়ীর কাছে এক মাদ্রাসার জনৈক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা অভিযোগ করলেন যে, তাবলীগী ভাইদের কারণে মাদ্রাসার চাঁদা আদায়ের বেশ ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। (আরো বিভিন্ন জায়গায় এরা এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।) সব জায়গায়ই এরা একই জবাব দিয়েছে যে, আমরা তো বরং তাবলীগের বরকতেই মাদ্রাসায় চাঁদা দান করছি। আপনি দশ বছর আগের আর এ দশ বছরের রিপোর্ট তুলনা করে দেখুন; এ দশ বছরে আমাদের এলাকা থেকে চাঁদা প্রদানের হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে তাঁর মেওয়াতের কতক দ্বীনদারকে লক্ষ্য করে লিখা একটি চিঠি উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে তিনি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেনঃ

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধর্মীয় বিষয়াদির জন্য তাবলীগ অর্থাৎ (সঠিক) নিয়মে দেশ-বিদেশ ঘুরে মেহনত করা জমিতে চাষ এবং বৃষ্টি বর্ষণ তুল্য। আর ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়গুলো হল সেই তৈরী জমিতে উৎপন্ন বৃক্ষরাজির যত্ন নেয়ার মত। আর বাগান হাজারো ধরনের হতে পারে। যেমন, খেজুর, আঙ্গুর, আপেল ও বেদানা ইত্যাদি। তবে কোন বাগানই দু'টি মেহনত ছাড়া ফলদায়ক হতে পারে না। প্রথমতঃ আগাছা মুক্ত করে জমিতে চাষ দেয়া। দ্বিতীয়তঃ বাগানের পিছনে যত্ন নেয়া। অনুরূপভাবে দ্বীনের ব্যাপারে তাবলীগের আমল হল জমিতে চাষ দেয়ার মত; আর অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হল বাগানের যত্ন নেয়ার মত। আর বলাবাহুল্য যে, দ্বীনের জমিগুলো অদ্যাবধি এমন অসমতল ও বিভিন্ন আগাছাপূর্ণ যে, কোন ফসলই তাতে উৎপন্ন হচ্ছে না।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর এ তাবলীগী আন্দোলন মাদ্রাসা ও খানকাগুলোর সঠিক উন্নতীর মাধ্যম।

মাওলানা আলী মিয়া (রহঃ) হযরত মাওলানা দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে লিখেন যে, হযরত মাওলানা ধর্মীয় মাদ্রাসাগুলোর বর্তমান মুসলমানদের জন্য একান্ত অপরিহার্য মনে করতেন এবং সমাজের উপর থেকে মাদ্রাসাগুলোর ছত্রছায়া উঠে যাওয়া মারাত্মক রকমের বিপর্যয় ও প্রলয়ের কারণ মনে করতেন।

একবার মেওয়াতের উল্লেখযোগ্য বেশ কতগুলো মাদ্রাসা এবং দ্বীনী মক্তব লোকদের অবহেলার কারণে অকেজো ও বন্ধ হয়ে পড়ে। হযরত মাওলানা জানতে পেরে শায়েখ রশীদ আহমদকে এ মর্মে এক চিঠিতে লিখেনঃ

লোকদের মানস্পটে এ কথা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করুন যে, এভাবে মাদ্রাসাগুলো দুর্বল কিংবা বন্ধ হয়ে পড়লে সকলের জন্য মারাত্মক রকমের বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং এর জন্য সকলকে কঠিন জবাবদেহীর সম্মুখীন হতে হবে যে, এভাবে আমাদের চোখের সামনে কুরআন দুনিয়া থেকে মিটে যাবে আর আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করব। একটুও আমাদের মাঝে দরদ থাকবে না। এর জন্য সামান্য অর্থও আমাদের ব্যয় হবে না। সত্যি এটি মারাত্মক রকমের আশঙ্কাজনক বিষয়।

(সাওয়ানেহে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব)

সমালোচনা– ৫

তাবলীগ জামাতের লোকেরা ওলামা বিদ্বেষী

এ প্রশ্নও প্রচুর শোনা যায় যে, তাবলীগের লোকেরা ওলামা কেরামের সাথে অসদাচরণ করে এবং তাঁদের এহতেরাম বজায় রাখে না। এর জবাব হল, তাবলীগ জামাত ভিন্ন কোন দল নয়; বিভিন্ন জামাত ও দলের লোক এখানে সমবেত হয় আর এটাও জানা কথা যে, এ ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে এমন কোন দল বা শ্রেণী নেই যারা ওলামাদের সাথে অসদাচরণ করছে না। সুতরাং পূর্ব থেকেই ওলামা বিদ্বেশী এসব লোকেরা যদি তাবলীগ জামাতে এসে যোগ দেয় তাহলে কি এ কথা বলা সঙ্গত হবে যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা ওলামা বিদ্বেষী? 'ওলামা বিদ্বেষ' প্রসঙ্গে আমার রচিত এ'তেদাল গ্রন্থে দীর্ঘ ৫০ পৃষ্ঠা ব্যয় করে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এতে এ প্রশ্নটি এবং এর বিভিন্ন কারণ

সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

আমার জানামতে তাবলীগের মারকায থেকে এবং তাবলীগের মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে সর্বদা এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয় যে, ওলামা কেরামের প্রতি যেন পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করা হয় এবং তাদের সাথে কোন প্রকার বে-আদুবী না করা হয়। এরপরও যদি কারো আচরণ উচ্চারণ এর ব্যতীক্রম হয়, তবে সেটা হবে তার ব্যক্তিগত অপরাধ।

ইতিপূর্বে মাদ্রাসার বিরোধিতা প্রসঙ্গে কতক ব্যবসায়ীর উক্তি গিয়েছিল, যা বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের লক্ষ্য করে তাঁরা বলেছিলেন; বরং কোন প্রকার অত্যুক্তি ছাড়া বলছি যে, স্বয়ং আমিও সতাধিক ব্যক্তির মুখে শুনেছি যে, হুজুর! এর পূর্বে তো আমরা আপনাদের থেকে বিমুখ ও বিচ্ছিন্ন ছিলাম; এ তাবলীগের উসীলায় আপনাদের কাছে ভীড়েছি।

আচ্ছা এ কথা কি অস্বীকার করার কোন উপায় আছে যে, তাবলীগ জামাতের পূর্বে হক্কানী ওলামা কেরামের শুধু আগমনই কত কঠিন ছিল। ওয়াজ নসীহত করা তো বহু পরের কথা। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর স্ত্রী যখন হজ্জ থেকে ফিরলেন এবং তাকে এগিয়ে আনতে হযরতকে বোম্বাই শহরে যেতে হল, তখন তিনি কি পরিমাণ কষ্ট যে পেয়ে ছিলেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। সন্ত্রাসীরা বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিয়ে সে ঘর ঘেরাও করে ফেলল এবং হযরতের উপর আক্রমণ করল। পরিশেষে তাঁকে অত্যন্ত কৌশলে রাতের অন্ধকারে অন্য ঘরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

১৩৩৮ হিজরী সালে হযরত সাহারানপুরী (রহঃ) তিনশত খাদেম সাথে নিয়ে যখন হজ্জে রওনা হলেন। এ অধমও সাথে ছিল। সে সময় বোম্বাই শহরের মস্তানদের ভয়ে হযরতকে পুরা কাফেলাসহ শহর থেকে দশ মাইল দূরে এক কবরস্তানে তাবু টানিয়ে অবস্থান করতে হয়েছিল। বোম্বাই শহরে দেবন্দী ওলামা কেরামের প্রকাশ্যে গমন কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল তা কারই অজানা নেই। বোম্বাই শহরের কোন মসজিদে প্রসিদ্ধ কোন দেওবন্দী নামায পড়লে সে মসজিদ পাক করা হত। অথচ এখন লক্ষ্য করুন, সেই বোম্বাই শহরেই হক্কানী ওলামা কেরামের চাহিদা এত বেশী যে, সে চাহিদা পূরণ করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যাহোক, এ কথা অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই যে, তাবলীগের মরুব্বীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। এরপরও যদি কোন আনাড়ীকে এ ধরনের কোন অসদাচরণ করতে দেখা যায় তবে দেখতে হবে; এর তাবলীগে আসার পূর্বে ওলামাদের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিল। যদি এমন হয় যে, তাবলীগে আসার পূর্বে তার সম্পর্ক ভাল ছিল, তাবলীগে আসার পর সে ওলামা-বিদ্বেষী হয়েছে তবে তো নিঃসন্দেহে এ অভিযোগ যথাযথ। আর যদি এমন হয় যে, আগে থেকেই সে ওলামা-বিদ্বেশী ছিল তাহলে আপনিই বলুন; এ দায়িত্ব কি গোটা জামাতের উপর বর্তায়, না সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী?

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর সুন্দর একটি কথা মনে পড়ল। একবার কোন এক মাদ্রাসার ছাত্র চুরি করল। মালিক হযরতের কাছে অভিযোগ করল যে, তালেবুল ইলমও চুরি করা ধরেছে। জবাবে হযরত বললেন, না; বরং চোর তালেবুল ইলম সেজেছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর কয়েকটি বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

এরশাদ- ১

আমাদের জামাতের সাথীরা যেখানেই যাবে, তারা যেন সেখানকার হক্কানী আলিম ও নেককারদের সাথে সাক্ষাত করে। আর এ সাক্ষাত হবে তাঁদের থেকে কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যে। সরাসরি তাঁদেরকে এ কাজের দাওয়াত দিবে না। কেননা, তাঁরা দ্বীনের যেসব খিদমতে ব্যস্ত আছেন সে বিষয়ে তারা ভালভাবেই অবগত এবং এর উপকারিতা সম্পর্কেও তাঁরা বেশ অভিজ্ঞ। সুতরাং তোমরা তোমাদের বিষয় তাঁদের ভালভাবে বুঝাতে পারবে না যে, তোমাদের এ কাজ অন্যান্য সকল ধর্মীয় ব্যস্ততা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ। ফলে তাঁরা তোমাদের কথা মানবে না। তাই তাঁদের খেদমতে শুধু ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে যেতে হবে। তবে তাঁদের আশে-পাশে জোরদার হেমনত করতে হবে এবং যত বেশী সম্ভব উসূলের পাবন্দী করতে হবে। এভাবে আমল করলে আশা করা যায় তোমাদের এ কাজের ফলাফল তাঁদের কানে এমনিতেই পৌঁছে যাবে এবং তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সহায়ক হবে। তারপর যদি তাঁরা নিজেরা তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন তাদের

খেদমতে দায়িত্বভার গ্রহণের এবং নেতৃত্বদানের দরখাস্ত করবে। তাঁদের আদব ও এহতেরাম পূর্ণভাবে বজায় রেখে তাদের সাথে নিজের কথা বলতে হবে। (মলফুযাত)

ইরশাদ– ২

যদি কোন জায়গায় গিয়ে সেখানকার ওলামা কেরাম ও নেককারদের এ কাজের প্রতি অসহানুভূতিশীলতা পরিলক্ষিত হয় তবে তাঁদের প্রতি বদগুমান হওয়া যাবে না; বরং এ কথা ভাবতে হবে যে, তাঁদের সামনে এখনও এ কাজের পূর্ণ হাকীকত পরিষ্কার হয়নি। তাছাড়া মানুষ যখন এ তুচ্ছ দুনিয়ার ব্যস্ততা ছেড়ে আসতে পারছে না, তাহলে আহলে ইলম তাঁদের দ্বীনী এ গুরুদায়িত্ব ছেড়ে কি করে চলে আসবেন।

ইরশাদ– ৩

মুসলমানদের ওলামা কেরামের খেদমতে চারটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যাওয়া উচিত। (১) মুসলমান ভাই হিসেবে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। (২) তাঁদের অন্তর ও দেহ ইলমে নববীর ধারক ও বাহক, এই হিসেবেও এঁরা শ্রদ্ধার পাত্র, খেদমত পাওয়ার যোগ্য। (৩) এঁরা আমাদের ধর্মীয় যাবতীয় বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়ক। (৪) তাঁদের যাবতীয় প্রয়োজনাদির খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য। কেননা অন্যান্য মুসলমানরা যদি তাঁদের পার্থিব প্রয়োজনাদির খোঁজ নিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করে, বিশেষতঃ বিত্তশালীরা তা করতে পারে, তাহলে এঁরা এদিক থেকে নিশ্চিত হয়ে সম্পূর্ণ সময়টুকু দ্বীনের খেদমতে ব্যয় করতে পারেন। এতে বিত্তশালীরাও তাঁদের যাবতীয় আমলের ছওয়াবের অংশীদার হবে। (মলফুযাত)

ইরশাদ– ৪

একবার ইরশাদ করেন, সাহারানপুর এবং দেওবন্দে যেসব জামাত পাঠানো হচ্ছে তাদের সাথে দিল্লীর ব্যবসায়ীদের পত্রগুলো পাঠিয়ে দেয়া হোক। আর তাতে অত্যন্ত বিনীত স্বরে ওলামা কেরামের খেদমতে আরজ করা হোক যে, এই জামাতগুলো সাধারণ লোকদের মাঝে তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে আসছে। আপনাদের সময় তো নিঃসন্দেহে অনেক মূল্যবান; তবুও যদি আপনাদের এবং

ছাত্রদের কোন ক্ষতি না হয় তাহলে কিছু সময় বের করে এই কাফেলাগুলোর তত্ত্বাবধানের অনুরোধ রইল। ছাত্রদেরকে আপনাদের সাথে এবং আপনাদের তত্ত্বাবধানে জামাতে নিয়ে যাবেন। তাদের জন্য কোন উস্তাদের তত্ত্বাবধান ছাড়া একা জামাতে যাওয়া উচিত নয়।

আর জামাতের সাথীদের ভালভাবে নসীহত করে দেয়া হোক যে, যদি ওলামা কেরামের পক্ষ থেকে এ কাজের প্রতি শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়, তবে যেন তাঁদের প্রতি মনে কোন প্রকার বিরূপ ভাব সৃষ্টি না হয়; বরং মনে করতে হবে যে, তাঁরা আমাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন এই ইলমে দ্বীনের খেদমতের জন্য তাঁদের সারা রাত জাগ্রত থাকতে হয়। অথচ অন্যরা তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। আর ওলামা কেরামের অমনোযোগের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করবে। কেননা আমরা তাঁদের কাছে যাতায়াত কম করেছি। সুতরাং যারা তাঁদের খেদমতে বছরকে বছর পড়ে আছে স্বভাবতই তারা ওলামা কেরামের অধিক মোনযোগ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

আরও ইরশাদ করেন, সাধারণ মুসলমানের ব্যাপারেই অনর্থ বদগুমান হওয়া নিষেধ রয়েছে। সুতরাং ওলামা কেরামের ব্যাপারে বদগুমান হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

হযরত মাওঃ দেহলুভী (রহঃ) আরও বলেন, আমাদের এই তাবলীগের কাজে সাধারণ মুসলমানের ইজ্জত করা আর ওলামা কেরামের সম্মান করা বুনিয়াদি বিষয়। সকল মুসলমানকে ইসলামের সুবাদে ইজ্জত করতে হবে। আর ওলামা কেরামকে ইলমে দ্বীনের সুবাদে অনেক সম্মান করবে। তার পর ইরশাদ করেন, ইলম ও যিকির এখন পর্যন্ত আমাদের মুবাল্লিগদের আয়োত্তে আসেনি। যার কারণে আমি অত্যন্ত চিন্তিত। এর একমাত্র সমাধান হল, এদেরকে ওলামা কেরাম ও পীর-মাশায়েখদের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। তাদের খেদমতে থেকে তাবলীগও করবে এবং তাদের ইলম ও সুহবত থেকে উপকৃতও হবে। (মলফুযাত)

ইরশাদ– ৫

একবার হযরত মাওলানা জাফর আহমদ উছমানীকে লক্ষ্য করে বলেন, হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত লোকদের আমি বেশ কদর

করি। কেননা এরা নিকটবর্তী যুগের। এ জন্যই তোমরা সহজেই আমার কথা বুঝতে পার। তোমরা মাওলানার কথা সদ্য শুনে এসেছো। তোমাদের দ্বারা আমার এ কাজে অনেক বরকত হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তারপর তিনি মাওলানাকে অনেক দোয়া দিয়ে বললেন, তুমি নিজেও চোখের পানি ঝরিয়ে এ নেয়ামতের শোকর আদায় কর। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ৬

আমাদের এ জামাতগুলোকে তিন ধরনের লোকদের কাছে তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষভাবে যাওয়া উচিত। ওলামা ও নেক্কারদের খেদমতে দ্বীন শিক্ষা করা এবং দ্বীনের উত্তম আছর গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ৭

আমাদের এ কাজের উসূল হল, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমানদের হক আদায় করে তাদের সামনে এ দাওয়াত পেশ করা। ওলামা কেরামের খেদমতে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সাথে এ দাওয়াত পেশ করতে হবে।

ইরশাদ– ৮

ওলামা কেরামের কাছে এ আরয করতে হবে যে, তাবলীগী জামাআতগুলোর এ নকল-হরকত ও চেষ্টা-সাধনা সাধারণ লোকের মাঝে দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ জন্মাতে পারে। এরপর এদের তালীম ও তারবিয়াতের দায়িত্ব ওলামা ও নেক্কারদের নেকদৃষ্টির মাধ্যমেই আঞ্জাম পেতে পারে। তাই আপনাদের নেকদৃষ্টির তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ৯

কোন এক প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত আলিম ও লিখকের আলোচনা হল। যিনি নিজের কতক ইলমী দুর্বলতার কারণে বিশেষ দ্বীনদার মহলে বেশ সমালোচিত। কিন্তু হযরত মাওলানা বললেন, আমি তো তাঁর বেশ কদর করি। তাঁর কোন দুর্বলতা থেকে থাকলেও আমি তা জানতে চাই না। এটা আল্লাহর ব্যাপার। হতে পারে তাঁর কাছে কোন ওজর রয়েছে। আমাদের তো এই দু'আ করতে বলা হয়েছে;

و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا

এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না।[৫৯:১০]

ইরশাদ– ১০

আমাদের এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো, মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত গোটা দ্বীন শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ ইসলামের ইলমী ও আমলী পূর্ণ নেযামের সাথে এ উম্মতকে জুড়ে দেয়া। এই তো হল আমাদের মূল লক্ষ্য। তবে এই জামাতগুলোর নকল, হরকত ও গাস্ত মূল লক্ষ্য অর্জনের প্রাথমিক উপায়মাত্র। আর কালিমা ও নামাযের তালকীন ও তালীম আমাদের পুরো নেছাবের আলিফ, বা, তা মাত্র। আর এ কথা সর্বজন বিদীত যে, আমাদের এ জামাতগুলোর পক্ষে পূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। তারা শুধু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সর্ব সামর্থ্য ব্যয়ের মাধ্যমে সবার মধ্যে চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে পারে। আর উদাসীনদের সচেতন করে তুলে স্থানীয় আলিম সম্প্রদায়ের সাথে জুড়ে দিয়ে আলিম ও নেক্কারদের এদের ইছলাহের জন্য নিয়োজিত করার চেষ্টা করতে পারে। সব জায়গার মূলকাজ তো স্থানীয় কর্মীদের মাধ্যমেই হতে পারে। সাধারণ লোকদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের থেকেই অধিক উপকৃত হওয়া সম্ভব। অবশ্য এসব পদ্ধতি শিখতে হবে আমাদের লোকদের কাছে, যাঁরা রীতিমত শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত ও অভিজ্ঞ। (মালফুযাত)

ইরশাদ– ১১

এক চিঠিতে তিনি লিখেন, ইলমের উজ্জ্বলতা ও উন্নতী যতখানি বৃদ্ধি পাবে দ্বীনের উজ্জ্বলতা ও উন্নতী ততখানিই বৃদ্ধি পাবে। আমার এ আন্দোলনের কারণে ইলমের সামান্যতম আঁচড় আসবে এটা আমার জন্য বিরাট বিপর্যয়ের কারণ। ইলমের দিকে যারা উন্নতী লাভ করছেন তাঁদের গতিপথে সামান্যতম বাধা প্রদান আমার এ তাবলীগের উদ্দেশ্য নয়; বরং এই ইলমের আরও উন্নতী হওয়া প্রয়োজন; যতটুকু হয়েছে এতটুকু মোটেই যথেষ্ট নয়। (সাওয়ানেহে হযরত দেহলুভী)

হযরত দেহলুভীর জীবন চরিতে মাওলানা আলী মিয়া লিখেন যে, হযরত

মাওলানা এই দাওয়াতের মাধ্যমে এক দিকে ওলামা কেরামকে আহবান করতেন, তাঁরা যেন পূর্ণ দরদ ও ব্যথা নিয়ে সাধারণ লোকদের পাশে এসে দাঁড়ান। অন্য দিকে সাধারণকে শিক্ষা দিতেন, তারা যেন ওলামা কেরামের মর্যাদা বুঝে তাঁদের পূর্ণ কদর করে তাঁদের কাছ থেকে কিছু আহরণ করে এবং ওলামা কেরামের খেদমতে হাযির হওয়ার ফযীলত বর্ণনা করে তাঁদের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য জোর তাগিদ করতেন। সেই সাথে তাঁদের খেদমতে হাজির হওয়ার আদব ও উসূল বাতলে দিতেন। তাঁদেরকে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি এবং তাঁদেরকে ব্যস্ত করার নিয়ম শিখিয়ে দিতেন এবং ওলামা কেরামের কোন বিষয় বোধগম্য না হলে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করা এবং তাঁদের প্রতি সুধারণা রাখার অভ্যাস করাতেন। তাদেরকে ওলামা কেরামের খেদমতে পাঠাতেন। ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করতেন কিভাবে গিয়েছিলে এবং কি কি আলোচনা হয়েছে। কেউ ওলামা কেরামের সমালোচনা করলে কিংবা তাদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে তার ইসলাহ করতেন। এভাবেই সাধারণ ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীদেরকে ওলামাদের এত নিকটতর করে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি।

দুর্ভাগ্য বশতঃ শহরের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং স্থানীয় কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ওলামা ও সাধারণের মাঝে যে বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল হযরত মাওলানার অসাধারণ মেহনত ও কৌশলের বদৌলতে অন্তত এই দাওয়াতের গণ্ডি সীমায় এই মনমানসিকতা জন্মে গিয়েছে যে, তারা দ্বীনের খাতিরে রাজনৈতিক মতানৈক্যকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে এবং রাজনৈতিক শত মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও হক্কানী ওলামা কেরামের শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছে। বড় বড় ব্যবসায়ী যারা দীর্ঘ দিন যাবৎ ওলামা কেরামদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল তারা এখন ওলামা কেরামের খেদমতে অত্যন্ত আদবের সাথে উপস্থিত হতে আরম্ভ করেছে এবং তাঁদেরকেও নিজেদের বিভিন্ন মজলিসে এবং মাজমাআয় নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। (সাওয়ানেহে হযরত দেহলুভী)

ইরশাদ– ১২

একবার তাঁর অসুস্থতার সময় কয়েকজন তাঁকে ওযু করাইতেছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ নসীহত করেন। তাতে তিনি তাদের বলেন, তোমরা যে আমাকে ওযু করাচ্ছো এতে অসুস্থের খেদমতের পাশাপাশি এ নিয়তও করবে, আয় আল্লাহ! আমাদের ধারণায় তোমার এ বান্দার নামায আমাদের চেয়ে উত্তম, সুতরাং আমরা তাকে ওযু করাচ্ছি এই আসায়, যাতে তার নামাযের কিছু অংশ আমরাও পেতে পারি। তারপর বলেন, এটাত হল তোমাদের করণীয়। কিন্তু আমি যদি ভাবি যে, আমার নামায এদের থেকে উত্তম হয়, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।

তারপর অন্যান্য আলোচনার পর বলেন, তোমরা ঐসব ওলামা কেরামের খেদমত কর যাঁরা এখনও তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। আমি তো তোমাদের সাথে আছিই। আমাকে না ডাকলেও তোমাদের কাছে যাবো। যেসব ওলামা কেরাম তোমাদের প্রতি এখনও দৃষ্টিপাত করেননি তাঁদের খেদমত কর; তাহলে তাঁরাও তোমাদের খেদমত করতে আরম্ভ করবেন।

ইরশাদ– ১৩

হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ (রহঃ) ওলামা কেরামের বেশ কদর করতেন। অধুনা ওলামা কেরামের যে না-কদরী হচ্ছে এবং অনর্থ তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে এটা তিনি দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। যারা এ ধরনের আচরণ করে তাঁদের জন্য রহমত থেকে বঞ্চিতির কারণ মনে করতেন।

একবার তিনি তাঁর এক বন্ধুকে লক্ষ্য করে লিখেন, মনে রাখতে হবে আমরা শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামের কাছে সর্বদা মুহতাজ। এঁদের ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এঁদের সাথে জড়িত থাকা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁরা হলেন অসংখ্য গুণের অধিকারী এবং ইলমে নববীর নূরের ধারক ও বাহক। এঁদের কদর করা প্রকৃত প্রস্তাবে ইলমে নববীর কদর করা। আমরা যে পরিমাণ তাঁদের কদর করব, তাঁদের খেদমত করব, তাঁদের কাছে যাওয়াকে বড় ইবাদত মনে করে তাঁদের উপদেশবাণী শুনব, তাঁদের থেকে সৎ পরামর্শ নিব; সে পরিমাণই ইলমে নববীর নূর দ্বারা নুরান্বিত হতে সক্ষম হব।

ইরশাদ– ১৪

একবার এক তা'লীমের হালকার শেষে ওলামা কেরামকে লক্ষ করে বলেন,

আমাদের এটা কাম্য নয় যে, বুখারী শরীফের উস্তাদদের টেনে এনে আত্তাহিয়্যাতু শিখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করব। কিন্তু এতটুকু অবশ্যই আমাদের কাম্য যে, এদের মনেও যেন আত্তাহিয়্যাতু পড়ানোর গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। কেননা এটাও ইলমে নববীর অংশ, এটাকে অগুরুত্ব দিলে আমাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আর এটাও আমাদের কাম্য যে, এ স্তরের তালীমও বুখারীর উস্তাদদের তত্ত্বাবধানেই হোক। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

ইরশাদ– ১৫

একবার জনৈক আলিমের নামে লিখা এক চিঠিতে লিখেন, আল্লাহ পাক আপনাকে গুণ সমৃদ্ধ ও নুরাণী ও রুহানী ইলমের অথৈ সমূদ্র বানিয়েছেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান এই আমানতের দায়ী' হিসেবে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আপনি যদি একটু নেক দৃষ্টি দান করেন এবং দু'আ করেন তাহলে হয়ত দ্বীনের এ মুবারক জামাত ইলমের চূড়া থেকে এই মুবারক আমলের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বেন এবং নিজেদের ইলমী কুরবানীর পাশাপাশি কিছু দিন এই ঘাটিকেও অতিক্রম করবেন। তাহলে এই পবিত্র আমানত যোগ্য লোকের হাতে এসে সজীব হয়ে উঠবে এবং অযোগ্যদের হাতে পড়ে যেসব ক্ষতির শিকার হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

ইরশাদ– ১৬

হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) তার এক চিঠিতে লিখেন, বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি বদগুমান করবে না; বরং তাদের খেদমতে শুধু ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাবে। তাদের কাছে যাওয়ার সময় মনে এ ধরনের ধারণা যেন স্থান না পায় যে, তাদের কিছু দিতে যাচ্ছি; বরং তাদের কাছ থেকে কিছু হাসিল করার নিয়তই মনে রাখবে। তাদেরকে দাওয়াত দিবে না। (সাওয়ানেহে ইউসুফী আযীযী)

ইরশাদ– ১৭

হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ (রহঃ) বিদায়ী হিদায়েতের সময় বলতেন, খুসূসী গাস্তে দ্বীনের লাইনে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতকালে শুধু তাঁর কাছে দু'আ চাইবে। তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হলে কিছু কারগুজারী শুনিয়ে দিবে। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

মুফতী আযীযুর রহমান বিজপুরী সাহেব যখন প্রথম তাবলীগ জামাতে আগমন করেন হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব তাঁর প্রতি বর্ণনাতীত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর বেশ কদর করেন। মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব সে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন, হযরত মাওলানার এ ব্যবহার শুধু আমার সাথেই নয়; বরং যে কোন লোক সম্পর্কে আলেম বলে পরিচয় পেলেই হত তাঁর সাথেই এ ধরনের ভাল ব্যবহার করতেন। আমার সাথে আমার এক বন্ধু ছিল যাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলেম বলে মনে হত না। আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁকে মাওলানা বলে সম্বোধন করতেই হযরত তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তাঁকে ডেকে এনে কাছে বসতে দেন।

হযরতজী বলতেন, আমি দেওবন্দ ও সাহারানপুর যেসব জামাত প্রেরণ করি, এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, এরা গিয়ে তাঁদেরকে দাওয়াত দিবে; বরং এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, বর্তমান সমাজে ওলামা কেরাম ও সাধারণের মাঝে যে দুরুত্ব বিরাজ করছে এর কিছুটা নিরসন হোক এবং পরস্পরের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি পাক। আর এতেই রয়েছে সকলের জন্য মঙ্গল নিহিত।

ইরশাদ– ১৮

হযরত মাওলানা ইয়ুসুফ (রহঃ)-এর সিলেট সফরের কারগুজারী বর্ণনা করার পর মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব লিখেন, সিলেট হল হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ)-এর ভক্ত ও অনুরক্তদের এলাকা। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এ ধরনের সম্পর্কের প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখতেন। যেসব এলাকা কোন বিশেষ বুযুর্গের সাথে সম্পর্কিত সেখানে প্রয়োজন না থাকলেও ইজতেমা ধার্য করতেন। আম্বাহাট্টার ইজতিমা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীর কারণেই স্থির হয়েছিল।

যাহোক, সিলেটের এজতেমায় হজরত মাদানী (রহঃ)-এর বহু খোলাফা কেরাম অংশ গ্রহণ করেন। হযরত মাওলানা এঁদের বেশ কদর করেন এবং মাশওয়ারায়ও তাঁদেরকে শামিল করেন। তাঁদের পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে এ কাজের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইরশাদ– ১৯

মাওলানা মুহাম্মদ ছানী সাহেব রচিত 'সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী'-তে রয়েছে, হযরত মাওলানা ইয়ূসুফ সাহেব (রহঃ) আল-হাজ্জ মাওলানা ফযলে আলীম সাহেব মুরাদাবাদী মাক্কীর নামে লিখা এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেন, মানব জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইলম ও যিকিরের ব্যস্ততা। আর এর জন্য নিয়মিত দু'টি গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

[এক] আহলে ইলম ও আহলে যিকিরের আযমত ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাঁদের যাবতীয় হক আদায় করা। অনুরূপভাবে পার্থিব বিষয়ে দুনিয়ার লাইনে যাঁরা বড় তাদের হক আদায় করা এবং নিজেদের পার্থিব যাবতীয় কাজে তাঁদের পরামর্শও গ্রহণ করা।

ইরশাদ– ২০

দীর্ঘ ২৩ পৃষ্ঠার সারগর্ভ ও নসীহতপূর্ণ আর এক চিঠিতে ইলমের ফাযায়েল সম্পর্কে আলোচনা করার পর লিখেন, "ওলামা কেরামের খেদমতে হাযির হতে হবে এবং এটাকেও ইবাদত মনে করতে হবে। (সাওয়ানেহে ইয়ূসুফী)

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর এক খাদেম তাঁর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একদিন আমরা কতক সাথী আবু দাউদ শরীফের সবক পড়ার জন্য হযরতজী (মাওলানা ইয়ূসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কুতুবখানায় যাচ্ছিলাম– এমন সময় হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব জালালাবাদীর আগমনের সংবাদ এল। তাই সেদিন আমাদের সবক আর হল না। হযরতজী তার কামরা থেকে বের হয়ে মাওলানার এস্তেকবাল করলেন এবং সেই কামরায়ই বসে গেলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর হযরতজী নিজের কুতুবখানা থেকে তাঁর রচিত 'আমানিল আহবার' ও 'হায়াতে সাহাবা' এনে মাওলানার হাতে দিলেন। মাওলানা একেক পৃষ্ঠা দেখছিলেন আর হযরতের প্রতীভার প্রশংসা করছিলেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

সমালোচনা– ৬

তাবলীগ জাহেলদের কাজ নয়

আরেকটি প্রশ্ন হল, তাবলীগ তো ওলামা কেরামের কাজ; জাহেলরা তা নিয়া মাথা ঘামাবে কেন? এ প্রশ্নটিও বেশ অনেক দিন ধরেই চলে আসছে এবং আমার কাছেও এ যাবৎ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে এ প্রশ্ন এসেছে। আমিও প্রয়োজন সাপেক্ষে কখনও বিস্তারিত কখনও সংক্ষেপে জবাব দিয়ে এসেছি।

বস্তুত তাবলীগ আর ওয়ায দু'টি ভিন্ন জিনিস। এ দু'টি জিনিসের মাঝে পার্থক্য না জানাই এ প্রশ্নের মূল উৎস। ওয়ায হল, কোরআন ও হাদীসের আলোকে স্বীয় আলোচনা পরিবেশন করা। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটি একটু ঝুঁকি সাপেক্ষ; এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ওয়ায করার জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক, যাতে কুরআন হাদীসের পরিপন্থী কোন তথ্য পরিবেশিত না হয়।

অপর পক্ষে তাবলীগ হল, কোন বিষয় অন্যের কাছে পৌছে দেয়ামাত্র। আর শুধু এইটুকুর জন্য সে বিষয় সম্পর্কে ইলম থাকা আবশ্যক নয়।

আকাবিরদের মধ্যে যাঁরা তাবলীগের জন্য আলিম হওয়ার শর্তারোপ করেছেন তাঁরা তাবলীগের সাধারণ অর্থ নিয়েছেন। অন্যথায় বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের উপর এ প্রশ্ন অর্থহীন। কেননা এতে শুধু সীমিত ছয়টি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় এবং এ ছয়টি বিষয়ের মশক করানো হয় এবং এ পয়গাম নিয়েই দেশ-বিদেশ সফর করানো হয়। আর তাদের ছয় উসূল তথা ছয়টি মৌলিক ধারার সাথে আরেকটি ধারা হল, এ ছয়টি বিষয়ের বাইরে যেন আলোচনা না হয়।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেছেন, শরীয়তের দ্ব্যর্থহীন ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদিতে তাবলীগের জন্য আলেম হওয়া শর্ত নয়; বরং যে কোন ব্যক্তি জোর গলায় এর প্রচার প্রসার করতে পারে। অবশ্য ইজতিহাদী বিষয়ে আলোচনা করা শুধুমাত্র আলেমদের কাজ। সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে নিঃসন্দেহে ভুল হয়ে যাবে। (আনফাসে ঈসা)

মজার ব্যাপার এই যে, একদিকে তাবলীগের লোকদের উপর এ প্রশ্ন করা

হয় যে, তাবলীগ তো জাহেলদের কাজ নয়। জাহেলরা কেন তাবলীগ করতে আসে। অন্য দিকে তাদের উপর এ প্রশ্ন করা হয় যে, এরা মাত্র ছয়টি বিষয়েই ব্যস্ত থাকে; এর বাইরে যেতেই চায় না। অথচ শরীয়তের আরো অনেক বিষয় রয়েছে। এর জবাবও আমরা এই দিয়ে থাকি যে, তাবলীগী জামাতে সাধারণতঃ নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশী হয়ে থাকে, যাদের জন্য সীমিত আলোচনার বাইরে যাওয়ার মোটেই অনুমতি নেই। অবশ্য জামাতে কোন আলেম থাকলে তার কথা ভিন্ন। কিন্তু আলেমদের জন্যও জামাতে বের হয়ে এবং জামাতের এজতেমাতে ছয় নম্বরের বাইরে আলোচনা করার অনুমতি নেই। কেননা, অন্যান্য বিষয়গুলো সাধারণতঃ বিতর্কিত হয়ে থাকে। আর বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা ঝগড়া সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে এ ছয়টি বিষয়ে যেহেতু কারো দিমত নেই সুতরাং এতে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন অবকাশও নেই।

হাদীছ শরীফে এবং সাহাবা কেরামদের বক্তব্যে এর বহু প্রমাণ রয়েছে যে, শুধু তাগলীগ করার জন্য আলেম হওয়া শর্ত নয়। যেমন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জের সময় বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করেছিলেন, যা হাদীছ গ্রন্থগুলোতে সুপ্রসিদ্ধ যে, "উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদেরকে আমার এ বাণী পৌঁছে দেয়।" অথচ তখন তার সামনে সোয়া লক্ষ লোক ছিল। যার মধ্যে নিশ্চয়ই সকলে আলেম ছিলেন না; বরং অনেকে তো এমনও ছিলেন যারা জীবনে এই প্রথম নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিশেষ পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপার ছিল, তাই এর জন্য আলেম হওয়া শর্ত ছিল না। এজন্যই নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাধারণভাবে) বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা দিলেন "উপস্থিতরা যেন আমার এ বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়।"

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে একটি শিরনামা নির্ধারণ করেছেন– با رب مبلغ اوعى من سامع "অর্থাৎ "অনেক স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী অপেক্ষাকৃত অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে বার্তা পৌঁছে থাকে।"

এই শিরোনামার অধিনে তিনি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন যে, "তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সব সময়ের জন্য তেমনই হারাম যেমন হারাম এই শহরে, এই

দিনে এবং এই মাসে। তারপর ঘোষণা করলেন, তোমরা যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দিবে। অসম্ভব কিছুই নয় যে, উপস্থিতরা এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিবে যে এদের চেয়ে অধিক সংরক্ষণকারী হবে।

এ হাদীছ দ্বারা এ সংশয়েরও নিরাসন হয়ে গেল যে, ওলামা কেরামের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য জাহেলদের পাঠিয়ে দেয়া হয় কি করে?

হযরত দেহলুভী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে তাবলীগের যোগ্য মনে না করে, তার জন্য নিছক এ অজুহাতে বসে থাকা উচিত নয়; বরং তার আরও জোরদার মেহনত করা উচিত। অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অযোগ্যদের মাধ্যমে শুরু হয়ে যোগ্যদের হাত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর তখন তার প্রকৃত উন্নতী হাসিল হয়। আর এর পূর্ণ ছওয়াব অযোগ্যরাও লাভ করে। কেননা, হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

من دعا إلى حسنة – الحديث

সুতরাং অযোগ্যদের কোমর বেঁধে মেহনত করা উচিত।

আমি নিজেও নিজেকে অযোগ্য মনে করি বলেই এ কাজে লেগে আছি। হতে পারে এক পর্যায় গিয়ে কোন যোগ্য লোকের হাতে গিয়ে এ কাজের আসলরূপ প্রকাশ পাবে। আর তখন তার ছওয়াব আমিও পাব। (মালফুযাত হযরত দেহলুভী)

ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি শিরোনামা নির্ধারিত করেছেন–

باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظوا الإيما و العلم و يخبروا من ورائهم

অর্থাৎ– নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু কায়েসের প্রতিনিধী দলকে কিছু কথা বলার পর বললেন, এগুলো মুখস্থ করে নাও এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) باب القراءة على المحدث (মুহাদ্দেছের সামনে হাদীছ পাঠ করা) এ অধ্যায়ে এক বেদুঈন সাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি

এসে আরজ করলেন, আমাদের কাছে আপনার দূত এসে আপনার পক্ষ থেকে এ বার্তা শুনিয়েছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমার দূত সত্য বলেছে। তিনি আরজ করলেন, আপনার দূত এও বলেছেন যে, আমাদের উপর নাকি পাঁচ বেলা নামায ফরয করা হয়েছে। ইরশাদ করলেন, আমার দূত সত্য বলেছে। সাহাবী আরয করলেন, তিনি এও বলেছেন যে, আমাদের উপর নাকি এক মাসের রোযা ফরয করা হয়েছে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে সত্য বলেছে। সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন! আমি এ জিনিসগুলোর মধ্যে কমও করব না বেশীও করব না। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আলোচ্য হাদীছে কম-বেশী না করার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমি আমার কওমকে পৌঁছাতে কোন প্রকার কমবেশী করব না।

'আনফাসে ঈসা' গ্রন্থে হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তাবলীগ দু' ধরনের। 'খাস' ও 'আম' (বিশেষ ও সাধারণ)। তাবলীগে 'খাস' অর্থাৎ বিশেষ বিষয়ের তাবলীগ, এটি পৃথক পৃথকভাবে সকলের দায়িত্ব। আর তাবলীগে 'আম' অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ের তাবলীগ। এর জন্য আলিম হওয়া আবশ্যক।

অনুরূপভাবে 'গায়রে মানসূস্' (যেসব বিষয়ে কোরআন হাদীছে প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ নেই) সেসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আলেম হওয়া আবশ্যক। 'মানসূস' (কোরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণিত বিষয়াদি) সম্পর্কে আলোচনা করতে আলেম হওয়া আবশ্যক নয়; যে কোন মুসলমানই এ কাজ করতে পারে।

গোড়া থেকে আমি এ পার্থক্যটুকুই বুঝাতে চেষ্টা করে এসেছি যে, ওয়াজ করার জন্য আলেম হওয়া শর্ত কিন্তু বিশেষ কোন বিষয় পৌঁছে দেয়ার জন্য

আলেম হওয়া শর্ত নয়; বরং যে কোন ব্যক্তিই তা করতে পারে এবং প্রত্যেকের জন্য করা আবশ্যক।

হযরত থানুভী (রহঃ) তাবলীগের আদবসমূহ শিরোনামে তার এক ওয়াজে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাতেও তিনি তাবলীগে 'খাস' আর তাবলীগে 'আম'-এর মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন, তাবলীগে খাসের জন্য মাসআলার হাকীকত সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল হওয়া এবং তা বর্ণনা করার সামর্থ্য থাকা পূর্ব শর্ত। আর তাবলীগে আম অর্থাৎ ওয়াজ করা এটা ওলামা কেরামের কাজ; চাই প্রচলিত নিয়মে মাদ্রাসায় পড়ে আলেম হোক কিংবা কোন আলেমের কাছে মাসআলা জেনে জেনে আলেম হোক। তবে শর্ত হল কোন বড় আলিম কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে। যেমন, সাহাবা কেরামও তো কোন মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন নাই। তারাও তো শুনে শুনেই তাবলীগ করতেন। তাই বলে কোন আলেমের স্বীকৃতি ছাড়া যে কেউ নিজেকে এর যোগ্য মনে করবে না।

হযরত মাওলানা আশ্রাফ আলী থানুভী (রহঃ)-এর নির্দেশে হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উছমানী কর্তৃক অনুদিত বুহ্জাতুন্ নুফুসে (এ গ্রন্থটি বুখারী শরীফ থেকে সংগৃহীত হাদীছের সংকলন) লিখা রয়েছে যে, তাবলীগের কাজে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। কেননা, আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার দ্বারা তাবলীগই উদ্দেশ্য।

সত্যি পরিতাপের বিষয় নয় কি, এক দিকে ওলামা কেরাম শুধু দরস-তাদরীস (পঠন-পাঠন)-কেই যথেষ্ট মনে করছেন, অন্য দিকে সাধারণ মানুষকেও আমর বিল মা'রূফ ও নেহী আনিল মুনকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন অথচ এরা যেই আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিছ, তাঁদের মূল দায়িত্ব 'আমর-নেহী ও তাবলীগই ছিল। পারিভাষিক দরস-তাদরীস তাদের দায়িত্ব ছিল না। দরস ও তাদরীস মূল লক্ষ্যে পৌঁছার উপায় ও উপকরণ মাত্র, যাতে মুবাল্লেগ সহী ইলমের সাথে নির্ভুল তাবলীগ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয়কি যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে উপায় ও মাধ্যম নিয়েই শুধু ব্যস্ত।

সাধারণ মুসলমানের জেনে রাখা উচিত যে, শরীয়তের আহকামের তাবলীগ করা শুধু আলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানের

উপর ফরয হল, আহকাম সংক্রান্ত যতটুকু ইলম অর্জিত হয়েছে ততটুকু অন্যের কাছে পৌছে দেয়া। যেমন, নামায যে ফরয এ কথা কারোই অজানা নেই। সুতরাং বে-নামাযীকে নামাজের জন্য সতর্ক করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে যেসব বিষয় গুনাহ বলে যার জানা রয়েছে, সে গুনাহের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়া তার দায়িত্ব। অবশ্য ওয়াজের সুরতে তাবলীগ করা সাধারণ লোকদের জন্য অনুচিত। কেননা, এ দায়িত্ব ওলামা কেরামের। জাহেল ব্যক্তি ওয়াজ শুরু করলে সভাবতই ভুল করে বসবে। যার কারণে গোমরাহীর প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই সাধারণ লোকের উচিত ওয়ায না করে শুধু নসীহত স্বরূপ একে অপরকে শরীয়তের আহকাম জানিয়ে দেয়া। এতটুকু করাও সমাজ সংস্কারের জন্য অপরিহার্য।

সমালোচনা– ৭

মাদ্রাসা ও খানকার বিরোধিতা

আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, মাদ্রাসা ও খানকাকে তাবলীগের বিপক্ষ একটি বিষয় মনে করা হয়। বস্তুত এটিও একটি উদ্ভট প্রশ্ন। কেননা, মাদ্রাসা খানকা ও তাবলীগ জামাত প্রত্যেকটিরই ভিন্ন ভিন্ন ফায়দা রয়েছে। আর খানকা ও মাদ্রাসাতে সাধারণতঃ যারা আগ্রহী হয়ে এসে থাকে তারাই উপকৃত হয়। অপরপক্ষে তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে আগ্রহী-অনাগ্রহী, জাহেল-অজ্ঞ সকলকেই দ্বীনের দিকে টেনে আনা হয়। সুতরাং এর ফায়দা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, তাবলীগ জামাত মাদ্রাসা ও খানকা থেকে অধিক গুরুত্বের অধিকারী এবং অধিক পরিপূর্ণ।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) জনৈক আলেমের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রচলিত দরস ও তাদরীস (পঠন-পাঠন) মূল লক্ষ্যের ভূমিকা মাত্র। আর মূল লক্ষ্য হল তাবলীগ। অধুনা সবচে' বড় ক্রুটি হল যে, দরস ও তাদরীসকে মূল লক্ষ্য মনে করা হচ্ছে। ফলে যেসব ওলামা কেরাম তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন না তারা বিরাট এক ফযীলত থেকে বঞ্চিত থেকে যান। আর এই 'তাবলীগ'ই ছিল আম্বিয়া কেরামের দরস।

সুতরাং প্রথমে দরস ও তাদরীস আর ইলম থেকে ফারেগ হয়ে তাহসীল ও

তাবলীগ উভয়টিরই হক্ক আদায় করা উচিত। কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে অন্যদিক থেকে উদাসীন হয়ে পড়া মারাত্মক ক্ষতিকর। উলামা কেরামের এদিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করা উচিত এবং তাবলীগেও কিছু সময় ব্যয় করা উচিত। অধুনা মাদ্রাসাগুলোতে সবচে' বড় ক্রুটি হল এই যে, ওলামা কেরাম পঠন পাঠনে যে পরিমাণ ব্যস্ত সে তুলনায় তাবলীগের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করছেন না। পঠন পাঠনের তুলনায় অর্ধেক সময়ও তাবলীগে ব্যয় হয় না।

অনুরূপভাবে আরেক আলেমের প্রশ্নের জবাবে মাওলানা থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, দ্বীনে এলাহীতে তাবলীগই হল মূল। আর দরস ও তাদরীস তার ভূমিকামাত্র। তবে শর্ত হল অনর্থক কোন ফিৎনা ফ্যাসাদে যেন জড়িয়ে না পড়তে হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় নীরব থাকাই উত্তম।

একবার আমি রেলগাড়ীর সফরে জনৈক ব্যক্তিকে টাখনুর নীচে পায়জামা পরতে দেখে তাকে বাধা দিয়ে বললাম যে, এটা শরীয়ত পরিপন্থী; সুতরাং তোমার পায়জামা ঠিক করে নেয়া উচিত। অমনি লোকটি শরীয়তকে মা তুলে গালি-গালাজ শুরু করে। সেদিন থেকে বিনা প্রয়োজনে কাউকে কিছু বলা ছেড়ে দিয়েছি। কেননা এতক্ষণ তো গুনাহগার ছিল এখন তো কুফর পর্যন্ত গড়াল।

(ইফাযাতে ইয়াওমিয়াহ– ১ম খণ্ড)

একবার বলেন, আল্লাহর পথে দাওয়াতই হল মূল কাজ। আর এ দাওয়াতকে সুরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য মাদ্রাসার প্রয়োজন। সুতরাং মাদ্রাসা থেকে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করার পর আল্লাহর পথে দাওয়াতেও কিছু সময় ব্যয় করা উচিত, যার সহজ পদ্ধতি হল ওয়াজ করা, আর পঠন-পাঠন হল তার ভূমিকা। সুতরাং এ দায়িত্বও আঞ্জাম দেয়া উচিত। যেমন নামাযের জন্য প্রয়োজন অযুর, আর ওযুর জন্য প্রয়োজন পানি সংগ্রহ করা। অনুরূপভাবে তাবলীগের জন্য প্রয়োজন পঠন-পাঠন। কিন্তু শুধু ওযু আর পানি সংগ্রহের পিছনে পড়ে থেকেই নামাযের সময় পার করে দেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অথচ আমরা মূল কাজ 'হক্কের দিকে দাওয়াত'কে ভুলে গিয়ে তার ভূমিকা পঠন ও পাঠনেই ব্যস্ত হয়ে আছি। পরিতাপের বিষয়, যারা দাওয়াতের যোগ্য ছিল তারাই দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়ে ভূমিকার পিছনে পড়ে রয়েছে।

(আত্ তাবলীগ– ২০ ওয়াজ, দাওয়াত ইলাল্লাহ)

বিগত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে মাদ্রাসা ও খানকার কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল। তাদের দৃষ্টিতে মাদ্রাসা ও খানকা তাবলীগ জামাতের জন্য জমি চাষ দেয়া তুল্য। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাদ্রাসা ও খানকাতে একমাত্র তারাই আসবে যাদের মাঝে দ্বীনের তলব রয়েছে। আর লোকদের মাঝে দ্বীনের তলব পয়দা করার জন্য ব্যাপক তাবলীগই একমাত্র উপায়।

বলাবাহুল্য যে, দ্বীনের সহী তলব না জন্মানো পর্যন্ত মাদ্রাসা ও খানকাকে জিজ্ঞাসা করার মত লোক পাওয়া যাবে না। তাবলীগের বিগত ইতিহাস খুলে দেখুন; এক মেওয়াত অঞ্চলেই যেখানে ইসলামের নাম গন্ধও ছিল না সেখানে বিগত চল্লিশ বছরে হাজারের উর্ধ্বে আলেম জন্ম নিয়েছে এবং অসংখ্য সালেকীন হযরত থানুভী (রহঃ), হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) ও হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর খেলাফত লাভ করেছেন।

আল্লামা আলী মিয়া হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে লিখেন যে, হযরত মাওলানা খুব ভালোভাবেই এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের ঈমান একীনই যেখানে অবনতিশীল, দ্বীনের আযমত ও মর্যাদাবোধই যেখানে অন্তর থেকে বিলুপ্তপ্রায়, দ্বীনের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো থেকেই সাধারণ মুসলমান যেখানে বঞ্চিত হয়ে চলেছে; সেখানে দ্বীনের উচ্চস্তরীয় বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কিছুটা অকালচেষ্টাই বটে। কেননা হৃদয়ের মাটিতে দ্বীনের শিকড় মজবুত হয়ে যাওয়ার পরই হলো এগুলোর উপযুক্ত ক্ষেত্র। আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মন-মানস ও চিন্তা-প্রবণতার ক্রমোস্ফীত ঢলের গতিমুখ তিনি ধরে ফেলেছিলেন এবং যথার্থই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, নতুন নতুন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনী মারকাজ গড়ে তোলা তো দূরের কথা, এমতাবস্থায় পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রগুলোর অস্তিত্বও শংকামুক্ত নয়। কেননা যে সকল ধমনী দ্বারা ধর্মীয় কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোতে জীবন-শোণিত সঞ্চালিত হতো উম্মতের দেহাভ্যন্তরে; সেগুলো ক্রমশঃ শুষ্ক ও সংকুচিত হয়ে আসছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি এবং সেগুলোকে রক্ষার গুরুত্ববোধ এবং সেখানে কর্মরতদের দ্বীনী খেদমত ও অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির মানসিকতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আল-হাজ শায়েখ রশীদ আহমদ সাহেবের নামে লেখা হযরতের এক দীর্ঘ চিঠি উদ্ধৃত করেন, যাতে তিনি মাদ্রাসার গুরুত্ব এবং মাদ্রাসাগুলো অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাব্লীগের প্রয়োজনীয়তার আলোকপাত করেন।

এরপর এ চিঠির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী মিয়া লিখেন; মুসলমানদের কল্যাণের জন্য মাদরাসার অস্তিত্বকে মাওলানা অপরিহার্য মনে করতেন এবং মুসলমানদের মাথার উপর থেকে এ রহমত-ছায়া উঠে যাওয়াকে বিপদ-মুছীবত ও আযাব-গযবের কারণ মনে করতেন।

তবে মাওলানা মনে করতেন যে, আজকের দ্বীনী মাদরাসাগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদেরই অবদান এবং তাদেরই তৈরী ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আসল দ্বীনী দাওয়াত ও মেহনত মোজাহাদার বরকতে মুসলমানদের অন্তরে দ্বীনের যে তলব ও কদর পয়দা হয়েছিলো তারই ফলে দ্বীনদার মুসলমানগণ আগামী প্রজন্মের হাতে দ্বীনকে তুলে দেয়া এবং দুনিয়াতে কায়েম ও জিন্দা রাখার জন্য দেশব্যাপী মক্তব মাদরাসার জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন এবং সৌভাগ্য মনে করে সেগুলোর খিদমতে আত্মনিয়োজিত হয়েছিলেন। সেই প্রাচীন উৎস থেকে উৎসারিত জযবা উদ্দীপনার যে ক্ষীণ ধারা মুসলমানদের প্রায় বিশুষ্ক হৃদয় ভূমিতে এখনো মরা নদীর মতো বয়ে চলেছে তারই কল্যাণে দেশের মক্তব মাদরাসাগুলো এখনো সচল সজীব রয়েছে এবং দ্বীন শিক্ষার্থী ও তালিবে ইলমদের আগমন কিছুটা হলেও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত তিক্ত ও দুঃখজনক বাস্তবতা এই যে, ধর্মানুরাগ ও দ্বীনী জযবার এ অমূল্য সম্পদ বৃদ্ধি লাভের পরিবর্তে দিন দিন মারাত্মক ভাবেই হ্রাস পেয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য যে, এ সুরতেহাল দ্বীন ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যত অস্তিত্বের জন্য খুবই আশংকাজনক। (দ্বীনি দাওয়াত)

সমালোচনা– ৮

আলেমদের বর্তমানে জাহেলদের আমীর নিযুক্তকরণ

মৌখিক এবং লিখিতভাবে এ প্রশ্নটি কয়েকবার এসেছে যে, অনেক সময় আলেমদের বর্তমানে জাহেলদের আমীর নিযুক্ত করে দেয়া হয়। বাহ্যত প্রশ্নটি

বেশ গুরুত্বের অধিকারী হলেও বাস্তব সত্য এই যে, কোন বিষয়ের নেতৃত্ব দানের জন্য নিছক ইলমই যথেষ্ট নয়; বরং পরিচালনার যোগ্যতা এবং চিন্তা-ফিকিরের দক্ষতাও আবশ্যক। তাছাড়া উত্তম জনের বর্তমানে অনুত্তম জনকে আমীর নিযুক্ত করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই চলে এসেছে। যেমন, তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-কে বিভিন্ন বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছেন।

সমালোচকদের কোন যুগেই অভাব ছিল না। সুতরাং কতক লোক এ বিষয়ে আপত্তি তুলে বসল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবা দান করলেন এবং হামদ ও সালাতের পর ইরশাদ করলেন–

তোমরা উসামার নেতৃত্বে আপত্তি তুলছ, আর তোমরা এর পূর্বেও তাঁর পিতা যায়েদের নেতৃত্বে আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহর কসম! সে নেতৃত্বের হকদার এবং আমার অধিক প্রিয়। (বুখারী)

তার উপর অভিযোগের এটিও একটি দিক ছিল যে, একজন নবযুবককে শীর্ষস্থানীয় মুহাজেরদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হল। (হায়াতে সাহাবা)

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সায়াহ্নে হযরত উসামা (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তা বাস্তবায়ন করেন। হাদীছ ও সীরাতগ্রন্থে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যে, প্রথমতঃ এভাবে এ বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারেই লোকেদের আপত্তি ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে অবিচল ছিলেন যে, যে বাহিনী স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরী করে গেছেন তাকে আমি বাধা দিতে পারি না।

অতঃপর আনসাররা হযরত ওমর (রাঃ)-কে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে আলোচনার জন্য পাঠালেন যে, যদি একান্তই এই বাহিনী প্রেরণ করতে হয় তাহলে আমাদের মধ্য থেকে একজন বয়স্ক আমীর নিযুক্ত করে দিন। হযরত ওমর (রাঃ) এই বার্তা নিয়ে পৌছলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর দাড়ী ধরে বললেন, তোমার মরে যাওয়া ভাল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আমীর নিযুক্ত করে গিয়েছেন। আর তুমি আমাকে বলছ, তাকে নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার করে দেই।

হযরত ওমর (রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে বললেন, অপদার্থগুলো! তোমাদের কারণে আমাকে আল্লাহর রাসূলের খলীফার তিরস্কার শুনতে হল। (ঘটনাটি বেশ দীর্ঘ।) [হায়াতে সাহাবা]

অনুরূপভাবে একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ সে জামাতে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)ও উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিত হাদীছ (হায়াতুস্ সাহাবা)-তে রয়েছে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুহানিয়ায় যে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন, তাতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং ইরশাদ করেন, সে তোমাদের থেকে বেশী উত্তম নয়, তবে ক্ষুৎপিপাসায় অধিক ধৈর্যধারণকারী। (হায়াতুস্ সাহাবা, ২ খণ্ড)

এর দ্বারা বুঝা গেল, আমীর নিযুক্ত করার ব্যাপারে নিছক শ্রেষ্ঠত্বই বিবেচ্য নয়; বরং আরো অনেক কিছু দেখার রয়েছে।

একবার হযরত কায়েস বিন সাআদকে একদল সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন অথচ সে বাহিনীতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব এবং হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ)ও ছিলেন। (হায়াতুস্ সাহাবাহ, ২য় খণ্ড)

একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) তার খেলাফত আমলে ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানকে আমীর নিযুক্ত করলেন। আর তার অধিনে ছিল 'আমীনু হাযিহিল উম্মাহ' (উম্মতের বিশস্ত ব্যক্তি) হযরত আবু উবায়দাহ ও 'ইমামুল উলামা' হযরত মু'য়ায বিন জাবাল (রাঃ)। এ উপাধী তারা স্বয়ং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছিলেন। [বিস্তারিত ঘটনা হায়াতুস্ সাহাবাতে রয়েছে]

হযরত আবু বকর (রাঃ) মুহাজের ও আনসারদের এক বিরাট জামাতের উপর আমীর নিযুক্ত করে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করেছ যে, তোমাকে এমন কতক লোকের উপর আমীর নিযুক্ত করেছি যারা তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের ব্যাপারে তাঁরা তোমার কাছে মুহতাজ নন। সুতরাং আখেরাতের শাসক বনতে চেষ্টা কর। সব বিষয়ে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর। (হায়াতুস্ সাহাবা)

ইফাযাতে ইয়াওমিয়াতে হাকীমুল উম্মত হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে যে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসেম যখন হিন্দুস্তানের উপর আক্রমণ করল তখন তার বয়স ছিল সতের বছর। অথচ সেনাবাহিনীতে বড় বড় প্রবীণ অভিজ্ঞ লোকেরাও ছিলেন। কিন্তু সকলেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এসবই ঈমান ও স্বচ্ছবোধের বদৌলতে ছিল। কারণ সতের বছর বয়সে একটি দেশের উপর চড়াও করা স্বাভাবিক নয়। আসলে তখন যুগ ছিল নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের নিকটবর্তী, তখন দ্বীনের সমঝ ছিল মানুষের মাঝে ব্যাপক। এরপর নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সময়ের যতই ব্যবধান ঘটেছে ততই এ বিষয়ে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

বস্তুত আমীর হওয়ার জন্য শুধু বয়ঃবৃদ্ধ, শ্রেষ্ঠ কিংবা বড় জ্ঞানী হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সবচে' বেশী জরুরী বিশেষতঃ সফরের সময় সাহসিকতা, শক্তি এবং ধৈর্যধারণ ক্ষমতা। তাবলীগ জামাতে আমীর নিযুক্তির সময় বিশেষভাবে যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তা হল; ইতিপূর্বে তিনি কখনো জামাতে সময় লাগিয়েছেন কিনা। কেননা, জামাতে যে একবার সময় লাগিয়েছে স্বভাবতই তার অভিজ্ঞতা অন্যদের তুলনায় বেশী হবে। এজন্যই অনেক সময় এমন অনেকের উপর কোন পুরাতন সাথীকে আমীর নিযুক্ত করে দেয়া হয়; — আর করা উচিতও — যিনি অন্য দিকে শর্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই ময়দানে অনভিজ্ঞ। প্রবাদে আছে—

" سل المجرب و لا تسئل الحكيم "

"প্রজ্ঞার অধিকারীকে নয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা কর।"

এজন্যই দেখা যায় অনেক অল্প ডিগ্রীধারী ডাক্তার অভিজ্ঞতার কারণে অধিক ডিগ্রীধারী ডাক্তারের চেয়েও বেশী পারদর্শী হয়ে থাকেন।

১৩৩৭ হিজরী সালে আমার প্রথম হজ্জের সফর ছিল। সে বছর মদীনার পথ বেশ বিপজ্জনক ছিল। যার কারণে মদীনার লোকজন বেশ কম এসেছিল। হজরত আমাদেরকে বললেন, আমার তো বেশ কয়েকবারই মদীনায় যাওয়ার

সুযোগ হয়েছে আর প্রত্যেকবারই সেখানে অবস্থানের নিয়তে গিয়েছিলাম। কিন্তু হযরত মাওলানা মুহিববুদ্দীন সাহেব অনুমতি দিতেন না। তোমাদের যেহেতু এটা প্রথম হজ্জ; পুনরায় আসতে পারবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই তাই তোমরা গিয়ে আস।

যাহোক আমরা রওনা হলাম। হযরত এই অধমকেই আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। অথচ, এই জামাতে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী-গুণী ও বয়ঃবৃদ্ধরাও ছিলেন। এ বিবরণ আমার রচিত 'আপ বীতী' নামক কিতাবে হজ্জের আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে প্রসঙ্গতঃ তাবলীগ জামাতের উপর আরোপিত এ অভিযোগ সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। আরো বলে এসেছি যে, অনেক সময় তাবলীগ জামাতে যোগ্য লোকের অভাবের কারণে অপারগ হয়েই অযোগ্যকে আমীর বানিয়ে দিতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি প্রশ্নেরও জবাব দেয়া হয়েছে যে, যোগ্য কেউ যখন ছিল না তাহলে জামাত পাঠানোরই বা প্রয়োজন ছিল কি? বস্তুত এ প্রশ্নও অজ্ঞতা হেতু হয়ে থাকে। কেননা, তাবলীগের গুরুত্ব ও অপরিহার্য্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর এ প্রশ্নের অবতারণা মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কেননা, শরীয়তের সর্বসম্মত মাসআলা হল উম্মী ব্যক্তির নামায উম্মী ব্যক্তির পিছনে অবৈধ নয় এবং কোন কারী কিংবা আলেম নেই বলে জামাত ছাড়া নামায পড়া জায়েয নেই।

আমীর হওয়া তো স্বাভাবিক ও সাময়িক ব্যাপার। হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর 'মাজালিসে ইয়াওমিয়া'তে একাধিক জায়গায় তিনি ইরশাদ করেছেন যে, অনেক সময় বুযুর্গানে দ্বীন অনেক অযোগ্যকেও বাইআতের ইজাযত দিয়ে দেন। এ বিষয়টি আমার 'আপ বীতি'তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত থানুভী (রহঃ) তাঁর এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, কারো ইমাম হওয়ার পিছনে আর কোন যুক্তি না থাকলেও এ একটি যুক্তিই যথেষ্ট যে, অযোগ্যতা সত্ত্বেও যখন সকলে মিলে কাউকে ইমাম বানিয়ে দিচ্ছে তখন অসম্ভব কিছুই না যে, আল্লাহ পাক তাকে মানুষের নেক গুমানের উপর যোগ্য করে

দিবেন। এ ধরনের ঘটনা বহু ঘটেছে যে, বুর্যুগানে দ্বীন অনেক অযোগ্যকে খেলাফত দিয়ে দিয়েছেন। পরে আল্লাহ পাক এর বরকতে তাকে যোগ্যতা দান করে দিয়েছেন। (মাজালেসুল হিকমাহ)

১৩৩০ হিজরী সালে ২৭ বছর বয়সে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর বিয়ে হল। এ বিয়ের অনুষ্ঠানে আ'লা হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী, হযরত আল-হাজ খালিল আহমদ সাহেব, হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-কে ইমামতীর জন্য আগে বাড়িয়ে দেয়া হল, তখন সে পরিবারের মুরুব্বী হযরত মাওলানা বদরুল হাসান (রহঃ) উপহাসের ছলে বলে উঠলেন, এত ভারী ভারী ডাব্বার ইঞ্জিন এত ছোট! হযরত হাকীমুল উম্মত জবাবে বললেন, ইঞ্জিন যদি শক্তিশালী হয় তাহলে অসুবিধার কি আছে?

মোটকথা, স্বল্প বয়স্ক আমীরও অনেক সময় জামাত অধিক কাবু করতে সক্ষম হয়।

সমালোচনা– ৯

হযরত থানুভী (রহঃ) ও হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ)-এর অপছন্দঃ

আরেকটি প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় যে, হযরত হাকীমুল উম্মত ও হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) প্রচলিত এ তাবলীগকে পছন্দ করতেন না।

হযরত শায়খুল ইসলাম সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা আসছে যে, তিনি বরাবর বিভিন্ন তাবলীগী ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর খেদমতে ১৩৪০ হিজরী সালে বজলুল মজহুদ ছাপাকালে প্রায়ই হাজির হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অবশ্য তাবলীগের এ আন্দোলন তখনও শুরু হয়নি। তারপর হিজরী ১৩৪৬ সালে হেজাজ থেকে ফেরার পর থেকে ১৩৬২ সালের ১৬ ই রজব অর্থাৎ হযরত হাকীমুল উম্মতের মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর হাজির হয়েছি। প্রতি মাসে সম্ভব না হলেও দু' মাস অন্তর অবশ্যই একবার সাক্ষাত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে কখনও হযরতের মুখ থেকে

তাবলীগের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিনি। অবশ্য মানুষের মুখে শুনি যে, তিনি নাকি তাবলীগ-বিরোধী ছিলেন। আর হযরতের শীর্ষস্থানীয় খোলাফাদের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে সামনে আসছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা কি পরিমাণ তাবলীগের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। অপরপক্ষে বিভিন্ন সূত্রে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর এ উক্তি শুনেছি যে, মৌলভী ইলিয়াস নিরাশাকে আশায় পরিণত করে দিয়েছেন।

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে আল্লামা আলী মিয়া উদ্ধৃত করেন যে, একবার হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) হযরত হাকীমুল উম্মতের সাথে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাইলে তিনি ইরশাদ করলেন, এ বিষয়ে কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। কেননা, যুক্তির প্রয়োজন তো হয় কোন কিছুর সত্যতা প্রমাণের জন্য। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত। সুতরাং কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। সত্যি কথা বলতে কি; আপনি তো মাশাআল্লাহ 'নিরাশা'কে 'আশায়' পরিণত করে দিয়েছেন।

প্রথম দিকে হযরতের একটু দ্বিধা ছিল যে, ইলম ছাড়া এরা কিভাবে তাবলীগের এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিবে। কিন্তু যখন হযরত মাওলানা জাফর আহমদ (রহঃ) সাহেব তাঁকে বললেন যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা মারকায থেকে শিখিয়ে দেয়া সীমিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, তখন তিনি সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হন।

আর এ বিষয়ে তো পিছনে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে যে, তাবলীগ আর ওয়াযের মধ্যে পার্থক্য কি এবং ওয়ায করার জন্য আলেম হওয়া শর্ত হলেও তাবলীগ সবাই করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর মন্তব্য পিছনে বিশদ আলোচিত হয়েছে। এরপরও যদি তিনি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সমালোচনা করে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে হয়ত তাঁর কাছে কোন জাহেল ব্যক্তির ওয়াজ, কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অসংগত আচরণের কথা শোনানো হয়েছে। সে হিসাবে তাঁর সমালোচনা যথার্থই ছিল।

প্রায় আট বছর হল এক ব্যক্তি তার চিঠিতে একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, এ তাবলীগ জামাত সম্পর্কে হযরত হাকীমুল উম্মতের মূল্যায়ন কি? তিনি কি এটা অপছন্দ করতেন? দ্বিতীয়তঃ আমার শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার শায়খ

আমাকে এতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন না। অথচ আমি এটাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি? আমার এ চিঠি সে সময়ই আমার রচিত 'চশমায়ে আফ্‌তাব' কিতাবে মুদ্রিতও হয়েছিল। পূর্ণ চিঠিটি এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি–

"বাদ তাসলিম আরয এই যে, আপনার চিঠি যথাসময়ই হস্তগত হয়েছে। হযরত থানুভী (রহঃ) এ জামাতকে অপছন্দ করতেন বলে আমার জানা নেই; বরং আমার জানামতে তিনি একাধিকবার নিজামুদ্দীন; এমনকি মেওয়াতেও তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন। আর আমার চাচা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)ও প্রায়ই থানাভোন তাঁর খেদমতে হাজির হতেন। সে সময় প্রায় এ অধমেরও সাথে থাকার সুযোগ হতো। চাচাজান প্রত্যেকবারই তাঁর এ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং হযরত (রহঃ) খুশী প্রকাশ করতেন এবং দু'আও দিতেন।

এটা তো আমার নিজের দেখা বিষয়; অবশ্য এ কথা আমিও শুনে আসছি যে, হযরতের খোলাফা ও মুতাআল্‌লিকীনদের অনেকে এটা পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে আমার মতামত হল, তাঁদের তাবলীগ জামাতকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। লোকমুখে শুনেই অভিমত পোষণ করেছেন। তাছাড়া যেহেতু এ জামাতের সংঘবদ্ধ কোন দল নেই; বরং আপনি নিজেও দেখেছেন যে, এতে সবদেশের এবং সব ধরনের লোক সমবেত হয়। ফলে তাবলীগের উসূল সম্পর্কে আনাড়ী অনেক নতুন মানুষ থেকে অনেক সময় বেউসূলিও হয়ে যায়।

এ অধমের তাবলীগ জামাতকে গোড়া থেকেই অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। এখনও বিভিন্ন জামাতের কারগুজারী প্রচুর দেখার ও শোনার সুযোগ মিলছে। আমার দৃষ্টিতে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ আন্দোলন অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর উসীলায় হাজার নয়; বরং লাখো লাখো বেনামাযী ও বদ্‌দ্বীন দ্বীনদার বনে গেছে। এরও সংখ্যা কম মিলবে না যে, যারা এক সময় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ওলামা কেরামের নাম শুনতে পারতো না তারা

এখন মসজিদ-মাদ্রাসার পাগল। শুধু হিন্দুস্তান, পাকিস্তানেই নয়; বরং আরব দেশগুলো সহ ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ এখন দ্বীনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অনাবাদ মসজিদগুলোতে এখন রীতিমত শুধু নামাযই নয় বরং তারাবীহও পড়া হচ্ছে।

এ কথা অস্বীকার করছি না যে, এ জামাতের কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া কোন দল বা সংগঠন আছে? লাভ লোকসান মিলেই বিচার করা আবশ্যক। হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা এবং আমাদের মাদ্রাসার নাজিম আল-হাজ্জ মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেবও বায়আত করার সময় মুরীদদেরকে এ বিষয়ে তাগিদ করেন। এ ছাড়াও আরও অনেক পীর বুযুর্গ তাদের মুরীদদের এ বিষয়ে তাগিদ করে থাকেন।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর আর একজন বিশিষ্ট খলীফা হযরত মুফতী শফী সাহেব পাকিস্তানী। একবার হজ্জ থেকে এসে আমার উপস্থিতিতে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেবকে তার মাদ্রাসায় ডাকিয়ে নিয়ে এ আন্দোলনের উপর জোরদার তকরীর করান।

এই মধ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ ছাহেব মদীনা থেকে পাকিস্তান হয়ে আসেন। তিনিও বলেন যে, মুফতী ছাহেব অত্যন্ত জোর দিয়েই এ দিকে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজেও তার তাকরীরের পর জোরদার সমর্থন করেন।

এসব সত্ত্বেও আপনার সম্পর্কে আমার পরামর্শ হল, আপনার শায়খের অনুমতি ছাড়া এতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। অবশ্য আপনার শায়খ অনুমতি দিলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। আর আপনার শায়খের অনুমতি না পাওয়ার কারণে যদি অংশগ্রহণ নাও করেন, বিরোধিতা যেন না করেন। কেননা, আমার দৃষ্টিতে এ জামাতের সাথে আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে। এ জামাত সম্পর্কে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে বহু সূত্রে

বিভিন্ন সুসংবাদ শোনা যাচ্ছে এবং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে স্বপ্ন মারফত অনেককেই এতে অংশগ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

এর দৃষ্টান্ত হল যেমন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

اری رؤياكم قد واطئت فى السبع الاواخر الحديث

শেষের সাত দিনের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্নগুলো দেখছি এক হয়ে যাচ্ছে।

এ হাদীছের আলোকে স্বপ্নযোগে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতগুলো সমর্থন এবং আরও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মতে এ জামাতের বিরোধিতা করা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়।

অংশগ্রহণ না করা ভিন্ন জিনিস। ব্যক্তিগত কোন বিশেষ ওজরের কারণে কিংবা মনে না চাওয়ার কারণে কেউ হয়ত অংশগ্রহণ না করতে পারে, সেটা আমার দৃষ্টিতে এত আশংকাজনক নয়। কিন্তু বিরোধিতা ভিন্ন জিনিস। এটাত হল আমার অভিমত। প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য কোন স্পষ্ট ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করার অনুমতি অবশ্যই আছে।

যাহোক, এ অধমের বিভিন্ন ব্যস্ততা ও অসুস্থতার কারণে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হয়নি। আপনার সাথে মাদ্রাসার সূত্রে বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অভিমত পেশ করলাম। যদি সত্য লিখে থাকি, তবে এটা আল্লাহর দান। আর যদি ভুল লিখে থাকি, তবে সেটা আমারই অপরাধ এবং শয়তানের কারসাজী, ওয়াস্‌সালাম।"

যাকারিয়া, মাজাহেরুল উলূম
সাহারানপুর
লিপিবদ্ধকরণে, মুহাম্মদ ইসমাঈল সুযুতী
১৩ জুমাদাছ্ ছানী– ১৩৮৪ হিজরী

হযরত থানুভী (রহঃ) যদি কখনো কোন মুবাল্লিগ কিংবা জামাত সম্পর্কে কোন সমালোচনা করে থাকেন, তবে তা অস্বীকার করছি না। হযরত (রহঃ)-এর শাসন ও সংশোধন সম্পর্কে কার জানা নেই? ছাত্র শিক্ষক বিশেষতঃ তার খাদেম ও এজাযতপ্রাপ্তরা কেউ তাঁর শাসন থেকে রেহাই পায়নি। তিনি নিজেই বলেন, আমার ঝগড়া (শাসন) থেকে বেঁচেছে এমন কেউ নেই। (ইফাযাত)

'খান খলীলের' পরিশিষ্টে জামঃ ৮-এর টীকায় হযরত থানুভী (রহঃ)-এর ইরশাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এজাযতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও মানুষের ভুল হতে পারে।

এই মুহূর্তে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ছে, যা আল-ইমদাদ সাময়িকীর মুহাররম ১৩৩৬ হিজরীতে উদ্ধৃত রয়েছে।

একবার হযরতের ইজাযত প্রাপ্ত জনৈক মাওলানা এই মর্মে একটি চিঠি লিখে হযরতের খেদমতে পেশ করেন যে, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে অনেক ফিৎনা বিরাজ করছে; আপনি কিছু বলে দিন তাহলে আমি একটু মনঃবল পাব। হযরত ইরশাদ করলেন, কি বলবো?

জবাবে তিনি পাশ কেটে যেতে চাইলেন। হযরত ইরশাদ করলেন– পরিষ্কার বল, তোমার এই চিঠিতে কি বুঝাতে চেয়েছ। তখন তিনি আরজ করলেন, অর্থাৎ বলে দিন যে, আল্লাহ সহায়ক। হযরত ইরশাদ করলেন, এটা তো এমন বিষয় হল, যা জিজ্ঞাসা করতে আমাকে তোমার মুখাপেক্ষী হতে হল। আর তুমি তো আমার বলার আগেই জানো। তারপর আমার মুখ থেকে বের করানোর কি প্রয়োজন ছিল। তারপর বললেন, সরে যাও এখান থেকে, কথা বলা শিখনি। দু'আ চাওয়ার প্রয়োজন ছিল স্পষ্ট বলতে, দু'আ করুন। উপস্থিত এক ভদ্রলোক তাঁর পক্ষে সুপারিশ করতে চাইল। হযরত তাকেও ধোলাই করলেন। আল-ইমদাদ সাময়িকীতে এ ঘটনা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

এর চেয়ে বড় লক্ষণীয় ঘটনা হল, হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর একান্ত আপনজন ও তার চিকিৎসক এমনকি হযরত তাঁকে প্রিয়, বিশ্বস্ত ও

নিকটতম বলে সম্বোধন করতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও একবার হযরত লক্ষ্মৌতে শিফাউল মালিক সাহেবের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। হাকীম সাহেব তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে শিফাউল মালিকের কাছে হযরতের কি রোগ তা জানতে চাইলেন। এ অনধিকার চর্চার কারণে হযরত থানুভী তাকে যে কঠোর ভাষা লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চিঠিটি ইফাযাতে ইয়াওমিয়া ৯ম খণ্ড দ্বিতীয় অংশ মলফুজ নম্বর ১৩৩-শে উদ্ধৃত হয়েছে।

এখানে শুধু আমার জিজ্ঞাস্য, এ ঘটনা থেকে আমরা কি এ কথা বুঝব যে, হযরত হাকীমুল উম্মত হাকীম মুহাম্মদ মোস্তফার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন কিংবা তিনি ধিকৃত হয়ে গিয়েছিলেন?

হযরত হাকীমুল উম্মতের বড় ভাগ্নে মাওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব (রহঃ) সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তাকে আমি সবচে' বেশী ভালবাসি; এশ্‌কের পর্যায়ে বলা যেতে পারে। অথচ তার সাথেই সবচে' বেশী কঠোরতা করি।

একবার সাহারানপুরের এক জলসায় মাওলানা সাঈদ সাহেব অত্যন্ত জোরদার তকরীর করেন এবং শ্রোতাদের মাঝে এক আলোড়ণ সৃষ্টি করে দেন। ওয়াজের পর হযরত তাঁকে সামান্য একটি বিষয়ে ভরপুর মজলিসে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন, যাতে তাঁর মাঝে কোন প্রকার আত্মগৌরব না এসে যায়। পরে হযরত নিজেও এ মুসলেহাতের কথাই বলেছেন। (আশরাফুস সওয়ানেহ)

এবার বলুন, এ তিনটি ঘটনা কিংবা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা কি এ কথা বলতে পরি যে, হযরত তাঁর সকল খোলাফা এবং আপনজনদের প্রতি অসন্তুষ্টি ছিলেন কিংবা তাদের তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন? অনুরূপভাবে কোন মুবাল্লিগ বা জামাত সম্পর্কে যদি হযরতের কাছে সত্য-মিথ্যা কোন সমালোচনা পৌঁছে থাকে আর তার ভিত্তিতে তিনি তাদের শাসিয়ে থাকেন, তবে কি তা অসঙ্গত হবে? আর এ ভিত্তিতে কি এ কথা বলা ঠিক হবে যে, হযরত জামাতের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিশেষতঃ এ কথা সর্বজন বিদিত যে, বুযুর্গদের খেদমতে মিথ্যা কথা পৌঁছানো মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

খান খলীলের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আকদাস সাহারানপুরীর এ বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহওয়ালাদের কাছে মিথ্যা কথা পৌঁছিয়ে আল্লাহওয়ালাদের মনে কষ্ট দিয়ে কি যে স্বাদ পায় তা তারাই জানে।

হযরত হাকীমুল উম্মতের ইফাযাতে ইয়াওমিয়াতে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এজন্যই বুযুর্গগানে দ্বীনদের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর যেসব তিরস্কার হয়ে থাকে তা নিছক সাময়িক। এজন্য সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে দায়ী করা হবে নিছক অজ্ঞতা কিংবা চিত্তের অনুদারতা।

স্বয়ং হযরত থানুভী (রহঃ) বলেন যে, যাদেরকে শাসন কিংবা তিরস্কার করি বাস্তব সত্য এই যে, তাদের ব্যাপারে মনে চায় তারা আমার চেয়েও ভাল হয়ে যাক। অবশ্য সাধারণ মানুষ এটাকে সম্পর্ক ছিন্নতা মনে করে। (ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত হুযাইফা (রাঃ) মাদায়েন শহরে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কিছু হাদীছ বর্ণনা করতেন, যা তিনি কতক লোক সম্পর্কে গোস্বার হালতে বলেছিলেন। অতঃপর শ্রোতারা হযরত সালমান ফারসীর কাছে গিয়ে বর্ণনা করলে তিনি বলতেন, হযরত হুযায়ফাহ তার হাদীছ সম্পর্কে নিজেই ভাল জানেন। লোকেরা পুনরায় হযরত হুযায়ফাহ (রাঃ)-এর কাছে এসে বলত, আপনার হাদীছগুলো হযরত সালমান শুনে তা সম্পর্কে সত্য মিথ্যা কিছুই মন্তব্য করেননি।

এ কথা শুনে হযরত হুযাইফাহ (রাঃ) হযরত সালমানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার হাদীছগুলো সত্যায়ন করেননি কেন? অথচ আপনি নিজেও এগুলো নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছেন। হযরত সালমান (রাঃ) বললেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সময় গোস্ব্যার হালতে অনেকের সম্পর্কে অনেক কিছু বলে ফেলতেন। অপর পক্ষে অনেক সময় আনন্দের হালতে অনেকের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকতেন। তোমার এসব রিওয়ায়েত বর্ণনা করা দ্বারা মানুষের মনে অনেকের প্রতি শ্রদ্ধা আর অনেকের প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে। ফলে পরস্পরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

একবার খুৎবাদানকালে বলেছিলেন যে, আমি একজন মানুষ; অন্যদের মত আমারও গোস্যা পায়, সুতরাং গোস্যার হালতে আমি যাকে কিছু বলে ফেলেছি; আয় আল্লাহ আপনি আমার এ কথাকে লোকদের জন্য রহমত এবং কিয়ামতের দিনের জন্য বরকত স্বরূপ করে দিন।

সুতরাং তুমি এসব রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়ত ক্ষান্ত কর অন্যথায় আমি আমীরুল মুমিনীনের নিকট তোমার নামে নালিশ করে দিব।

(বাযলুল্ মাজহুদ– ৫ম খণ্ড)

স্বয়ং হযরত থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহওয়ালাদের নিকটতর ব্যক্তিদের মাঝে দু একজন এমনও থাকে যারা শায়খের কাছে সর্বদা সত্য-মিথ্যা কথা লাগিয়ে শায়খকে এবং অন্যদেরকে অস্থির করে তোলে। নিজ ইচ্ছামত শায়খকে কারো প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেয় আবার কারো প্রতি সন্তুষ্ট করে দেয়। তবে আলহামদু লিল্লাহ! আমাদের পূর্বসূরীরা এ ব্যাপারে বেশ সতর্ক ছিলেন। হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেব (রহঃ) কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ শুনতেনই না। কেউ কারো অভিযোগ করলে তৎক্ষণাৎ নিষেধ করে বলতেন, থাম; তোমার কথা শুনতে চাই না। এরপর স্বভাবতঃই তাঁর কাছে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস কারো হত না।

হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) সব কিছু শুনে বলতেন, তুমি তার সম্পর্কে যা কিছু বললে সব মিথ্যা। আমি তার সম্পর্কে ভালভাবেই জানি, সে এমন ব্যক্তি নয়।

জনৈক ব্যক্তি আরয করল, এহেন পরিস্থিতিতে হযরত গাঙ্গুহী (রহঃ) কি করতেন? ইরশাদ করলেন, একবার স্বয়ং তাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মানুষ যখন আপনার কাছে অন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এতে আপনার মনে কি ক্রিয়া সৃষ্টি হয়? ইরশাদ করলেন, আমি বুঝে নেই এদের দু'জনের মাঝে মনোমালিন্য রয়েছে। অবশ্য পূর্ণ কথা শুনতেন।

'ইফাযাতে ইয়াওমিয়া'তে মাওলানা লিখেছেন, ঘটনা বর্ণনার বেলায় আমি ওলামা কেরামের বর্ণনাও বিশ্বাস করি না। কারণ আমার ধারণা, এরা ফতোয়া দানের ব্যাপারে দায়িত্বের পরিচয় দিলেও ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন না। এতে চাই কেউ অসন্তুষ্ট হোক আর সন্তুষ্ট হোক; আমার মনে

যা ছিল তাই পরিষ্কার বলে দিলাম।

একবার হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) ইরশাদ করেন, মানুষ আজকাল আল্লাহওয়ালাদের দরবারে বিভিন্ন জনের নালিশ 'হাদিয়া' স্বরূপ পেশ করে। এই মধ্যে জনৈক ব্যক্তি উভয় হযরতের কাছে গিয়ে আমার নামে নালিশ করেছে যে, দেখুন আপনার হজ্জের সফর শেষ হতেই সে (হযরত থানুভী) হাদীছের দরস শুরু করে দিয়েছে। আমি আরয করলাম, হযরত হয়ত কেউ মাছনুভী শরীফের দরছকে হাদীছের দরছ মনে করে বসেছে। হযরত ইরশাদ করলেন, আশ্চর্য মানুষ তিলকে তাল মনে করে বসে থাকে। আর হাদীছের 'দরস' যদি শুরু করেও থাকে তবে এতে অপরাধটাই বা কি ছিল! কিন্তু মানুষের এটা মারাত্মক অপরাধ যে, তারা আল্লাহওয়ালাদের কানে শুধু কথা পৌছানোর চেষ্টা করে। এটাই মানুষের আল্লাহওয়ালাদের জন্য হাদিয়া। (হাসানুল আযীয)

এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য যে, আল্লাহওয়াদের কাছে সত্য-মিথ্যা কথা পৌছে থাকে। সুতরাং তাঁরা যদি কোন কথার প্রেক্ষিতে কারো প্রশংসা কিংবা নিন্দা করেন তা বাস্তব ধরে নেয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। হযরত সালমান ফারসী তো নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয়াদির রক্ষক একজন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হুযায়ফাহ (রাঃ)-কেও এ ধরনের রিওয়ায়েত করার কারণে তিরস্কার করেছেন।

আমি পূর্বেও লিখে এসেছি যে, হযরত থানুভী (রহঃ)-এর শীর্ষস্থানীয় খোলাফা কেরাম তাবলীগ জামাতে প্রচুর অংশগ্রহণ করছেন।

হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত সংক্ষেপ ভাষায় সুন্দর কথা বলেছেনঃ

"আপনাদের মুখে এ ধরনের প্রশ্ন শুনলে আমার আশ্চর্যবোধ হয়। কেননা, এ তাবলীগ আজ নতুন বিষয় রয়নি; বরং দীর্ঘ এক যুগ পার হয়ে গেছে। এখন এর উন্নতীর যুগ। ওলামা কেরাম এতে প্রচুর অংশগ্রহণ করছেন। তারা এর প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করেই এতে অংশ গ্রহণ করছেন। এ বিষয়টি এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এর পর আর কোন প্রকার প্রশ্নের অবতারণার অবকাশ নেই"।

বিস্তারিত চিঠি সামনে আসছে।

সমালোচনা- ১০

হযরত মাদানী (রহঃ) ও তাবলীগ জামাত

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে অনেক সময় শোনা যায় তিনিও নাকি এই জামাতের বিরোধিতা করতেন। হযরত সম্পর্কে এ ধরনের কথা শুনলে আমার যারপর নেই আশ্চর্যবোধ হয়। অথচ হযরত (রহঃ)-এর এই জামাতের প্রতি হৃদ্যতা, উদারতদা ও উৎসাহ প্রদান মৌখিক ও লিখিত এত প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে যার কোন অন্ত নেই। তারপরও এ ধরনের উক্তির অবতারণা নিছক সঠতা বৈ কিছুই নয়। এই জামাতের এজতেমাগুলোতে হযরত এত প্রচুর পরিমণে অংশগ্রহণ করেছেন, তাকরীর করেছেন এবং অন্যদের উৎসাহ প্রদান করেছেন যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। হযরতের তাকরীরগুলো স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। যার সবগুলো এই ছোট্ট পুস্তিকাতে উদ্ধৃত করা দুষ্করই বটে। শুধু তাবলীগী তাকরীরগুলোই স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যার আংশিক অনেক পত্র-পত্রিকায়ও এসেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে তার দু' একটি চিঠি উল্লেখ করছি। এর মধ্যে আমার দৃষ্টিতে দারুল উলুম দেওবন্দ-এর শুরার মেম্বর হযরত আল-হাজ্জ হাকীম মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব কাঠুরী সাহেবের নামে লিখা পত্রটি সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রটি হযরতের তাকরীরের বইটির সাথেও প্রকাশিত হয়েছে। যাহোক তিনি লিখেন-

শ্রদ্ধেয় জনাব!

আস্সালামু আলাইকুম।

আশা করি ভালই আছেন। এ কথা শুনে আমার আশ্চর্যবোধ হয়েছে যে, মীরাঠ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলগুলোতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগী জামাতগুলো যখন দাওয়াতী প্রগ্রাম নিয়ে আগমন করে আপনি ও আপনার বন্ধু-বান্ধবরা তাদের সাথে সহমর্মিতা, পথপ্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদান, কোন প্রকার সহযোগিতা করেন না। অথচ যাদের আমাদের আকাবিরদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই আর না তাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রী কোন

আন্দোলনের সাথে কোন সম্পর্ক আছে। তারা মনে প্রাণে এ জামাতগুলোর সহযোগিতা করছে। আমার বুঝেই আসছে না এর কারণ কি?

মুহতারাম! এই তাবলীগী জামাত শুধু যে একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে এমন নয়; বরং এদের উৎসাহিত করার প্রচুর প্রয়োজন রয়েছে। আর তাদের নিজেদেরও মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার, মুসলমানদের পরস্পরের একতাবোধ জন্মানোর এবং তাদের ধর্মীয় চেতনা বোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচুর প্রয়োজন। তবেই ভবিস্যতে এর অভূতপূর্ব ফলাফলের প্রবল আশা করা যায়। সুতরাং আশা করি ভবিস্যতে পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করে এদের উৎসাহিত করবেন। ওয়াস্সালাম।

(পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)
হুসাঈন আহমদ (গুফিরা লাহু)
১৬ই সফর ১৩৬১ হিজরী

দ্বিতীয় চিঠিটি তিনি লিখেছেন প্রফেসর সৈয়্যদ আহমদ শাহ সাহেব মুরাদাবাদী-এর নামে-

শ্রদ্ধেয় জনাব!

আস্সালামু আলাইকুম

তাবলীগী দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া এবং এর জন্য হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর খেদমতে গিয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা গ্রহণ অত্যন্ত মুবারক পদক্ষেপ। আল্লাহ পাক কবুল করুন এবং এই মুবারক উদ্দেশ্য বরং বংশ সূত্রে প্রাপ্ত এই দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার তৌফীক দান করুন। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নামে ভিন্ন চিঠি লিখার প্রয়োজন নেই। তিনি কোন প্রকার সুপারিশ ছাড়াই আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। নিতান্ত প্রয়োজন মনে করলে আমার এই চিঠিটিই হযরতের খেদমতে পেশ করে দিয়েন। আর তাঁর খেদমতে আমার সালাম আরজ করে নেক দু'আর দরখাস্ত করবেন। ওয়াস্সালাম।

(পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)
হুসাঈন আহমদ (গুফিরা লাহু)

তৃতীয় পত্রটি আফগানিস্তানের ওলামা কেরামের নামে লিখা, যার সম্পর্কে সাওয়ানেহে ইয়ূসুফীতে লিখা হয়েছে যে, এ কথা সুপ্রমাণিত হল যে, হযরত মাদানী (রহঃ) তাবলীগী জামাতের সহযোগিতায় সর্বদা এগিয়ে থাকতেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করতে কখনও পিছপা হতেন না। আফগানিস্তানে হযরতের অসংখ্য শিষ্য ও মুতা'আল্লেকীন মাশায়েখ রয়েছেন। এই জামাত যখন আফগানিস্তান রওনা হল হযরত সেখানকার কতক প্রভাবশালী ওলামা কেরামের নামে ভিবিন্ন চিঠি লিখেন, যাতে এই জামাত সেখানে গিয়ে কোন প্রকার প্রতীকূল অবস্থার সম্মুখীন না হয়।

এক চিঠিতে তিনি লিখেন;

যাঁরা আমার দৃষ্টির অন্তরালে, যাঁদের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আমি অধির, শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা ফযলে রাব্বী ও অন্যান্য ওলামা কেরাম (আপনাদের ফয়য ও বরকত সর্বদা সমুজ্জ্বল থাকুক)।

বাদ সালাম মসনুন আরয এই যে, পত্রবাহক আমার কতক বন্ধুবর আপনাদের খেদমতে হাযির হচ্ছে। এরা কোন রাজনৈতিক কিংবা রাষ্ট্রিয় উদ্দেশ্য নিয়ে আসছে না; বরং এদের একমাত্র উদ্দেশ্য দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়া, তাবলীগী দায়িত্ব আদায় করা এবং আফগানিস্তানের মুসলমানদের ভুলে যাওয়া উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেয়া। আশা করি এঁদের সাহায্য সহযোগিতায় কোন প্রকার ক্রুটি করবেন না। তাঁদের উপর বিশ্বাস করে তাঁদের দায়িত্ব যাতে সহজে আঞ্জাম দিতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিবেন। ওয়াস্‌সালাম।

(শুভাকাঙ্খী, পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)[১]
হুসাঈন আহমদ (গুফিরা লাহু)
প্রধান শিক্ষক দারুল উলূম দেওবন্দ।
জামিয়তে ওলামা হিন্দের সভাপতি
১৩ মুহাররম ১৩৭৭ হিঃ

১। এটা হযরতের বিনয়। আল্লাহওয়ালারা নিজেদেরকে এরূপ নগণ্য ও অধম মনে করে থাকেন। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব বিলয়াবীর নেতৃত্বে এগারো জন সদস্য বিশিষ্ট এই জামাতই ছিল আফগানিস্তানে প্রেরিত প্রথম জামাত। সাওয়ানেহে ইয়ূসুফীতে এদের নাম ও বিস্তারিত কারগুজারী আলোচিত হয়েছে।

একবার বেঙ্গলৌরে তাবলীগের বিরুদ্ধে জোরদার ষড়যন্ত্র শুরু হল যে, এরা মাদ্রাসাগুলোকে 'অনর্থ বলে' মন্তব্য করে। কোন কোন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাবলীগের বিরুদ্ধে ঘোষণা পত্রও লিখা হল। পরিশেষে মীমাংসার জন্য হযরত মাদানী (রহঃ)-এর শরণাপন্ন হলে তিনি এই নিবন্ধটি লিখে পাঠিয়ে দেন। নিবন্ধটি ১৭ই মার্চ ১৯৫৭ ইং তে বেঙ্গলৌরের 'রৌশ্‌নী' নামক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই মধ্যে বিভিন্ন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে তাবলীগের পক্ষে-বিপক্ষে লিখা বিভিন্ন নিবন্ধ ও পোষ্টার নযরে পড়েছে, যার কোন একটিতেই ভারসাম্যতা রক্ষা করা হয়নি। বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়তের জন্য তাবলীগ জামাত ও মাদারেসে দ্বীনিয়া উভয়টিরই প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের আবশ্যক, শরীয়তের সীমারেখায় থেকে কাজ করা। কেননা, যে কোন কাজ যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন তাতে শরীয়তের সীমারেখা লঙঘন করা হলে তাতে অনিষ্ট সৃষ্টি হবে নিঃসন্দেহে। সুতরাং উভয় দলের খেদমতে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে আরয, ভারসাম্যতা ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। অনর্থ কাদা ছুড়া ছুড়ি ও অভারসাম্যতা পরিহার করে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকুন।

সাহাবা কেরামের স্বর্ণযুগ থেকে নিয়ে অদ্যাবধি সর্বদাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গ থেকে ভুল-ক্রুটি হয়ে আসছে। কিন্তু এসব ভুলের কারণে প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়া হয়নি। বরং সংশোধন করা হয়েছে। ভুল-ক্রুটি ছেঁটে ফেলা হয়েছে। তাবলীগ জামাতের লোকেরাও আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং এদের মধ্যেও এমন কিছু নতুন ও অনভিজ্ঞ লোক অবশ্যই রয়েছে যারা সীমারেখা লঙঘন করে বসে। তাই বলে সীমিত কয়েকজনের ভুলের কারণে গোটা জামাতকে অভিযুক্ত করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বীনী মাদারেসগুলোরও একই অবস্থা। তাই সকলের কাছে অনুরোধ, অনর্থ বিষয় নিয়ে ঘাটা-ঘাটি না করে প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের

চেষ্টা করুন। আল্লাহই সঠিক পথপ্রদর্শক। তিনিই একমাত্র সহায়ক।

(পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)

হুসাইন আহমদ (গুফিরা লাহু)

মুফতী আযীযুর রহমান সাহেব বিজপুরী সাওয়ানেহে ইয়ুসুফীতে লিখেন, অন্যদের কথা জানি না, তবে হযরত মাদানী (রহঃ) সম্পর্কে যতটুকু জানি তা হল, হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) যখনই সাহারানপুর তাশরীফ নিয়ে যেতেন, দেওবন্দ অবশ্যই যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বসে থাকতেন। তাঁর সাথে হযরত মাদানী (রহঃ)-এর এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, যখনই কোন এজতেমায় শরীক হতেন যারা মুসাফা করতে আসত তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, চিল্লা দেয়া হয়েছে কিনা। নেতিবাচক জবাব দিলে তাকে চিল্লা দেয়ার জন্য নাম লিখাতেন।

হযরত শায়খুল ইসলাম (রহঃ) তাবলীগী বিভিন্ন এজতেমায় অসংখ্য তাকরীর করেছেন। সেসব তাকরীরগুলোর কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছে যা এত দীর্ঘ যে, এ ক্ষুদ্র পরিসরে সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়। সেগুলোকে ভিন্নভাবে প্রকাশিত করে দিলে মানুষের হিদায়েতের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হত। সেই সাথে তাবলীগ জামাতের সাথে হযরতের গভীর সম্পর্কের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যেত। অবশ্য "হযরত শায়খুল ইসলাম কী আহাম তাকরীর" (হযরত শায়খুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বয়ানসমূহ) নামে ছোট্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দু'টি তাকরীর বেশ বিস্তারিত। এখানে আমি দ্বিতীয় তাকরীরটির শেষাংশ উদ্ধৃত করছি। এই তাকরীরটি ২৬ জুলাই ১৯৫৭ ইং-তে জুমুআর নামাযের পর মাদরাজের এক তাবলীগী এজতেমাতে প্রদান করেছিলেন। আরো মজার কাণ্ড, এটাই ছিল হযরতের শেষ সফর এবং শেষ বয়ান। যাহোক, এ বয়ানের শেষের দিকে হযরত বলেন–

ভাইরা আমার! আপনাদের এই সমাবেশ, তাবলীগ জামাতের সমাবেশ। আর এ তাবলীগ ছিল নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল দায়িত্ব। সুতরাং আপনারা যে কাজ করছেন তা অসাধারণ গুরুত্বের অধিকারী। অতএব এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার সৌভাগ্য হওয়া অত্যন্ত সুসংবাদ বাহক।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই কাজ নেয়ার মালিক। তিনি ইচ্ছা না করলে আপনাদের করার কিছুই ছিল না। ইরশাদ হয়েছে–

و ما تشاءون الا ايشاء الله رب العلمين

তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

আরো ইরশাদ হয়েছে–

يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للإيمان ان كنتم صادقين

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে। আপনি বলে দিন; তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না; বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন। যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক।

সত্যি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাদের অন্তরে এ বিষয়টি ঢেলেছেন। এই হিন্দুস্তানেই আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই গুজরে গেছেন, যারা পরস্পরে মারা-মারি কাটা-কাটি আর পার্থিব ধন-দৌলত ছাড়া কিছুই বুঝত না। তাবলীগের কথা স্মরণ করারও সুযোগ তাদের হয়নি। আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমাদের যুগের ওলামা কেরাম ও দ্বীনদারদের এই তাওফীক দান করেছেন। আপনারা আল্লাহর বান্দাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করছেন। কালিমা নামাযের সাথে যাদের আদৌ সম্পর্ক নেই নিঃসন্দেহে তারা জাহান্নামের যোগ্য ছিল। আপনারা তাদের হাতে পায়ে ধরে সোজা পথে ফিরিয়ে আনছেন। আর এক কথায় জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাচ্ছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা উন্নতী দান করেন আর যাকে ইচ্ছা অবনতি দান করেন।

বাদশাহর খেদমত কর বলে এ কথা ভেব না যে, তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ করছ; বরং তার অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে খেদমতে নিয়োজিত করেছেন।

আল্লাহর শোকর আদায় করুন যে, তিনি আপনাদেরকে এ খেদমত করার

তাওফীক দান করেছেন। অসম্ভব কিছুনা যে, অনেকে আপনাদের কথা উপেক্ষা করবে। আপনারা আর কি; স্বয়ং নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাই মানুষ উপেক্ষা করেছে। শুধু তাই নয়; বরং তার সাথে মানুষ অমানবিক আচরণ করেছে। সুতরাং বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মুর্খ জাহেলরা যদি গালমন্দ করে তবে নীরবে সয়ে যাবেন। এটাই নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সকল নবীগণের সুন্নত।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لقد اوذيت فى الله و ما اوذى احد مثلى و لقد اخفت فى الله و ما اخيفت احد مثلى الحديث

আল্লাহর পথে আমি এমন কষ্ট পেয়েছি যা আর কেউ পায়নি। আল্লাহর পথে আমাকে এমন ভয় দেখানো হয়েছে যা আর কাউকে দেখানো হয়নি।

আপনাদের এ আন্দোলন যদি সফলকাম নাও হয় এবং একজনও যদি আপনাদের ডাকে সাড়া না দেয় তবুও আপনাদের মেহনত সার্থক, আপনাদের দরজা অনেক উর্ধ্বে এবং আপনারা পুরাপুরি প্রতিদান পাবেন। আর আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, এ কাজ আল্লাহর দরবারে মকবুল।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আলী (রাঃ)-কে খায়বার জয় করার জন্য প্রেরণ করলেন, হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি সেখানে পৌছেই যুদ্ধ শুরু করে দিব? নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না; বরং তোমরা সেখানে পৌছে প্রথমে অপেক্ষা করবে এবং লোকদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র প্রতি আহবান করবে। যদি তারা তোমাদের ডাকে সাড়া না দেয় তখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কেননা–

لان يهدى الله بك رجلا خير لك من الدنيا و ما فيها

আল্লাহ পাক তোমার উসীলায় যদি একজন ব্যক্তিকে হিদায়েত দান করেন তবে এটা তোমার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এসব অপেক্ষা উত্তম। অন্য রিওয়ায়েতে রয়েছে– তোমার জন্য কতগুলো জোয়ান উট লাভ করা অপেক্ষা উত্তম।

ভাইয়েরা আমার! আপনাদের এ পদক্ষেপ অত্যন্ত মুবারক পদক্ষেপ। আল্লাহ আপনাদের চেষ্টা-সাধনার বদৌলতে মানুষকে উপকৃত করুন এবং আপনাদের দ্বারা ইসলামের খেদমত নিন। আপনারা কস্মিনকালেও সংকীর্ণমনা হবেন না। কিছু কষ্ট তো স্বীকার করতে হবেই। যেমন নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সকল আম্বিয়া কেরামকে করতে হয়েছে। আপনারা কি বলতে পারেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তীরোধানের পর সাহাবা কেরাম আরব ছেড়ে ইরাক, ইরান, শিরিয়া, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, এককথায় সমগ্র বিশ্বের আনাচে-কানাচে কেন ছড়িয়ে পড়েছিলেন? কি উদ্দেশ্য ছিল তাদের? দেশ জয় করা, ধন-দৌলত লুণ্ঠন করা? মোটেই নয়; বরং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লা-ইলাহা ইল্লাহর দাওয়াত দেয়া। দুনিয়ার মানুষকে সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন বান্দাদের আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেয়া। জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা। অবশ্য পরবর্তী লোকেরা বোকামী করে মুর্খতার বশবর্তী হয়ে দুনিয়া মুখো হয়ে পড়েছিল।

ইতিহাস সাক্ষী, হিন্দুস্তানে বহিরাগত মুসলিম সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ। কিন্তু হিন্দুস্তান বিভক্তির সময় মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ালো দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। আমাদের পূর্বসুরীগণ দ্বীনের দাওয়াতের পিছনে সীমাহীন চেষ্টা করেছেন।

জনৈক ইংরেজ ইসমেথ লিখেন, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিস্তী (রহঃ)-এর হাতে নব্বই লক্ষ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। আচ্ছা বলুন তো; কি ছিল তাঁর কাছে? কোন সামরিক শক্তি, না অন্য কিছু? কিছুই ছিল না, ছিল শুধু আল্লাহর মা'রেফাত।

সব জায়গায়ই আল্লাহর এমন কিছু বান্দা গুজরেছেন, যাঁরা তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি তুর্কিস্তানের ইতিহাসে পড়েছি, তুর্কি সম্প্রদায়ের তিন লক্ষ পরিবার একদিনে মুসলমান হয়েছিল। আল্লাহর মেহেরবানীতে দাওয়াতের আন্দোলন এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, এক সময় মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য শাসকবর্গকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল।

১০০ হিজরী সালে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের শাসনামলে খুরাসানের শাসক আশংকা করতে লাগলেন, এভাবে সকলে মুসলমান হয়ে গেলে 'কর' বন্ধ হয়ে রাজ ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি বাধ্য হয়ে ঘোষণা করলেন, খৎনা করা ছাড়া কারো ইসলাম গ্রহণ করা হবে না। এ ঘোষণার পর বয়ঃবৃদ্ধদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। ফলে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণের সংখ্যা কমতে লাগল।

খলীফা এ সংবাদ পেয়ে খোরাসানের শাসককে পদচ্যুত করে বললেন, আল্লাহর রাসূল মানুষকে ইসলাম গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আসেননি।

বন্ধুগণ! আমাদের পূর্বসুরী ওলামা কেরাম, আল্লাহওয়ালা ও সাধারণ মুসলমানদের প্রচেষ্টায় দশ কোটি পচিশ লক্ষ লোক মুসলমান হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে যদি লোকেরা বিপথগামী না হত তা হলে হিন্দুস্তানের অধিকাংশ লোক মুসলমান হয়ে যেত।

বন্ধুগণ! আল্লাহ পাক আপনাদের অন্তরে তাবলীগের মহব্বত দান করেছেন, এটি অত্যন্ত মুবারক আমল। আপনারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ আপনাদেরকে আরও অধিক পরিমাণে তাওফীক দান করুন।

বন্ধুগণ! মন ছোট করবেন না। আল্লাহর রহমতের আশা রাখুন। সকল মানুষকে আল্লাহর সন্তুটি ও নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের দিকে আহবান করেন। নিজেও আমল করুন, তাঁর সুরত সীরাত ইখতিয়ার করুন।

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

হযরত শায়খুল ইসলাম (রহঃ) তাবলীগী এজতেমাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছেন, যার সবগুলো সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ। আমার ডাইরীতে খুঁজলেও বহু এজতেমায় হযরতের অংশগ্রহণের কথা মিলবে।

৩রা জুমাদাস্সানী ১৩৭৫ হিঃ মুতাবেক ১৭ জানুয়ারী ১৯৫৬ ইং রোজ মঙ্গলবার পরাহ্নে ডাস্নাতে অনুষ্ঠিত এজতেমায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এ এজতেমা সম্পর্কে সাওয়ানেহে ইউসুফীর টীকাতে লিখা হয়েছে যে, এটাই ছিল তাবলীগী এজতেমায় হযরত মাদানী (রঃ)-এর জীবনের শেষ অংশগ্রহণ। মনে

হয় লিখক অনুমান করে লিখে দিয়েছেন। কেননা এর পর তিনি মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন। আসলে এ তথ্য ঠিক নয়; বরং 'আরকাট'-এর যে এজতেমায় অংশগ্রহণের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে সেটি এরও পরের কথা।

১৯৪৭ ইং-এর গণ্ডগোলের পর যখন নিযামুদ্দীনের ওলামা কেরামের জন্য জলছা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল সেই সঙ্কটময় মুহূর্তেও তিনি তাবলীগী এজতেমাগুলোতে প্রচুর অংশগ্রহণ করেছেন।

সাওয়ানেহে ইউসুফীতে লিখা হয়েছে যে, ইংরেজী ৪৭ সনে পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ছিল যে, ঘর থেকে বের হওয়াই কঠিন ছিল। বাইরের দিকে পা বাড়ানো মানেই মৃত্যুর মুখে পড়া। সে সময় সকল আপন জন, হীতাকাঙ্খী এমন কি বহু দিনের পুরাতন বন্ধুরাও পাশকেটে গিয়েছিল। যাঁরা মোটামুটি গণ্যমান্য এবং সরকারের উপরও যাঁদের প্রভাব ছিল তাঁরাও নীরব থাকার উপদেশ দিতেন। কিন্তু এ অন্ধকার রাত্রেও কিছু কিছু প্রদীপ প্রজ্জলিত ছিল।

হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) তো বরাবর মারকায এবং মারকাযওয়ালাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং তাঁদের সাহস যোগান। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেবও যথেষ্ট বিক্রম ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেন। (তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত ভিন্নভাবে আলোচনা সামনে আসছে।)

হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা আহমদ সাঈদ সাহেব (রহঃ)ও এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যথেষ্ট সহযোগিতা করতে থাকেন।

তাবলীগ জামাত সম্পর্কে অন্যান্য আকাবিরদের

মন্তব্য ও বাণী

এ কথা অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই যে, হযরত আকদাস শাহ আব্দুল কাদের সাহেব রায়পুরী (রহঃ) নিযামুদ্দীন বহুবার তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং তাবলীগের উদ্দেশ্যে তার বিভিন্ন সফর এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মশওয়ারাগুলোতে অংশগ্রহণের সংখ্যাও প্রচুর। এই অধমের মাধ্যমেই হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর যুগে এবং তার পর হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর যুগে এদের উভয়কে রায়পুর এজতেমা করার জন্য একাধিকবার আহবান করেছেন। হযরতের সময় হযরতের আদেশক্রমে রায়পুরে বহুবার তাবলীগী এজতেমা হয়েছে। অপরপক্ষে হযরত রায়পুরী (রহঃ)ও বহুবার দিল্লী তাশরীফ নিয়ে গিয়েছেন এবং হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) উভয়ের সময় তাঁর সাথে তাবলীগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাশওয়ারা হত। এত ঘন ঘন সাক্ষাত হওয়ার পরও হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর তৃপ্তি হত না। তিনি চাইতেন হযরতের আগমন আরো ঘন ঘন হোক। এ সম্পর্কে আমার 'আপবীতী' ৪র্থ খণ্ডে একটি দীর্ঘ ঘটনা আলোচিত হয়েছে যে–

একবার হযরত দেহলুভী (রহঃ) আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে, হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর আগমন আরও ঘন ঘন হোক। জবাবে হযরত রায়পুরী (রহঃ) অধমের দিকে ইংগিত করে বললেন, আমার আগমন তো এঁর উপর নির্ভর করে। এতে চাচাজান অত্যন্ত গোস্যা হয়ে বললেন, হযরতের আগমন যদি এতই সহজ ছিল তাহলে কেন এত বিলম্ব হয়?

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে রয়েছে যে, মাওলানার দৃষ্টিতে কোন দেশের অজ্ঞতা, উদাসীনতা, ধর্মানুরাগ শূন্যতা ও অসদস্পৃহা সকল ফিতনা ও অনিষ্টতার উৎস। এর একমাত্র সমাধান হল, মেওয়াতের লোকদের নিজেদের এসলাহ, শিক্ষা ও দ্বীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধির দেয়ার এবং এর জন্য মেহনত করার শক্তি ও জযবা পয়দা করার জন্য বাইরে বিশেষত ইউপির শহরগুলোতে

যাওয়া। এর জন্য সর্বপথম সফর নিজের দেশেই 'নাধলা' অঞ্চলে রমযানে স্থির হল। যার বিস্তারিত বিবরণ হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে রয়েছে।

তার পর দ্বিতীয় সফর নির্ধারিত হল রায়পুরে এবং হযরত নিজেই সকলকে নিয়ে ১০-১১ শাওয়াল রায়পুর গেলেন। বস্তুত রায়পুরও ছিল প্রশান্তির জায়গা এবং দ্বীনী ও রুহানী মারকায। সেই সাথে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম সাহেব (রহঃ)-এর স্থলাভীষিক্ত হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের সাহেবের পক্ষ থেকেও বেশ উদারতা ও হৃদ্যতা ছিল। (সাওয়ানেহে দেহলুভী)

এখান থেকেই মেওয়াতের জামাতগুলোর ইউপিতে আগমন অরম্ভ হয় এবং একাধিকবার রায়পুরে এজতেমা হয়। হযরত রায়পুরী (রহঃ)ও 'বাগ' অঞ্চলের তাঁর সকল ভক্ত ও অনুরক্তদের এজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে পাঠাতে থাকেন। এই অধমও রায়পুরের বিভিন্ন এজতেমাতে অংশগ্রহণ করেছে।

সাওয়ানেহে ইউসুফীতে রয়েছে যে, হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) হিন্দুস্তান বিভক্তির ভয়াবহ পরিস্থিতির সময় এমন এক জায়গা থেকে এজতেমা করা আরম্ভ করলেন, যেখানে গোড়া থেকেই যিকিরের পরিবেশ বিরাজ করছিল এবং বহু বছর ধরে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ধ্বনি হচ্ছিল এবং এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের ছায়া বিরাজ করছিল যিনি বহু বছর ধরে ঈমান-ইয়াকীন ও যিকরে এলাহীর সবক দিচ্ছিলেন। হিন্দুস্তান বিভক্তির পর সর্বপ্রথম এজতেমা রায়পুরে অনুষ্ঠিত হয়।

তারা রবীউছ্ছানী ৬৭ হিজরী মুতাবেক ১৪ ফেব্রুয়ারী ৪৮ ইংরেজী দিবাগত রাত্রে হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) সাহারানপুর গমন করেন। আর এদিকে লখনৌ থেকে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী ও মাওলানা মুহাম্মদ মঞ্জুর নু'মানী পাঞ্জাব মেইলে সাহারানপুর পৌঁছেন।

পর দিন সকালে এরা সকলে রায়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। রায়পুর এক বিরাট এজতেমা ছিল। এ সম্পর্কে রবিবার দিবাগত রাত্রে জামে মসজিদে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আর এ জলসাটি ছিল একটি সার্থক বুনিয়াদি জলসা। এখান থেকেই পরবর্তী এজতেমা ও জলসাগুলোর পথ সুগম হয়। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে এসে যারা রায়পুর অশ্রয় নিয়েছিল তারাও এই এজতেমায়

অংশগ্রহণ করে। এই সফরেই হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহঃ) মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-কে পাকিস্তান ঘুরে আসার জোর তাগিদ করেন।

রায়পুরের দ্বিতীয় এজতেমা আকস্মিকভাবে হয়েছিল। প্রথম থেকে কোন এন্তেজাম ছিল না। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) হযরত রায়পুরী সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। এ আসার প্রোগ্রামও আকস্মিক হয়। সাহারানপুরের অন্তর্গত ফায়সালাবাদের লোকেরা বেশ কিছু দিন যাবত হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবকে তাদের সেখানে নেয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু হযরতের সফরের কষ্টের কথা ভেবে হযরত রায়পুরী (রহঃ) সেখানে যাওয়ার মত দেননি; বরং তাদেরকে বললেন, তোমরা রায়পুর এসে হযরত শায়েখের ফয়য হাসিল কর। এদিকে ১৬ মুহাররাম ১৩৭৩ হিজরী রোজ শনিবার হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব অন্যান্য সাথী সঙ্গীসহ সাহারানপুর আগমন করেন। এখানে এসে হযরত শায়খকে না পেয়ে তৎক্ষনাৎ রায়পুর তাশরীফ নিয়ে যান। এভাবেই আকস্মিকভাবে সকল মহতিরা সমবেত হন।

হযরত রায়পুরী (রহঃ) এ সুবর্ণ সুযোগকে হাতছাড়া না করে আশে-পাশের সকলকে লোক পাঠিয়ে সমবেত করার এবং বুধবার সকালে জামে মসজিদে একটি তাবলীগী এজতেমার এন্তেজাম করার নির্দেশ দিলেন। হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) আপত্তি করে বললেন, হযরত আমি তো শুধু দেখা করতে এসেছি কিন্তু হযরত রায়পুরী (রহঃ) মানলেন না। ফলে হযরত মাওলানাও রাজি হয়ে গেলেন।

যাহোক, বুধবার সকাল রায়পুর জামে মসজিদে প্রায় ছয় ঘন্টার এজতেমা হল। এজতেমাও অত্যন্ত সার্থক হল। মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এবং হযরত শায়খুল হাদীছের আগমনের সংবাদ পেয়ে আশে-পাশের বিপুল সংখ্যক লোক সমবেত হল। হযরত মাওলানা দীর্ঘ চার ঘন্টা বয়ান করলেন এবং বয়ানের পর দু' ঘন্টা তাশকীল হল। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

হযরত রায়পুরী (রহঃ), হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এঁদের তিনজনের জীবনীতে লক্ষ্য করলে উভয় হযরতের হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর খেদমতে একাধিক বার উপস্থিতি এবং বিভিন্ন এজতেমার আলোচনা মিলবে। অপর পক্ষে হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এরও হযরত দেহলুভী (রহঃ)-সময় দিল্লীতে এবং হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর সময় নিযামুদ্দীন আগমন করা এবং কয়েকদিন করে অবস্থান করা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মশওয়ারা সমূহের আলোচনা মিলবে।

'গিলালতা'র এজতেমাটি ছিল হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর এন্তেকালের পর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এজতেমা। তাই হযরত রায়পুরী (রহঃ) এতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ইউসুফ (রহঃ)-এর জীবনীতে এ এজতেমার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে, মুরাদাবাদ থেকে সত্তর জন এজতেমা অংশগ্রহণের জন্য অত্যন্ত আনন্দ উৎসাহের সাথে পদব্রজ চলে আসেন। এমন কি তাদের কোন ক্লান্তই অনুভব হয়নি। অন্য দিকে সাহারানপুর থেকে হযরত শায়খুল হাদীছ এবং রায়পুর থেকে হযরত রায়পুরী (রহঃ) ২৯ শাউয়াল নিযামুদ্দীন পৌছেন। এঁরা উভয়ে এজতেমার দিন অর্থাৎ রবিবার নিযামুদ্দীন থেকে 'গিলালতাহ' পৌছেন।

সাহারানপুরের অন্তর্গত জওয়ালাপুরের এজতেমার তো হযরত রায়পুরীর অনুরোধেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ 'সাওয়ানেহে ইউসুফী'তে রয়েছে।

(খ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ওসিউল্লাহ সাহেবের এক চিঠির আংশিক হযরত হাকীমুল উম্মতের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। পূর্ণ চিঠিটি নিম্নরূপঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

এ ধরনের প্রশ্নের জবাব আগেও দেওয়া হয়েছে। এখন আপনিও লিখে পাঠিয়েছেন, তবে আপনার পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন বিস্ময়কর বিষয়। এই তাবলীগ জামাত আজ নতুন বিষয় নয়। এর উপর এক যুগ পার হয়ে গিয়েছে। এখন এ জামাত উন্নতীর পথে। ওলামা কেরামও অংশগ্রহণ করছেন। তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অবস্থান বিবেচনা করেই অংশগ্রহণ করছেন। আর এটি দিবালোকের মত পরিষ্কার। তারপর কোন প্রকার প্রশ্নের অবতারণা তাও আমার মত মানুষের কাছে কোনই প্রয়োজন থাকে না।

কাজ করাই হল আসল উদ্দেশ্য আর তা করতে হবে শরীয়ত সম্মত পন্থায়। ওলামা কেরাম উভয় দিক সম্পর্কেই অবগত রয়েছেন। সুতরাং যারা তাঁদের তাকলীদ করা আবশ্যক মনে করছেন তাঁদের জন্য তাকলীদ করা আবশ্যক। বলাবাহুল্য, মানুষ কোন কাজ করার পূর্বেই শরীয়তের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব ও অবস্থান কি তা বিবেচনা করেই কাজ আরম্ভ করে। আর এতেও এ দু'টি দিক দেখে শুনে নেয়া হয়েছে। এখন আর প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন তো হয় কাজের পূর্বে; সুতরাং এখন তো প্রশ্ন নিরর্থক। এখন তাবলীগ জামাত উন্নতীর পথে এবং দিন দিন উন্নতী বৃদ্ধিই পাচ্ছে। যারা এ জামাতের পক্ষে রয়েছেন তাদের ইখলাসের সাথে কাজ করে যাওয়া উচিত। প্রশ্ন করার অর্থ তো এখনও এ বিষয়ে দ্বিধা রয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে প্রশ্ন করব, তবে কি এর জায়েয-নাজায়েয নিয়ে দ্বিধা? না সকলকে এতে শরীক করার ইচ্ছা? জরুরী কাজ তো অনেক। আর সবগুলোই করতে হবে। এ কাজের জন্যও একটি জামাত হওয়া জরুরী। আর শরীয়তের সীমারেখার প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রত্যেক জামাতের জন্য আবশ্যক। ওয়াস্‌সালাম।

ওসীউল্লাহ (উফিয়া আনহু)

(চশমায়ে আফতাব)

হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ সাহেবের বিশেষ খলীফা এবং তাঁর খানকা থেকে প্রকাশিত 'মা'রিফাতে হক' সাময়িকীর সম্পাদক ডঃ সালাহ আহমদ সাহেবের জামাতা জনাব শামসুর রহমান সাহেবের একটি পত্র এসেছে আমার কাছে। তাতে তিনি তার নিজের সাপ্তাহিক দুই গাশ্‌ত করা, মারকাযে শবগুজারী, ফজরের পর তা'লীম ও সাপ্তাহিক একটি বয়ান নিজের দায়িত্বে হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন তাবলীগী তৎপরতার কথা বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, আমার এসব তৎপরতার ব্যাপারে ডঃ সাহেব কোন সময় বাধা প্রদান তো করেননি উপরন্তু মাঝে মধ্যে অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলেছেন, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল এবং এটি আমাদেরই কাজ।

আল্লাহ পাক ডঃ সাহেবকে এই উত্তম তত্ত্বাবধানের জন্য উভয় জাহানের উত্তম জাযা দান করুন এবং তার জামাতার সকল মেহনতের সওয়াবের এক অংশ তাকেও দান করুন। আর এসব নেকের সমষ্টি হযরত মাওলানা ওসীউল্লাহ

সাহেবকেও দান করুন। কেননা এ সবই তাঁর নেক নযরের ফলাফল।

(গ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা ও মাদ্রাসা মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুরের নাযিম মাওলানা আসআদুল্লাহ সাহেবের পত্রঃ

শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা!

ওয়ালাইকুমুস্‌ সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

কয়েক দিন হল আপনার জবাবী চিঠি পেয়েছি। হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগী আন্দোলন সম্পর্কে থানুভী (রহঃ)-এর বিরোধীতার ব্যাপারে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এ বিষয়ে বহু চিন্তা-ভাবনা করার পর এবং এ বিষয়ে আমার যা জানা রয়েছে তা সব স্মরণ করার পর আপনার চিঠির জবাব লিখার জন্য মুহাম্মদউল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছি।

আমার জানা মতে এবং আমার সামনে হযরত থানুভী (রহঃ) কাউকে তাবলীগ করতে নিষেধ করেননি। মাত্র কয়েক দিনের কথা, হযরত মুফতী শফী (রহঃ) তাবলীগ জামাতের জবরদস্ত কর্মী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সাহেবকে তাঁর ওখানে তাবলীগী বয়ান করিয়েছেন। হযরত মুফতী সাহেব নিজের ওখানে বরাবর কাজ করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বহু ভক্ত-অনুরক্ত সক্রিয়ভাবে তাবলীগে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হল, আমি এতে অংশ গ্রহণ করা নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি; যদিও বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তেমন একটা সম্ভব হয়ে উঠে না। তারপরও সময়ে সুযোগে তাবলীগের বিভিন্ন এজতেমায় অংশগ্রহণ করে থাকি।

আজ থেকে চার পাঁচ বছর পূর্বের কথা; সাহারানপুরের জামে মসজিদে প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক এজতেমায় রীতিমত অংশগ্রহণ করতাম। শুধু তাই নয়; বরং আমার সকল জাহেরী ও বাতেনী বন্ধু-বান্ধবদের এ দিকে দৃষ্টি দেয়ার জন্য নির্দেশ করে থাকি। যারা আমার কাছে বাইআত গ্রহণ করে তাদেরকেও তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করে থাকি।

আর এ কথা বাস্তব সত্য যে, আমাদের হযরতের (থানুভীর) এখানে বরাবর তাবলীগের কাজ হয়ে এসেছে। কোন বিশেষ মুবাল্লিগ সম্পর্কে হয়ত কোন সময়

সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তাবলীগের উপর আমার জানা মতে কখনও সমালোচনা করেননি।

অপর পক্ষে আমি নিজেও যতটুকু এই জামাতকে পর্যালোচনা করেছি তাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এ যুগে সুন্নাতে রাসূল মতে জীবন যাপনের জন্য এ তাবলীগ জামাতই একমাত্র পথ। এরপর এ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

বাস্তব কথা এই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাবলীগের অপরিহার্যতা সন্দেহাতীত এবং এর উপকারিতাও দিবালোকের মত পরিষ্কার। আল্লাহ পাকের নির্দেশে আম্বিয়া কেরাম তাবলীগ করেছেন। তাদের পর সাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ওলামা, আওলিয়া ও সুফিয়া কেরাম বরাবর তাবলীগ করে এসেছেন।

আশা করি বরং দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আপনাকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি এবং আপনার মনে আর কোন দ্বিধা নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাবলীগ জামাত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং এর সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন।

হযরত শায়েখের কাছে শুনেছি যে, হযরত ফুলপুরী (রহঃ) তাবলীগের জবরদস্ত সমর্থক ছিলেন। হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেব তো কোমর বেঁধে এ তাবলীগী আন্দোলনের সমর্থন করেছেন। সেই সাথে দাওরার হযরত মাওলানা আমীর আহমদ সাহেব, মুফতী মুযাফ্‌ফর হুসাঈন সাহেব সহ অন্যান্য সকল আসাতেজা কেরাম সক্রিয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করে আসছেন।

এ কথাও বাস্তব সত্য যে, গোটা মাযাহেরুল উলূমকে তাবলীগের মারকায ও ঘাঁটি বলা চলে। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা, সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক সকলেই মাযাহেরুল উলূমের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হযরত শায়েখ মুবাল্লেগীনদের দাওয়াত ইত্যাদিতে প্রতি মাসে উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় করেন।

মুহাম্মদ আসআদুল্লাহ

লিপিবদ্ধ করণে মুহাম্মদ উল্লাহ

(ঘ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা ও দারুল

উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার মহা পরিচালক হযরত মাওলানা আল-হাজ কারী মুহাম্মদ তায়্যিব সাহেব তাবলীগ জামাতে এত প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছেন যা গুণে শেষ করার মত নয়।

হযরত কারী সাহেবের কয়েকটি বয়ান "কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" নামক পুস্তিকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত কারী সাহেবের তাবলীগী সফরগুলো সংগ্রহ করতে চাইলে "রিসালা দারুল উলূম' যথেষ্ট। মেওয়াতের বিভিন্ন এজতেমায় হযরত কারী সাহেবের সাথে এ অধমও ছিল। সাহারানপুরের বার্ষিক এজতেমাতে তো হযরত কারী সাহেব সব সময়ই অংশগ্রহণ করতেন এবং তাবলীগ জামাতের সমর্থনে এবং তাবলীগে অংশগ্রহণ করার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে একাধারে কয়েক ঘন্টা তাকরীর করতেন। এটা তো আমার নিজের দেখা।

হযরত কারী সাহেবের ভোপালের এজতেমায় বয়ান করা একটি তাকরীর মৌলভী মুহাম্মদ আহসান নদভী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং নিশান মঞ্জিল থেকে তা প্রকাশিতও হয়েছিল। জনাব আল-হাজ ইব্রাহীম ইউসুফ রাওয়া সাহেব কর্তৃক রচিত "হাকীকতে তাবলীগ"-এও সেটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ বয়ানে কারী সাহেব বলেন–

কয়েক বছর হল, হিন্দুস্তানে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) দাওয়াত ও তাবলীগের এ আন্দোলন শুরু করেছেন। আর এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই তার অন্তরে 'এলকা' করা (ঢালা) হয়েছে। তিনি তাবলীগের জন্য জামাত সমূহের পথ অবলম্বন করেছেন। আর মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) জামাতী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

সম্ভবত আমি কোথাও লিখেছি যে, এ তাবলীগ আল্লাহ পাক হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর অন্তরে একটি বিশেষ 'ফন' স্বরূপ ঢেলেছেন। এতে একদিকে যেমন রয়েছে শিক্ষা-দীক্ষা তেমনি রয়েছে আত্মিক প্রশান্তি, ভ্রমণ ও পর্যটন এবং শরীর চর্চা। আজকের যুগে এ কাজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও প্রয়োজনীয়। এ জন্যই এ কাজের অগ্রগতি এত দ্রুত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই নীরব তাবলীগের মাধ্যমে এক বিরাট বিপ্লব আসছে। হিন্দুস্তানের যে কোন অঞ্চলে এবং হিন্দুস্তানের বাহিরেও যেসব জায়গায় আমি গিয়েছি সেখানেই

তাবলীগ জামাত এবং তাবলীগী মারকায দেখেছি। সাধারণ পদ্ধতিতে বিশ্বব্যাপী এ কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এতে নেই কোন ফিতনা-ফ্যাসাদ, হৈ-হুল্লা। এমন কেউ শুনেনি যে, কোথাও কোন জামাত বিদ্রোহ করেছে কিংবা অনর্থ সৃষ্টি করেছে। এটি একটি নীরব আন্দোলন যা গোটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে যাচ্ছে। এর মকবুলিয়াত ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। তাবলীগের এ কাজে মানুষকে ঘরের পরিবেশ থেকে বের করে আল্লাহর ঘরের পরিবেশে নিয়ে আসা হয়, যে পরিবেশ ঘরের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে এসে মানুষ দায়ী হওয়ার সাথে সাথে আমলদারও বনতে আরম্ভ করে। দায়ী হয়ে আসে আর আমলদার হয়ে ফিরে যায়।

আজকের দুনিয়ায় বহু আন্দোলন চলছে কিন্তু এ আন্দোলন একটি অনন্য আন্দোলন, যার কোন তুলনা নেই। এতে না রয়েছে কোন পদ, না কোন কুরসী, না কোন মসনদ; বরং এখানে নিজের জান, নিজের মাল ব্যয় করতে হয়। এ যুগে দ্বীনের হেফাযতের জন্য এ আন্দোলন একটি সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল। আজকের দুনিয়ায় মুসলমানদের জন্য দু'টি আশ্রয় স্থল রয়েছে– একটি হল, দ্বীনী মাদারেস তথা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ। দ্বিতীয়টি হল, এই তাবলীগ জামাত।

কারী সাহেবের ৪৪ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ ওয়ায "কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কারী সাহেব বেশ কয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তারপর ইরশাদ করেছেন, এ দীর্ঘ ওয়াযের সারমর্ম হল, এসলাহে নফসের মোট চারটি পদ্ধতি রয়েছে, যা আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। আর পদ্ধতি চারটির প্রায় সব কয়টিই এই জামাতে রয়েছে। যে যতটুকু মেহনত করবে সে ততটুকুই উন্নতী হাসীল করবে। কেননা আপনি আমল করলে ফলাফল অবশ্যই পাবেন।

এ যাবত সমালোচকদের জবাব আমি ইতিবাচক পদ্ধতিতে দিয়ে এসেছি। অর্থাৎ তাদের সমালোচনা স্বীকার করে জবাব দিয়ে এসেছি। বস্তুত একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে তাদের এ সমালোচনা দৃষ্টিপাত করারই যোগ্য নয়। কেননা, এ জামাতে এক দিকে যেমন রয়েছে প্রবীন প্রবীন অনেক সাথী, যাঁদের থেকে ইচ্ছা করলে এ কাজের উসূল জানা যেতে পারে, আর উসূল মতে কাজ করলে উন্নতী অনিবার্য; অন্য দিকে রয়েছেন অনেক মাদ্রাসার শিক্ষক ও মুফতী

সাহেবান, যাঁদের থেকে ইচ্ছা করলে ইলমও হাসিল করা যেতে পারে এবং মাসআলাও জানা যেতে পারে। তবে এসব অনুকূল পরিবেশ কার জন্য? যারা কাজ করে তাদের জন্য। অপর পক্ষে কাজ যারা না করে তাদের জন্যই যতসব প্রশ্ন।

যাহোক এ নমুনা অত্যন্ত পরিপূর্ণ। অবশ্য মনে না চাইলে ভিন্ন কথা। কথিত আছে, তুমি নিজেই যদি ইচ্ছা না কর তবে বাহানা হাজারো হতে পারে। যাদের বলার ছিল তারা বলে দিয়েছে। ঘোষণাকারীরা ঘোষণা করে দিয়েছে, গন্তব্য স্থলও জানিয়ে দিয়েছে এবং ফলাফল কি হবে তাও বাতলে দিয়েছে। এখন আর তাদের দায়িত্ব নয় কারো দিকে এগিয়ে আসা। কেউ অগ্রসর হয়ে কাজ করলে সে ফল পাবে।

বলাবাহুল্য যে, এর ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক। সুতরাং সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত। তালী'ম, গাস্ত, সময় লাগানো যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব অংশগ্রহণ করা উচিত।

সত্যি বলতে কি, এ কাজ থেকে দূরে থাকা মাহরূমীই বটে। সুতরাং মানসিকভাবে, কার্যত যে কোন পর্যায়েই হোক এতে অংশগ্রহণ করা উচিত।

(৬) হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলইমান নদভী (রহঃ) লখনৌ অবস্থানকালে অনুরূপভাবে ভোপাল ও পাকিস্তান অবস্থানকালেও তাবলীগী এজতেমাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করেন। মক্কা মদীনার এজতেমাগুলোতেও তিনি অংশগ্রহণ ও বয়ান করেন।

মাওলানা আলী মিয়া রচিত হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে সৈয়দ সুলায়মান নদভী সাহেব একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন, যার সম্পর্কে তাযকেরায়ে সুলায়মানে বলা হয়েছে যে, সারগর্ভ এই শীর্ষক ভূমিকাটির কোন তুলনা নেই।

মাত্র বিশ পৃষ্ঠায় লিখা এই নিবন্ধটিতে যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন তার কিছুটা মুল্যায়ন করা যাবে এর শিরোনামগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে। যেমন, (১) মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব (২) রাজ্যক্ষমতা মুখ্য উদ্দেশ্য নয় (৩) মুসলিম উম্মাহ নবীর স্থলাবর্তী (৪) শিক্ষা ও দীক্ষার সমন্বয় (৫) শিক্ষা ও দীক্ষার বিভাজন (৬) শিক্ষা ও দীক্ষার ঐক্যেই সফলতা (৭)

নবুওয়তি ভাবধারাই উম্মতের জীবনধারা (৮) আমাদের আলোচিত বক্তব্য এ মাপকাঠিতে (৯) ওয়ালিউল্লাহী খান্দান (১০) আলোচিত ব্যক্তির বংশসূত্র (১১) সমকালীন তাবলীগী মেহনতের ব্যর্থতা ও কারণ (১১) দাওয়াত ও তাবলীগের নববী নীতি। (তাযকেরায়ে সুলাইমান)

এই তো হল, মোটামুটি বিষয়বস্তু। এতে তিনি "আমাদের আলোচিত ব্যক্তি এ মাপকাঠিতে" শিরোনামের শুরুতে লিখেন, আগামী পৃষ্ঠাগুলোতে যে মহান দা'ঈ ও তাঁর দাওয়াতি মেহনতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে; আমার দু'চোখের সৌভাগ্য এই যে, আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর নূরাণী চেহারার প্রতিটি ভাবরেখা, তাঁর ঘর-বাহিরের বিভিন্ন গতিবিধি ও আচরণধারা এবং তাঁর ভিতরের দরদ ও অন্তর্জ্বালা বারবার আমি দেখেছি, শুনেছি এবং কাছে থেকে অনুভব করেছি। কপালে যাদের এ সৌভাগ্য জুটেনি তারা সজাগ অনুভূতি ও উপলব্ধির সাথে এ বইটি পড়ুন; এ সব ক'টি বিষয় আপনার সামনে বেশ পরিস্ফুট হবে। সেই সাথে দাওয়াতের উছূল ও কর্মপন্থা এবং দাওয়াতের হাকীকত ও সারবত্তা পূর্ণ হৃদয়ংগম হবে।

আর "দাওয়াত ও তাবলীগে নববী নীতি" শিরোনামের অধিনে লিখেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিতে দাওয়াত ও তাবলীগের যে সকল মূলনীতি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তন্মধ্যে একটি হলো, 'দাওয়াত নিবেদন'। অর্থাৎ মানুষের আগমন প্রতিক্ষায় বসে না থেকে তিনি ও তাঁর প্রেরিতগণ দূরদূরান্তের বস্তিতে মানুষের দুয়ারে হাজির হতেন এবং সত্যের দাওয়াত পেশ করতেন। এভাবেই আল্লাহর রাসূল মক্কা থেকে সেই 'পাথর খাওয়া' তায়েফে সফর করেছেন এবং নেতৃস্থানীয়দের ঘরে ঘরে তাবলীগ করেছেন। হজ্জ মৌসুমে আগত প্রতিটি গোত্রের কাফেলায় গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং মানুষের উপহাস পরিহাস উপেক্ষা করে তাদের সামনে হকের পায়গাম তুলে ধরেছেন। মানুষের সন্ধানে মানুষের দুয়ারে ধরনা দেয়ার এ নববী-কোরবানীর পথ ধরেই এক সময় সেই মহাভাগ্যবান ইয়াছরাবীদের (ইয়াছরিব বা মদীনার অধিবাসী) দেখা পাওয়া গেলো, যাদের মাধ্যমে 'ঈমান-সম্পদ' মক্কা হতে মদীনায় স্থানান্তরিত হলো।

হোদায়বিয়া সন্ধির পরে শান্তি ও স্বস্তিকালীন সময়ের সুযোগে মুসলিম

দূতগণ ইসলামের বার্তা নিয়ে মিশর, ইরান ও হাবশার রাজদরবারে পৌঁছেছিলেন এবং ওমান, ইয়ামান, বাহরাইন ও সিরীয়া সীমান্তের সরদারদের মজলিসে হাজির হয়েছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন ছাহাবী আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রে গিয়ে ইসলামের তাবলীগ করেছেন। হযরত মুছআব বিন ওমায়ের (রাঃ) গিয়েছেন মদীনায় এবং হযরত আলী ও মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) গমন করেছেন ইয়ামান অভিমূখে। যুগে যুগে দেশে দেশে ওলামায়ে হক ও আইম্মায়ে দ্বীনের এটাই ছিলো অনুসৃত পন্থা।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, হকের পায়গাম পৌঁছানোর জন্য আল্লাহর বান্দাদের দুয়ারে গিয়ে হাজির হওয়া দা'ঈ ও মুবাল্লিগের নিজস্ব কর্তব্য।

খানকার স্থির বাসিন্দাদের বর্তমান আচরণ থেকে কেউ কেউ মনে করে যে, হকপন্থী এই সাধক পুরুষদের কর্মনীতি সবসময় বুঝি এমনই ছিলো। এ ধারণা আগাগোড়া ভুল। তাঁদের জীবন-কাহিনী পড়ে দেখুন; কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা? কোথায় আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ করেছেন? তারপর কোথায় কোথায় গিয়ে সত্যের আলো ও হিদায়াতের নূর ছড়িয়েছেন? আর শেষ বিশ্রামের জন্য কোথায় গিয়ে মাটির আশ্রয় পেয়েছেন? এই 'সফরি-জিহাদ' তারা এমন এক সময় করেছিলেন যখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। রেল-বিমানের গতিও ছিলো না মানুষের কল্পনায়। তাই "ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী" বলার মতো গর্ব ছিল না তাদের।

আজমীরের হযরত মঈনুদ্দীন চিশতির জন্ম সীস্তানে। আধ্যাত্মিক সাধনা আফগানিস্তানে আর সত্য প্রচার করেছেন রাজপুতানার কুফুরস্তানে। হযরত ফরীদ শোকরগঞ্জ সিন্ধুর উপকূল পথে দিল্লী হতে পাঞ্জাব চলাচল করেছেন। তাঁর শিষ্য উপশিষ্যদের মধ্যে সুলতানুল আওলিয়া হযরত নিযামুদ্দীনের এবং পরবর্তীতে তাঁর খলীফাদের জীবন-কথা পড়ুন। সফরের পথ পরিক্রমা লক্ষ্য করুন। আর মানচিত্র খুলে দেখুন, কোন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁদের মাজার। কেউ দক্ষিণাত্যে, কেউ মালয়ে, কেউ বাংলাদেশের দূর পাড়াগাঁয়ে। কেউ বা যুক্তপ্রদেশের অখ্যাত কোন এলাকায়।

সৈয়দ সুলাইমান নদভী তাঁর একটি চিঠিতে লিখেন,

ভোপাল হতে, ১লা জিলহজ্জ ১৩৬৮ হিঃ

প্রিয় (আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন)!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

মক্কী জীবন থেকে মাদানী জীবন সফলকাম হওয়া দুষ্করই বটে। আর অতীতের ঘুনে খাওয়া সমাজ ব্যবস্থার উপর নতুন দেয়াল নির্মাণ অসম্ভবই বটে। নিজে মুসলমান রূপে দাঁড়িয়ে উঠা, অন্য মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান রূপে গড়ে তোলা সময়ের গুরু দায়িত্ব। আর এ গুরু দায়িত্বের প্রতি অবজ্ঞা করার পরিবর্তে মহব্বতের সাথে তা আঞ্জাম দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

(তাযকেরায়ে সুলায়মান)

সৈয়দ সাহেবের এই জীবনী-গ্রন্থের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর তাবলীগ জামাতের একটি বড় মারকায ভোপালেও ছিল এবং বিভিন্ন কারণে তাবলীগের সাথীদের হযরতের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাই তার ভোপাল অবস্থানকালে তাবলীগের যাবতীয় কাজের এক রকম তিনি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আর অনেকটা তার নির্দেশেই মাওলানা আশফাকুর রহমান সাহেব কান্ধলভী অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং দ্বীনের স্বচ্ছ দাওয়াত নিয়ে পৌছে যান দেশের আনাচে-কানাচে।

তার জীবনী গ্রন্থকার অন্যত্র লিখেন, একদিন অর্থাৎ হযরতের মৃত্যুর মাত্র চার দিন পূর্বে মাগরিবের নামাযান্তে যথারীতি খাটে শুয়ে পড়েন। এমন সময় সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত তার কতক সাথী সঙ্গী নিয়ে হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। অতঃপর দূত তাবলীগ জামাত সম্পর্কে হযরতের ব্যক্তিগত মত জানতে চাইলে তিনি ইরশাদ করলেন, তাবলীগ জামাত হল, স্বচ্ছ দ্বীনের দা'য়ী।

(তাযকেরায়ে সুলাইমান)

মাওলানা আল-হাজ্জ আলী মিয়া সাহেব হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর লখনৌ সফরের বৃত্তান্ত পেশ করতে গিয়ে লিখেন, সৈয়দ সুলাইমান নদভী একদিন আগেই লখনৌ পৌছে গিয়েছিলেন এবং মাওলানার সাথেই অবস্থানরত

ছিলেন। এর কয়েক ঘন্টা পূর্বে সৈয়দ সাহেবের থানাভুনের ষ্টেশনে এবং থানাভুন থেকে কান্ধলা পর্যন্ত ট্রেণে মাওলানার সাথে সংলাপের সুযোগ হয় এবং পরের দিন 'ফাটিক হাবশ খান'-এর জলসায় মাওলানার দাওয়াতের বিশ্লেষণ এবং নিজের মতামত পেশ করেন। এ সময় আট/নয় দিন দিবারাত্রি মাওলানার সাথে থাকেন। শেষ দিন জুমুআর দিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যদিয়ে 'আমীরুদ্দৌলাহ ইসলামিয়া কলেজে' তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে এক বিশাল জন সমাবেশ তাঁর অপেক্ষা করছিল। মাওলানা সুলাইমান নদভী সেখানে অত্যন্ত ভাবপূর্ণ এক বয়ান করেন। তাঁরপর মাওলানা ইরশাদ করেন ....

(দ্বীনী দাওয়াত)

(হযরত শায়খুল হাদীছ বলেন,) এ অধমও নদওয়াতুল ওলামায় হযরত দেহলুভীর সাথে ছিল। সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে হযরত দেহলুভীর বয়ানে এবং এজতেমাগুলোতে অত্যন্ত শান্ত ও গাম্ভীর্যতার সাথে হাযির হতেন এবং মনোযোগ সহকারে তার বয়ান ও বাণী শুনতেন।

একবার আমার সামনেই তিনি হযরত দেহলুভী (রহঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনার কথা শুনলে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কথা সমূহের স্মরণ জেগে উঠে।

সাওয়ানেহে ইউসুফীতে লিখা রয়েছে, ১৯৪৯ ইংরেজী সালে মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) হজ্জের সফরে গমন করেন। মাওলানার সাথে আরবের ওলামা কেরাম আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। এদিকে তাবলীগী সাথীরাও তাঁর আগমনের বেশ কদর করে এবং কয়েকটি এজতেমার ব্যবস্থা করে। এ এজতেমাগুলোতে হিজায, ইয়ামান, শিরিয়া ও ইরাক ছাড়াও মিসর, মরক্কো, টিউনিস এর অসংখ্য ওলামা কেরামও অংশগ্রহণ করেন। প্রথম এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীতে। এই এজতেমায় সৈয়দ সাহেবের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন; মিসর, সুদান, মরক্কো, টিউনিসের শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। সৈয়দ সুলাইমান নদভী অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ও জ্ঞানগর্ভ ভঙ্গিতে দাওয়াত তাবলীগ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এজতেমার শেষে সকলেই নিজ নিজ ঠিকানা প্রদান করেন এবং এ কাজের প্রশংসা করেন। সেই সাথে এ কাজের সাথে

নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেন। (সাওয়ানেহ)

রায়পুরের প্রধান মুফতী জয়নুল আবেদীন সাহেব এ হজ্জের সফরের বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে তার এক চিঠিতে লিখেন,

১৯৪৯ ইংরেজী সালে সৈয়দ সুলাইমান নদভী সাহেব হিন্দুস্তান থেকে হিজাযে তাশরীফ আনেন। তখন আমরা বরাবর তিন দিন মক্কা শরীফে তার সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তৃতীয় দিন তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি আরয করলাম, আমি পাঞ্জাবের অধিবাসী। ডাভীলে হযরত উছমানী সাহেবের কাছে দাওরা পড়েছি। 'আমর তিসরে' পড়াচ্ছিলাম। তারপর সাত চিল্লা লাগিয়ে এক বছর নিযামুদ্দীনে কাটিয়েছি। সেখান থেকে মুরুব্বীরা ১৯৪৭ ইংরেজী সালে এখানে পাঠিয়েছেন। এখন এখানেই হেজাযে এবং অবশিষ্ট সময় আরবদের মাঝে কাজ করি। ইরশাদ করলেন, বোম্বাই থাকতেই তোমার নাম শুনে এসেছি এবং এও শুনেছি যে, তুমি এখানকার আমীর। আমি আরয করলাম, জি হুযুর! মুরুব্বীরা আমাকেই আমীর বানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করলেন, আমার এখানকার সময় সম্পূর্ণ তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আমি নিজে থেকে এখানকার কোন প্রোগ্রাম বানাবো না।

এরপর এ কথায় তিনি এত অনঢ় ছিলেন যে, একদিন আমি মাদ্রাসায় সুলতীয়ায় শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক সাথী এসে বলল, হিজাযের শায়খুল ইসলাম শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হাসানের ভাই নজদের 'আমর বিল মারূফের' প্রধান শায়েখ ওমর বিন হাসান এসেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে উঠে পড়লাম এবং বাইরে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তারপর তাঁকে ভিতরে নিয়ে এলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, সৈয়দ সুলাইমান নদভীকে আমার বাড়ীতে দাওয়াত করেছিলাম। তিনি নাকি তাঁর এখানকার সময় তাবলীগে দিয়ে দিয়েছেন। তাই আমীরের অনুমতি ছাড়া দাওয়াত গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন। তাই আপনার কাছে এসেছি।

যাহোক, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ীতে বসে সৈয়দ সাহেবের খেদমতে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছ থেকে জেনে দাওয়াত গ্রহণ করে নিলাম। শায়েখ ওমর চলে যাওয়ার পর সৈয়দ সাহেবের কাছে আরয করলাম, এ সব মান্যবর ব্যক্তিবর্গের সাথে তো সরাসরি সিদ্ধান্ত করে নিলেই ভাল। ইরশাদ করলেন,

মোটেই নয়। সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।

পাকিস্তানের তাবলীগ জামাতের বিশিষ্ট কর্মকর্তা জনাব আল-হাজ্জ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব তার এক চিঠিতে লিখেন, সৈয়দ সুলাইমান নদভী সাহেব প্রতি রবিবার আমাদের সাথে যেতেন এবং আমার কথা শুনতেন। তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'বুলবুলে হাজার দাস্তা'। তিনি বলতেন, তোমরা যখন আমার কাছে আগমন কর আমার মনে হয় দুনিয়াতে শুধু মঙ্গল আর মঙ্গল বিরাজ করছে। আর তোমরা চলে গেলে মনে হয় দুনিয়াতে অনিষ্টই আর অনিষ্ট।

(চ) হযরত মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা ও মাযাহেরুল উলূম মাদ্রাসার সাবেক প্রধান শিক্ষক হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব যত দিন সাহারানপুর অবস্থানরত ছিলেন বরাবর মেওয়াতের জলসাগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য দিল্লী আগমন করেন এবং নেজামুদ্দীনই অবস্থান করেন।

এদিকে মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) মেওয়াতের এক পাহাড়ী অঞ্চলে অত্যন্ত কঠিন এক সফরে রওনা হন। মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবকেও সাথে যাওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি যদিও অসুস্থ শরীর নিয়ে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন কিন্তু মাওলানার কথায় তিনি কোন আপত্তি না করে সাথে রওনা হলেন। জুমুআর দিন প্রচণ্ড গরম ছিল। পাহাড় পর্যন্ত বাহন মিলল। সেখান থেকে পাহাড়ে পদব্রজে চড়তে হল। চাচাজান তো এ ধরনের সফরে বেশ অভ্যস্থ ছিলেন কিন্তু মাওলানার জন্য ছিল এ ধরনের সফর এটাই প্রথম।

যাহোক, উভয়ে বেশ কষ্টে জুমুআর নামায ধরার জন্য তাড়াহুড়া করে পাহাড়ে চড়তে লাগলেন। সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছিল। জনৈক অপরিচিত মেওয়াতী এদেঁর এ অবস্থা দেখে অন্য একজনকে ডেকে বলতে লাগল, ওহে দেখছ! মৌলভী 'গাঞ্জী' খাওয়ার লোভে কিভাবে দৌড়াচ্ছে। 'গাঞ্জী' হল মেওয়াতীদের অত্যন্ত প্রিয় এক প্রকার খাবার। যদিও ইউপির লোকেরা তা খেতেই পারে না।

হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের জীবনীতে গ্রন্থকার লিখেন, তাবলীগ জামাতের এ কাজের সাথে মাওলানার গভীর সম্পর্ক ছিল। তাবলীগকে তিনি সাম্প্রতীক কালের জন্য জেহাদে আকবর মনে করতেন।

তাবলীগ জামাতের প্রধান মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-কে গভীরভাবে ভালবাসতেন। তাঁর ইখলাস ও একনিষ্ঠতাকে তিনি স্বীকার করতেন মনেপ্রাণে। তাঁর ভাষায়, এসব যাকিছু হচ্ছে সব মাওলানার ইখলাস ও একনিষ্ঠতার বরকতেই হচ্ছে।

হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) তাঁর বিশেষ শাগরিদ ছিলেন। দাওরার অধিকাংশ কিতাব তাঁর কাছেই পড়েছেন। এ ছাড়াও তাবলীগ জামাতের অন্যান্য আকাবিরদের অনেকেই হযরত মাওলানার তরবীয়ত প্রাপ্ত এবং শিষ্য। মাওলানা ইনামুল হাসান ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব তাঁর কাছে পড়েছেন। সৌদিআরবের আমীর মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব তার বিশেষ শাগরিদ এবং তার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন।

মাওলানা মানজুর আহমদ চীনূটী মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে লিখে পাঠালেন যে, মাদ্রাসা থেকে ছুটি নিয়ে তিন চিল্লার জন্য পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তাবলীগ জামাতের সাথে মক্কা শরীফ যাচ্ছি। জবাবে মাওলানা লিখেন, আপনি যে কাজ করছেন কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগের জন্য এটা জিহাদে আকবার। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

করাচী থেকে জনৈক ব্যক্তি লিখে পাঠালেন যে, আমি বেশ কিছু দিন যাবৎ বরাবর তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করে আসছি। কিন্তু গত রোববার জনৈক সাথী দেখতে আলিম বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি বয়ানে দাঁড়িয়ে বলে বসলেন, গাশতে গেলে সাত লক্ষ নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়। অথচ হেরেম শরীফে কাবা ঘরের নামাযে মাত্র এক লক্ষ ছওয়াব পাওয়া যায়। তার এ কথার কোন অর্থ খুঁজে পাইনি। অথচ মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর ওয়ায (আদাবে তাবলীগে) দেখেছি; তিনি তাবলীগকে ফরযে কেফায়া বলেছেন। তাবলীগ যদি ফরযে আইন না হল তাহলে উক্ত ভদ্র লোক এ ছাওয়াব কোত্থেকে পেলেন।

হযরত মাওলানা জবাবে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিখলেন, এসব খুঁটি-নাটি বিষয় ছেড়ে দিয়ে যেসব বিষয় শরীয়ত সম্মত মনে হয় সেগুলোর উপর আমল করুন। (তাজাল্লিয়াতে রহমানী)

আর এক ব্যক্তি বরাবর চিল্লায় সময় কাটানোর কথা লিখলে জবাবে তিনি লিখলেন, বর্তমান যুগে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। তবে আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্যদের যাবতীয় হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

(তাজাল্লিয়াতে রহমানী)

(ছ) হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক মুফতী বর্তমান জামেয়া ইসলামিয়া করাচীর নাযিম মাওলানা মুফতী শফী সাহেব সম্পর্কে তো মাযাহেরুল উলূমের নাযিম সাহেব এবং এ অধমের পত্রগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দিল্লীর হযরতদের কেউ যখনই করাচী আগমন করতেন, তাঁদেরকে নিজের মাদ্রাসায় নিয়ে যেতেন এবং মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষককে সমবেত করে তাঁদের দ্বারা তাবলীগের বয়ান করাতেন। তারপর নিজেও তাবলীগের সমর্থনে জোরদার তাকরীর করতেন। এসব তো আমার নিজের দেখা বিষয়। আর সেখানকার ছাত্রদের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বতন্ত্রভাবেও তাবলীগের সমর্থনে এবং তাবলীগের নুসরত এবং তাতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাকরীর করতেন।

এই তো ছিল হযরত থানুভী (রহঃ)-এর শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন খলীফার নমুনা মাত্র। এ ছাড়াও হযরতের অন্যান্য খোলাফাদের অনেকেই এতে অংশগ্রহণ করেছেন, সমর্থন করেছেন, অন্যদের উৎসাহী করেছেন। এরপরও এ কথা কিভাবে বলা যায় যে, হাকীমুল উম্মত এ জামাত সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যদি তাই হত তাহলে কি তার খলীফাদের কেউ এ কথা জানলেন না?

আরো মজার কাণ্ড, হযরতের ভাগনে মাওলানা জাফর সাহেব স্বতন্ত্র চিল্লা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন, যা ব্যস্ততার কারণে বিলম্বিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর চাচাজানের অসুস্থতার সময় সাক্ষাত করতে আসলে তিনি সেই ওয়াদার কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি চাচাজানের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই অবস্থান করেন। এ সময় তিনি তাবলীগের বিভিন্ন এজতেমায়ও অংশগ্রহণ করতেন এবং চাচাজানের মলফুযাতও সংগ্রহ করতেন। তাঁকে এ সান্ত্বনাও দিতেন যে, আপনার পরও ইনশাআল্লাহ এ কাজ এভাবেই অব্যাহত থাকবে; যেমন মলফুযাতে দেহলুভীতে বিস্তারিত রয়েছে।

এখানে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খোলাফাদের মন্তব্য ও বাণী বিশেষ

গুরুত্বের সাথে লিখার কারণ হল; অনেকে তাঁর সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে থাকে যে, তিনি নাকি তাবলীগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল; তার খোলাফাদের কেউ কি এ কথা জানলেন না; বিশেষতঃ তার ভাগনে মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব, যিনি জীবনের শীর্ষভাগ থানাভুনেই কাটিয়েছেন এবং হযরতের খানকার প্রধান মুফতী ছিলেন। হযরতের মুসাবিদা ও ইরশাদাত লিপিবদ্ধ করতেন। হযরতের খেদমতেই থেকে 'এলাউস্‌সুনান' প্রভৃতি গ্রন্থগুলো রচনা করেছেন। তিনি যদি হযরতের অসন্তুষ্টির সামান্যতম গন্ধও পেতেন তাহলে কি এভাবে তাবলীগে অংশগ্রহণ করতেন?

এছাড়াও আরও বিভিন্ন ওলামা ও মাশায়েখের মতামত দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করছি।

(ক) হযরত মাওলানা আলহাজ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী নকশেবন্দী ভোপালী; তার একান্ত আপনজন ও ভোপালের মারকাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মাওলানা ইমরান খান সাহেবের কারণে তিনি তাবলীগের নেতৃত্ব দান করেন। বিশেষতঃ ভোপালের এজতেমাগুলোতে দু'আ করতেন এবং মাশওয়ারা দান করতেন।

হযরত মাওলানা আলহাজ আলী মিয়া হযরত শাহ সাহেবের খেদমতে কিছুদিন অবস্থানকালে তাঁর মালফুযাতগুলো তারিখ ও মজলিস ভিত্তিক সংগ্রহ করেন, যার নাম দিয়েছেন "সুহবতে বা আহলে দিল"। তাতে তিনি লিখেন–

১৮তম মজলিস, ৩রা জিলকদ ১৩৮৮ হিঃ

আজ হযরতের শরীর তেমন একটা ভাল নয়। কয়েকদিন যাবৎ কোমরে ব্যথা ছিল। আজ সম্ভবত একটু বেশী। তাই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আজ ইশরাকের পর শুয়ে পড়েন এবং চক্ষু লেগে যায়। এর মধ্যে হযরত মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব কতক সাথী সঙ্গী নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। এখানে এসে হযরত ঘুমিয়ে আছেন জানতে পেরে আমার কাছে ভিতরে মেহমানখানায় চলে আসেন। কিছুক্ষণ পর এজতেমায় অংশগ্রহণকারী মেহমান এবং খানকার আগত অন্যান্যদের ভীড় জমে যায়। এমনকি দালানের ভিতর সম্পূর্ণ ভরে যায়। হযরত ঘুম থেকে উঠে মাওলানা এনামুল হাসান

সাহেব আমার কাছে আছেন জানতে পেরে বাইরে খানকায় না গিয়ে এখানে ভিতরে চলে আসেন এবং দালানের পার্শ্বে জুতা রাখার জায়গার কাছেই বসে পড়েন। উপস্থিত লোকেরা হযরতকে প্রধান আসনে বসার অনুরোধ করলে ইরশাদ করেন, এখানেই আরাম পাচ্ছি। আসলে বে-তাকাল্লুফীতেই আনন্দ।

মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব ও তাঁর সাথীরা ইউরোপে তাবলীগ জামাতের তৎপরতা ও কারগুজারী এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ হওয়ার কথা আলোচনা করেন। আরো আলোচনা করেন, জামাতের সাথীরা প্যারিসে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করেছে। এবার রমযানে সেখানে তারাবীহও হয়েছে। তারাবীতে ৬০-৭০ জন মুসল্লী ছিল। শেষ দশ দিন একজন এতেকাফও করেছে। তারা আরো জানিয়েছেন যে, সম্ভবত, প্যারিসের ইতিহাসে এটাই প্রথম এতেকাফ।

এসব কারগুজারী শুনে হযরত অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ইরশাদ করেন, আল্লাহর কি শান! কুফর ও অন্ধকারের মারকাযগুলোতে আজ এ আমুল পরিবর্তন হচ্ছে। অথচ অন্যদিকে ইসলাম ও ঈমানের মারকাযগুলো, বুযুর্গানে দ্বীনদের খান্দানগুলো যেখানে কয়েক পুরুষ ধরে দ্বীনদারী ও বুযুর্গী চলে আসছিল সেখানে আজ চলছে পাশ্চাত্য অনুকরণ, দ্বীন ও ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ও উপহাস।

ইরশাদ করলেন, আমরা তখনই আঁচ করে নিয়েছিলাম যখন নিজামুদ্দীনের এই মসজিদটি একেবারেই ছোট ও সাধারণ একটি ঘর ছিল। কয়েকজন দুর্বল অসহায় মেওয়াতী পড়ে থাকত। তখনই আমরা এ সবুজ শ্যামল বাগান পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম।

একবার আমি নিজামুদ্দীন বেড়াতে যাই। সেখান থেকে ফিরার পথে জনৈক বলল, এখানে একটি ছোট মসজিদ এবং পাশে ছোট একটি মাদ্রাসা আছে। সেখানে একজন বুযুর্গ থাকেন। চলুন তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আসি। তিনি হলেন মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)।

যাহোক, আমরা দেখা করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, তিনি বাইরে কোথাও গিয়েছেন। যোহরের সময় আসবেন। যোহর পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। যোহরের সময় তিনি তাশরীফ আনলেন। তাঁর পিছনে নামায

পড়লাম। এ ধরনের তৃপ্তিদায়ক নামায আমার আব্বার পিছনে পড়েছিলাম, আর সেদিন পড়লাম এঁর পিছনে।

আমি মাওলানা ইউসুফ সাহেবের যুগও দেখেছি। একদিন তাঁকে বললাম, আপনাকে সেই ছোট বেলায় দেখেছিলাম। তখন আপনি (মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক কিতাব) সাফওয়াতুল মাসাদের পড়তেন। জবাবে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাষায় বললেন, এখনও তো তাই পড়ি। (সুহবতে বা আহলে দিল)

ভোপালের নিশান মঞ্জিল সাময়িকীতে হযরত শাহ সাহেবের তাবলীগের সমর্থনে বিভিন্ন বক্তব্য ও বাণী মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হত। তখন আর এ ধারণা ছিল না যে, কোন সময় এগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে।

যাহোক, কারো আগ্রহ হলে, নিশান মঞ্জিলের সাময়িকীতে খুঁজলে প্রচুর মিলে যাবে। ভোপালের বার্ষিক এজতেমা তো সুপ্রসিদ্ধ।

(খ) দিল্লীর প্রধান মুফতী আল-হাজ মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব মেওয়াতের বিভিন্ন এজতেমায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন এজতেমাতে এ অধম (শায়খুল হাদীছ সাহেব)ও সাথে ছিল।

মুফতী মাহমুদ সাহেব গঙ্গুহী (রহঃ) বলেন, মুফতী সাহেবের সাথে মেওয়াতের কোন কোন এজতেমাতে আমিও ছিলাম। মুফতী সাহেব এবং জমিয়াতে ওলামা-র সাবেক নাযিম মাওলানা আল-হাজ আহমদ সাইদ সাহেবের বয়ান মেয়াতের কোন কোন এজতেমায় বান্দা নিজেও শুনেছে। তিনি অত্যন্ত জোরদারভাবে লোকদেরকে এতে অংশগ্রহণ করার জন্য দাবী ও আহবান জানাতেন।

হযরত ইউসুফ (রহঃ)-এর জীবনীতে একটি জলসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, 'নূহ' প্রদেশে 'গুড়গানাওয়া' জিলায় ২৭ জিলহজ্জ ১৩৬৮ হিঃ রোজ রোববার একটি এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এ এজতেমায় মারকাযের আকাবির ছাড়াও মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা আহমদ সাঈদ সাহেব দেহলুভী, মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেব সিউহারুবী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব লুধয়ানুভী অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা সাইদ সাহেব দেহলুভী তাবলীগের আবশ্যকতা ও উপকারিতা

প্রসঙ্গে কয়েক ঘন্টা আলোচনা করেন। এ এজতেমায় মেওয়াতের কতক মুতাআল্লেকীন সহ অন্যান্য অসংখ্য মেওয়াতী অংশগ্রহণ করেন।

অন্যত্র লিখেন, ভোপালের সুপ্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা আব্দুর রশীদ সাহেব মিসকীন মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর জীবদ্দশায়ই মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সাহেবের মাধ্যমে ভোপালে তাবলীগের দাওয়াত দেন। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর এক চিঠিতে লিখেন, আজ এই দাওয়াত নিয়ে মাদ্রাসা আমীনিয়া পৌঁছি। আল্লাহ পাক তাঁর অশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত আশাপ্রদ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। হযরত মুফতী সাহেব সকল ছাত্র শিক্ষকদের সমবেত করেন এবং আমার আলোচনার পর মৌলভী ফখরুল হাসান সাহেব জোরদার সমর্থন করেন। তারপর সময় সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মুফতী সাহেব এর আবশ্যকতা প্রমাণ করেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর এক গুরুত্ব পূর্ণ চিঠিতে মাওলানা আলী মিয়াকে লিখেন, এই মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তা হল মুবাল্লিগীনদের একটি উল্লেখযোগ্য জামাত পাকিস্তান পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে আপনার নামে দাওয়াত এসেছে। এর কারণ হল, হায়দারাবাদ সিনধে একটি এজতেমা হতে যাচ্ছে। এতে মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা তৈয়্যব সাহেব প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরাম অংশগ্রহণ করবেন। এতে আপনার অংশগ্রহণ আবশ্যক।

সুতরাং আপনি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে তারই উপর ভরসা করে অত্যন্ত আত্মনির্ভরশিলতা ও একাগ্রতার সাথে দাওয়াত দেয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে হায়দারাবাদ সিনধে তাশরীফ নিয়ে যান। (মাকাতীব)

১৩৬০ হিজরীতে 'নূহ' শহরে এক বিরাট এজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মেওয়াতের ইতিহাসে এত বড় এজতেমা আর কখনও হয়নি। লোক সংখ্যা পচিশ হাজার ছিল বলে অনুমান করা হয়। হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবও এ এজতেমায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাষায়; আমি ৩৫ বছর ধরে ধর্মীয় রাজনৈতিক বহু সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছি। কিন্তু এ ধরনের বরকতপূর্ণ এবং মহা সমাবেশ কখনও দেখিনি। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

মুরাদাবাদের এক এজতেমায় হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর যাওয়ার কথা ছিল। তাঁর অপারগতার কারণে তাঁর স্থলে জনাব আল-হাজ্ব মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবকে পাঠানো হয়। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

(গ) দারুল উলূম দেওবন্দ-এর প্রধান মুফতী জনাব আল-হাজ মুফতী মাহমুদুল হাসান সাহেবের এই তাবলীগ জামাতের বিভিন্ন এজতেমায় অংশগ্রহণের কথা এবং তাঁর রচিত বিভিন্ন সমালোচনার জবাব বহু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত কিছু কিছু প্রবন্ধ 'কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" পুস্তিকায়ও স্থান পেয়েছে।

জনৈক সমালোচকের জবাবে লিখা তাঁর একটি নিবন্ধ "হাকীকতে তাবলীগ" এবং "কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" পুস্তিকাদ্বয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। প্রশ্নটি ছিল, তাবলীগ জামাতের তৎপরতা মাশাআল্লাহ দিন দিন বেশ উন্নতীর পথে। সারা বছর অসংখ্য জামাত দেশের আনাচে কানাচে গাশত করছে। বিশেষতঃ এখানে ভোপালে সাপ্তাহিক ও বার্ষিক এজতেমা প্রায় দেখার সুযোগ হয়ে থাকে। তবে এর কয়েকটি জিনিস বেশ আপত্তিকর মনে হয়। মন কোনভাবেই সেগুলো গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। কিন্তু গত ১৯৬৩ ইং-র নভেম্বর মাসে লখনৌতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক এজতেমায় আপনাকে দেখে ভাবলাম, আমি ভুলের উপর এবং শয়তানী ধোঁকায় পড়ে আছি। তাই মনে মনে স্থির করলাম যে, এ সংশয় দূর করার জন্য আপনারই শরণাপন্ন হব।

এরপর ভদ্রলোক তার প্রশ্নগুলোর দীর্ঘ ফিরিস্তি পেশ করেন। প্রশ্নগুলো কি ছিল তা মুফতী সাহেবের জবাব থেকেই অনুমান করা যাবে।

মুফতী সাহেব লিখেনঃ

শ্রদ্ধেয় জনাব!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহু

আপনার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু রমযান মাসে এত দীর্ঘ চিঠি পড়াই দুষ্কর। জবাব লিখা তো দূরের কথা। যাহোক, এরপরও আপনার চিঠিটি পড়ে নিলাম। কিন্তু চিঠি পড়ে মনে হল, এক্ষুণি জবাব লিখতে হবে এমন নয়।

তাবলীগ জামাতের যে চিত্র আপনি এঁকেছেন ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আর দেখার প্রশ্নই আসে না। আমি নিজেও দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করেছি। সব সময় সাপ্তাহিক এজতেমাতে অংশগ্রহণ করি। পয়ত্রিশ বছর ধরে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়ে আসছে।

সাহারানপুর, দেওবন্দ, রায়পুর, লখনৌ ও অন্যান্য এলাকার মাদ্রাসা ও খানকার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আকাবির ও ওলামা কেরাম যতটুকু এ কাজের সাথে সম্পর্ক রাখেন তা সরাসরি জানার সুযোগ হয়েছে। বুযুর্গানে দ্বীন তাদের ভক্ত ও অনুরক্তদের এ জামাতে অংশগ্রহণের জন্য যে কি পরিমাণ উৎসাহ প্রদান করে থাকেন তাও আমার অজানা নেই। তবে আপনার কথাকে একেবারেই অসত্য বলে উড়িয়ে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। হতে পারে কোন অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ দ্বারা এ ধরনের কোন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা কোন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্যবহার করে এ ধরনের ফিৎনা সৃষ্টি করেছে। আপনার লিখিত বিষয়গুলো সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মর্মস্পর্শী। তবে এ কথাও সুনিশ্চিত যে, মারকাযের মুরুব্বীদের পক্ষ থেকে এ ধরনের মুর্খজনোচিত আচরণ (অর্থাৎ কোন মাদ্রাসা কিংবা খানকার প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ কিংবা বিরোধিতা করা)-এর মোটেই অনুমতি নেই। এ সব বিষয় শুধু তাবলীগই নয়; স্বয়ং দ্বীনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাবলীগ জামাতের মূল ধারাগুলোর একটি অন্যতম ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল ইকরামুল মুসলিমীন।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর পক্ষ থেকে কঠোর হিদায়েত রয়েছে যে, এ জামাত যখন কোন বস্তী কিংবা এলাকায় যাবে, এরা যেন অবশ্যই সেখানকার ওলামা মাশায়েখদের সাথে সাক্ষাত করে। তাঁদের যাবতীয় নিয়ম নীতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ করে। তাঁদেরকে কস্মিনকালেও দাওয়াত না দেয়। তাঁদের থেকে দু'আর দরখাস্ত করে।

ওলামা কেরাম ও তালেবুল ইলমদের প্রতি বিশেষ হিদায়েত রয়েছে যে, এ কাজের কারণে যেন তাদের দরস, মুতালাআ, তাকরারে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। হক্কানী পীরের মুরীদদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত হল, তারা যেন নিজেদের যিকির, ওযায়েফ ও তাসবীহাত মোটেই না ছেড়ে দেয়। এমনকি জামাতে বের হয়েও যেন এগুলোর প্রতি পূর্ণ যত্নবান থাকে।

তাহাজ্জুদগুজারী, যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা, ভ্রাতৃত্ববোধ,

সহানুভিশীলতা, ইছার-হামদর্দী, তাওয়াযু-বিনয়, সময়ের হেফাযত ও নিয়মানুবর্তিতা আল্লাহ ও বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি যত্নশীলতা– এগুলোই হল খানকাগুলোর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর এগুলো হল আল্লাহ প্রদত্ত মাশায়েখদের উপর এক বিরাট নিয়ামত।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে এই বিষয়গুলো বদ্ধমূল করাই তাবলীগ জামাতেরও মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। (সুতরাং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যখন অভিন্ন) তারপরও এ কথা বলার কি অবকাশ থাকে যে, এ জামাত খানকাগুলোর কদর করে না।

ইলম ও যিকিরের নাম্বার, ইখলাসের নাম্বার তাবলীগে কেন রাখা হয়েছে? এ জামাত বিভিন্ন জায়গায় দ্বীনী মাদারেস প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং করছে। স্বয়ং নিয়ামুদ্দীনের মারকাযে আরবী মাদ্রাসা রয়েছে, যেখানে ছোট-বড় সব কিতাবই পড়ানো হয়।

আমি নিজে যেসব আকাবিরদের এ জামাতে বের হতে এবং অন্যদের উৎসাহিত করতে দেখেছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন–

১। মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব (সভাপতি জমিয়তে ওলামা হিন্দ, মুহতামিম মাদ্রাসা আমীনিয়া)।

মেওয়াতের বিভিন্ন এলাকায় আমি নিজেও তাঁর সাথে ছিলাম এবং তাঁকে অনেক কাছে থেকেই প্রত্যক্ষ করেছি যে, তাবলীগের প্রতি তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত তীব্রতর ছিল।

২। মুফতী আশফাকুর রহমান সাহেব (মুফতী মাদ্রাসা ফাতহপুরী, দিল্লী)।

৩। মুফতী জামীল আহমদ সাহেব (মুফতী, থানাভুন)।

৪। মাওলানা আসআদুল্লাহ সাহেব (থানুভী [রঃ]-এর বিশিষ্ট খলীফা)।

৫। মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব (প্রধান শিক্ষক, মাযাহেরুল উলূম, সাহারানপুর। থানুভী [রহঃ]-এর খলীফা)।

৬। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাকারিয়া সাহেব (শায়খুল হাদীছ, মাযাহেরুল উলূম, সাহারানপুর। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবের খলীফা)।

৭। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ সাহেব (প্রধান শিক্ষক, দারুল উলূম দেওবন্ধ। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ সাহেব গঙ্গুহী [রহঃ]-এর খলীফা)।

৮। হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী।

৯। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মঞ্জুর সাহেব নু'মানী প্রমুখ।

একটি কাজ যখন বিশ্বব্যাপী চলছে এবং মুসলিম উম্মাহ দলে দলে এতে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণের জন্য অংশগ্রহণ করছেন সুতরাং তাদের থেকে কিছু বে-উসূলী ও ভুল হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ জামাতগুলো পরিচালনা করার জন্য যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ওলামা কেরামেরও অভাব। তাই বলে এও নয় যে, এদের ভুলগুলো ভুল নয়। ভুল অবশ্যই ভুল। আর এও সত্য যে, দু' একজনের ভুলের কারণে মূল কাজের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তা ছেড়ে দেয়া এবং এর উপকারিতা ও আবশ্যকতা উপেক্ষা করা মোটেই ঠিক হবে না। বরং নিজে ভুল থেকে বেঁচে অন্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। আর এ গুরু দায়িত্ব সবচে বেশী বর্তাবে সেসব আলিম সম্প্রদায়ের উপর যারা এদের ভুলত্রুটি দেখে মনে প্রশ্ন ও সমালোচনার পাহাড় জমা করে রেখেছেন এবং এ কাজ থেকে একেবারেই দূরে সরে রয়েছেন। তাদের দায়িত্ব হবে এ কাজকে নিজের কাজ মনে করে পূর্ণ শক্তি সামর্থ নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করা এবং বিদ্যা-বুদ্ধি বঞ্চিত নীরিহ ভাইদের অত্যন্ত সহানুভূতি, ভালবাসা ও দরদের সাথে (হিতকামনাই হল প্রকৃত দ্বীন)। এই নীতিকে সামনে রেখে হিকমতের সাথে তাদের ইসলাহ করা।

কোন সময় যদি সাক্ষাত হয় তাহলে মৌখিক আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

আমার কোন কথায় মনে কষ্ট হয়ে থাকলে আশা করি ক্ষমা করে দিবেন। এ চিঠিতে কোন ভুল হয়ে থাকলে আশা করি সংশোধন করে দিবেন, আমাকে জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব। ওয়াস্‌সালাম।

আহকার মাহমুদ (উফিয়া আনহু)

মাদ্রাসা জামেউল উলূম, কানপুর।

মুফতী সাহেবের নয়টি চিঠি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে মাকাতীবে মাহমুদীয়া নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং "কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হায়" কিতাবেও এগুলো স্থান পেয়েছে। আলোচ্য চিঠিটি সেই নয়টি চিঠির অষ্টম নম্বর।

এ পুস্তিকার ভূমিকার প্রকাশক লিখেন, মুফতী সাহেব হলেন সেসব মহান মান্যবরদের একজন যারা তাঁদের ছাত্রজীবন থেকেই এবং তাবলীগ জামাতের সূচনাকাল থেকেই এই জামাতের সাথে জড়িত এবং যখন যেখানেই ছিলেন নিজের তালীম, তাদরীস ও ইফতা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যস্ততার মাঝে দিয়ে মারকাযের সাথে জড়িত ছিলেন এবং মারকাযেরই ছত্রছায়ায় থেকে কাজ করেছেন। এখনও দারুল উলূম দেওবন্দে মাঝে মধ্যে ছাত্রদের মাঝে বয়ান করেন। যেহেতু তিনি তাবলীগ জামাতের সাথেও ওৎপ্রোতভাবে জড়িত সেই সাথে দেশের সবচে' বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মুফতী এবং তার কাছে তাবলীগ সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্ন এসে থাকে এবং সেগুলোর জবাব তাঁকে দিতে হয় সুতরাং তার চিঠিগুলোর কতটুকু গুরুত্বের অধিকারী তা কোন বিবেকবান ব্যক্তির কাছেই অস্পষ্ট নয়। বস্তুতঃ এ চিঠিগুলো উম্মতের জন্য রেখে যাওয়া এক অমূল্য উপহার, যার জন্য আমরা মুফতী সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন।

এগুলো ছাড়াও মুফতী সাহেবের আরও বহু চিঠি বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

(ঙ) জমিয়তে ওলামা হিন্দের নাযিম মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাবলীগী সফরে প্রচুর অংশগ্রহণ করতে থাকেন। আমার নিজেরও মেওয়াতের বিভিন্ন এজতেমায় মাওলানার সাথে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের গণ্ডগোলের সময় বিভিন্ন এজতেমায় মাওলানার অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সাওয়ানেহে ইউসুফীতে সে বিবরণ এভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মাওলানা হিফযুর রহমান তার বৈপ্লবিক জীবন পুরাতন সম্পর্ক ও দায়িত্ববোধের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। দিবা-রাত্রি তিনি মাওলানা

ইউসুফ (রহঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিতেন।

অন্য দিকে মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)ও তার এ অসাধারণ অনুগ্রহের কথা সর্বদা স্মরণ করতেন। তিনি বলতেন, সবাই যখন হিম্মতহারা হয়ে পড়েছিল, আপন যখন পর হয়ে গিয়েছিল; মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তখন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসলেন এবং এ জামাতকে নিজের জামাত পরিচয় দিয়ে সব সময় এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। জামাত যেখানেই যেতে চাইত শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাদের নিরাপত্তার জন্য সাথে চিঠি দিয়ে দিতেন।

অনেক সময় জামাতের পক্ষ থেকে বিরক্তিকর আচরণ হলেও তিনি বিরক্ত হতেন না এবং সাহায্য সহানুভূতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন হত না।

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর নীতি ছিল, তিনি রাজনৈতিক এমন কোন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন না যাতে তাবলীগের কোন ক্ষতি হতে পারে। এই নাযুক মুহূর্তে এ ধরণের কয়েকটি পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল।

একবার মেওয়াতের 'ঘাসীড়াহ' অঞ্চলে সরকারী পর্যায়ে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সম্মেলন ছিল। এতে গান্ধীজি, সরদার টাপিল, পণ্ডিত নেহরুও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু সম্মেলনটি ছিল মেওয়াত এলাকায় আর মেওয়াতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেবের অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্ত রয়েছে। আর তারাই এ গণ্ডগোলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাই মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেব চাচ্ছিলেন, তিনিও এতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যেহেতু সম্মেলনটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাই মাওলানা না যাওয়ার মনস্থ করলেন। এ দিকে মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেব এবং মাওলানা আহমদ সাঈদ সাহেব নিজে নিযামুদ্দীন এসে মাওলানাকে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি এঁদের শ্রদ্ধার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে অসম্মতি জানালেন।

এ স্পষ্ট অস্বীকারে স্বভাবতঃই মাওলানার ব্যক্তিত্বে আঘাত এসেছে। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হলেন না এবং কোন সময় কথায় কিংবা ইশারা ইঙ্গিতেও কোন প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। বরং আগের মতই সর্বদা বিপদের মুহূর্তে জামাতের পাশে এসে দাঁড়াতেন। মাওলানার এ উদারতার কারণে মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) সর্বদা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন।

মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেবের এ উদারতা ও অনুগ্রহ চিরস্মরণীয় ছিল এবং মারকাযের ছোট বড় সকলের কাছে স্বীকৃত ছিল। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

মোটকথা, মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেব সর্বদা এ জামাতের পাশে ছিলেন এবং এ জামাতকে নিজের জামাত বলে পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও এবং মাওলানার আল্লাহকে সাক্ষী রেখে স্পষ্ট অস্বীকার সত্ত্বেও অনেকে তাঁর পক্ষ থেকে বিভিন্ন মিথ্যা কথা প্রচার করেছে। অনেকের কলম থেকে বড় বড় হেডিং-এ এ ধরনের মন্তব্যও নিসৃত হয়েছে যে, তাবলীগ জামাতকে (ইংরেজ) সরকার কর্তৃক পয়সা দেয়া হয়।

যাহোক, এখন সে সরকারও নেই সে প্রশ্নেরও অবকাশ নেই। তবুও অনেক সময় সেই পুরাতন কথার উপর ভিত্তি করে অনেকে অপবাদ রটানোর চেষ্টা করে। তাই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করব।

(চ) মুফতী আজীজুর রহমান সাহেব বিজপুরী তো মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ)-এর স্বতন্ত্র জীবনী লিখেছেন। এতে তিনি এ কাজের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সেই সাথে মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর ওলামা কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও এতদ্‌সংক্রান্ত বহু ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেন, হযরতজী বলতেন, তাবলীগ জামাতের এ তৎপরতা এবং ছয় নম্বরের বহুল প্রচার বর্তমান পাশ্চত্যপন্থীদের কোমর ভাংতে পারে। তার এ কথা আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। পরিশেষে আমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আমি দৃঢ়তার সাথে বলে থাকি যে, দুনিয়া ও আখেরাতের যাতীয় কামিয়াবী এদিকে রয়েছে।

আমার এ পুস্তকে সকল ওলামা ও আকাবিরদের অভিমত সংগ্রহ করা উদ্দেশ্যও নয় আর সে সময়ও নেই। যে কয়জনের কথা মনে ছিলো লিখে দিয়েছি। অন্যথায় খুঁজলে শত নয় হাজার হাজার ওলামা ও ব্যক্তিবর্গ মিলবে যারা এ কাজকে দেখেছেন বুঝেছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। এরপরও যদি দু' একজন আকাবির এর বিরোধিতা করেন এতে কিছু আসে যায় না। কেননা, দ্বীনের এমন কোন কাজ নেই যাতে মতোবিরোধ হয়নি। তবে আমি এ কথা জোর দিয়েই বলতে পরি; যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন তারা নিছক শুনা কথার উপর ভিত্তি করেই এর বিরোধিতা করছেন। সরাসরি

নিযামুদ্দীন কিংবা এজতেমাগুলোতে গিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। এজন্যই আমার কাছে কেউ কোন অভিযোগ নিয়ে আসলে তাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিযামুদ্দীন কত দিন অবস্থান করেছেন এবং জামাতে কত চিল্লা লাগিয়েছেন। তা হলে আমি অনুমান করতে পারব এ প্রশ্ন আপনার নিজস্ব না শুনা কথা।

(ছ) ডঃ জাকের হোসাইন (মরহুম) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে; বরং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের গণ্ডগোলের পূর্বে নিজামুদ্দীন বরাবর তাশরীফ নিয়ে যেতেন। লণ্ডনে সর্ব প্রথম তাবলীগী গাশ্‌ত তার নেতৃত্বেই হয়। ঘটনার বিবরণ হলঃ

ডঃ সাহেব কোন বিশেষ উপলক্ষে লণ্ডনে ছিলেন। এদিকে সর্ব প্রথম তাবলীগ জামাত লণ্ডনে পৌছে। ডঃ সাহেব অনেক আগে থেকেই এই জামাতের সাথে পরিচিত ছিলেন। কেননা জামেয়ায় মিল্লিয়ায় এ জামাত প্রচুর পরিমাণে যেত। (সেখান থেকেই তিনি এ জামাতের সাথে পরিচিত।) সুতরাং এ জামাত লণ্ডনে পৌছলে তিনিই সর্বপ্রথম এ জামাতকে লণ্ডনে গাশ্‌ত করান।

"বীস বড়ে মুসলমান" (বিশজন শীর্ষস্থানীয় মুসলমান) কিতাবে ডঃ সাহেবের একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাতের এই কর্মধারা ইতিপূর্বে আমার দেখার এবং বুঝার সুযোগ হয়েছে। এ ধারায় এ কাজের রূহ পরিলক্ষিত হয়। ঈমান ও একীন আলোচনা-পর্যালোচনা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। এ দৌলত যারা লাভ করেন তাদের থেকে অন্যদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়। তাদের অন্তর থেকে অন্যদের অন্তরে প্রজ্জলিত হয়। তাদের আমলী জজবা থেকে বে-আমল মৃতদের মাঝে জীবনের সঞ্চার হয়।

ডঃ সাহেব সম্পর্কে আমি স্মৃতিপট থেকে লিখেছিলাম যে, লণ্ডনের সর্ব প্রথম গাশত তার নেতৃত্বেই হয়। এরপর জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে অবগত হলাম যে, হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) জীবন চরিতে এ বিষয়টি বিস্তারিত লিখা রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর ভক্ত ও অনুরক্তদের মধ্যে এমন

কতক আহলে ইলম, পাশ্চাত্যজ্ঞান বিশারদ ও ইউরূপীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে পরিচিত মান্যবর ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন, যাদের শীর্ষে জামেয়া মিল্লিয়ার শায়েখ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডঃ জাকের হুসাইন খানও রয়েছেন। এঁদের দীর্ঘ দিন যাবৎ মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর খেদমতে আসা যাওয়া ছিল, হযরতের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এ আন্দোলনেরও সমর্থক ছিলেন।

২০শে জানুয়ারী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ জাকের হুসাইন এবং জনাব রাহাত রেজবী সাহেবের মাধ্যমে লণ্ডনে তাবলীগের প্রথম গাশ্ত হয়। লণ্ডনের পরিবেশ সম্পর্কে যারা অবগত তাদের সহজেই বুঝে আসবে যে, সে সময় লণ্ডনে খালেস দ্বীনী এবং তাবলীগী কাজ করা বিশেষতঃ গাশত করা কত বড় আয়াস সাধ্য কাজ ছিল। ডঃ সাহেব তখন শিক্ষা বিষয়ক কোন এক সম্মেলন উপলক্ষে লণ্ডন ছিলেন। তিনি লণ্ডনে এ গাশতের আমল জারী করেন। বিদ্যাজগতে যেহেতু তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং এই ময়দানে তার অবতরণ লণ্ডনের অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বেশ সহায়ক হয়।

লণ্ডন গমনকারী এই প্রথম জামাতের আমীর ছিলেন, রাহাত রেজা সাহেব লখনুভী। এ গাশ্ত অত্যন্ত সার্থক ছিল এবং এখান থেকেই লণ্ডনের স্থানীয় কাজ আরম্ভ হয়।

সমালোচনা- ১১

আর একটি অভিযোগ প্রায় শুনা যায় যে, তাবলীগওয়ালারা (জামাতে বের করার ব্যাপারে) জোর-জবরদস্তী করেন। আমার ধারণা মতে জোর-জবরদস্তী আর পীড়াপীড়ি ও অনুনয়-বিনয় এ দুয়ের মাঝে বেশ তফাত রয়েছে। সাধারণের বোধগম্য না হলেও আশা করি ওলামা কেরামের বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, 'ইকরাহ' এর সংগা কি? আমার তো হাজার হাজার ছোট-বড় এজতেমায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছে। পীড়াপীড়ি ও উৎসাহ প্রদান করতে তো বহু দেখেছি, শুনেছি, কিন্তু জোর-জবরদস্তী করতে কাউকে দেখিনি। পীড়াপীড়ি ও অনুনয়-বিনয়কেই যদি কেউ জোর-জবরদস্তী বলে দেয়, তাহলে তো করার কিছু নেই।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, যাদের খেদমত ও আনুগত্য তোমাদের উপর আবশ্যক তাদের খেদমত ও আরামের পূর্ণ এন্তেজাম ও তাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থা করে জামাতে বের হবে। তাদের সাথে এমন ব্যবহার করবে যেন তোমাদের জ্ঞান ও গুণগত উন্নতী দেখে তোমাদের তাবলীগের সাথে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আরও উৎসাহী হন। (মলফুযাত)

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর এক বাণীতে বলেন, ওলামা কেরামের একটি প্রোগ্রাম এমন করা উচিত যে, পূর্ব থেকে নির্ধারিত করে কোন এক জুমআয় অন্য কোন মসজিদে নামায পড়বেন। বন্ধু-বান্ধবদেরও আগে থেকে জানিয়ে দিবেন। সেখানে গিয়ে নামাযের আগে কিছুক্ষণ তাবলীগী গাশত করে লোকদেরকে মসজিদে সমবেত করবেন। নামাযের পর তাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য বসিয়ে দ্বীনের গুরুত্ব এবং দ্বীন শিখার অপরিহার্যতা বুঝিয়ে এর জন্য তাবলীগে বের হওয়ার দাওয়াত দিবেন এবং তাদেরকে এ কথা বুঝাবেন যে, এভাবে জামাতে বের হয়ে কিছু দিনের মধ্যেই দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম ও আমল শিক্ষা করা সম্ভব। এ দাওয়াতে যদি সামান্য কয়েকজনও প্রস্তুত হয়ে যায়, তবে তাদেরকে কোন মুনাসেব জামাতের সাথে জুড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর একটি চিঠিতে লিখেন, আপনারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আমাদের এ আন্দোলন এবং ইসলামী তাবলীগ কারো মনে দুঃখ দেয়া পছন্দ করে না। অনুরূপভাবে কোন ফিতনা-ফ্যাসাদের বাক্যও শুনতে চায় না। আপনারা কোন কোন এলাকার লোকদের বিদআতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার পরিহার করা উচিত।

(একটি দীর্ঘ চিঠির অংশ বিশেষ)

মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) তাঁর এক দীর্ঘ চিঠিতে কর্মীদের এভাবে হেদায়েত দেন; দাওয়াতের মূলই হল তাশকীলের সময় মেহনত করা। সুতরাং তাশকীলের সময় জোরদার মেহনত না হলে মূল কাজই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লোকদের ওজর শুনে তাদের মন সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান বাতাবে। সাহাবা কেরামের কুরবানীর ঘটনাগুলো তুলে ধরবে।

মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) তাঁর এক দীর্ঘ চিঠিতে কর্মীদের

তাশকীলের পদ্ধতি বাতানোর পর লিখেন, দাওয়াত তো দিতে হবে পূর্ণ চার মাসের; কিন্তু এর প্রতি জোর এতটুকুই দিতে হবে যতটুকু গ্রহণ করার মত তাদের সামর্থ্য আছে। এ দাওয়াতের পর কেউ এক ঘন্টার জন্য প্রস্তুত হলেও তার কদর করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যাতে তার সময়টি অত্যন্ত মূল্যবান হয় এবং তার সামনে এ কাজের গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। (সাওয়ানেহে ইউসুফী)

এটা তো ছিল নিযামুদ্দীনের ওলামা কেরামের কর্মপদ্ধতি, তবে আমার দৃষ্টিতে দ্বীনের কাজের ব্যাপারে সামর্থ্য অনুযায়ী জোর জবরদস্তী হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। لا اكراه فى الدين (দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ী নেই) এটা কাফেরদের বেলায়ই প্রযোজ্য; তাদেরকে বলপূর্বক তরবারীর জোরে মুসলমান বানানো যায় না। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ হল–

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده – الحديث

কোন অবৈধ কাজ হতে দেখলে যদি সামার্থ্য থাকে তাহলে হাতে (অর্থাৎ, বল প্রয়োগের মাধ্যমে) বাধা প্রধান করবে। বলপ্রয়োগের সামর্থ্য না থাকলে মুখে (ধমক দিয়ে) বাধা প্রদান করবে। এতটুকুও সামর্থ্য না থাকলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের সর্ব নিম্ন স্তর।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

مثلى كمثل رجل استوقد نارا – الحديث

আমার দৃষ্টান্ত হল যেমন কোন ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করল এবং অগ্নি যখন বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কীট-পতঙ্গগুলো তাতে এসে পড়ে জ্বলতে লাগল। আর লোকটি সেগুলোকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে কিন্তু সেগুলো বলপূর্বক অগ্নিতে ঢুকে পড়তে থাকে। অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে কোমর ধরে ধরে অগ্নি থেকে সরাচ্ছি। আর তোমরা তাতে ঢুকেই চলছ। (বুখারী)

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতে রয়েছে, আমি তোমাদের বলছি, "আগুন থেকে সরে যাও, আগুন থেকে সরে যাও। আর তোমরা তাতে ঢুকেই চলছ।"

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বে-নামাযী ও বদদ্বীনরা জাহান্নামের দিকে

ধাবিত হচ্ছে। আর তাবলীগী ভাইরা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে টেনে আনছে। এটাও কি জোর জবরদস্তী? হযরত থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন, কেউ বিরক্ত হবে, নিছক এই অজুহাতে তাবলীগ ছেড়ে দেয়ার অনুমতি নেই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

* فنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوم مسرفين ।

আমরা কি তোমাদের থেকে এ নসীহতনামা প্রত্যাহার করে নিব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী। (অর্থাৎ– তোমরা গ্রহণ কর আর না করো আমরা বরাবর নসীহত করেই যাবো)।

অথচ আল্লাহ পাকের উপর আমর বিল মা'রূফ ওয়াজিব নয়। আল্লাহর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং মনে রাখতে হবে আমর বিল মা'রূফ থেকে বিরত থাকার অনুমতি তখনই হবে যদি কারো ক্ষতির আশংকা থাকে; তাও শারীরিক ক্ষতি। কারো কোন সম্ভাব্য লাভ হারিয়ে যাবে নিছক এই অজুহাতে আমর বিল মারূফ ছাড়ার অনুমতি নেই।

আল্লাহকে যারা ভুলে গিয়েছে, শরীয়তকে যারা উপেক্ষা করে বসে আছে তারা বিরক্ত হবে শুধু এই অজুহাতেই আমরা তাবলীগ ছেড়ে দিব? আমাদের তো লক্ষ্য হবে আল্লাহর দিকে। তাঁর সন্তুষ্টিই হবে আমাদের একমাত্র কাম্য। এতে চাই সারা জাহান আমাদের প্রতি নারাজ হয়ে যাক। (আনফাসে ঈসা)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আমাদের নসীহতের কারণে কেউ বিরক্ত হল কিংবা কারো কষ্ট হল তবুও কি আমরা আমর বিল মা'রূফ করব? এর জবাব হল, আগে আমর বিল মারূফ আরম্ভ কর তারপর যদি কোথাও সমস্যা দেখা দেয়; তখন মাসআলা জিজ্ঞাসা কর। কাজ শুরু না করেই সমস্যা দাঁড়া করানো এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অধিকার তোমার নেই। বরং এর অর্থ হবে কাজ থেকে গা বাঁচানোর ফন্দী তালাশ করা।

হুসনুল আযীযে এক বেদুঈনের দীর্ঘ একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, সে হযরতের খেদমতে বয়াত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে। হযরত তার অবস্থার প্রেক্ষিতে তাকে পনেরো দিন হযরতের কাছে অবস্থান করার নির্দেশ দিলেন। লোকটি তার ক্ষেত খামারের অজুহাত দেখিয়ে থাকতে অসম্মতি

জানালো। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোন ভাই আছে কি? সে বললো, জিহ্যাঁ; আছে। আমি এখানে বিলম্ব করলে তারা অসন্তুষ্ট হবে। হযরত ইরশাদ করলেন, এখন তো আর অসন্তুষ্ট হচ্ছে না; যখন যাবে তখন এক সাথে অসন্তুষ্ট হয় হোক। তোমাকে এখানে পনেরো দিন থাকতেই হবে। মনের মধ্যে ঘুপটি মেরে বসে থাকা এত দিনের শয়তানকে বের করতে হবে। নিয়ম মত তো এ কয় দিনও যথেষ্ট নয়। বরং যত দিন শয়তান পূর্ণরূপে বের না হয় এখানেই থাকা উচিত।

যাহোক, এ ক'দিন তো অবশ্যই থাকতে হবে। লোকটি মাগরিবের পর পুনরায় বাইআতের অনুরোধ করে এবং পীড়াপীড়ি শুরু করে। হযরত বললেন, আমি তো একবারই বলেছি। এখন বাইআতের প্রয়োজন নেই। এতে লোকটি কথার মাঝখানে বলে বসল, হযরত আমার হালত তো এমন হয়ে গিয়েছে যে, নামাযই ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে। এ কথায় হযরত অত্যন্ত গোস্যা হয়ে তাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শাসালেন এবং বললেন, বেশ পাগলামী ঢুকেছে তো। এমন পাগলামী ঢুকলে তো অনেক সময় 'গু'ও খেতে ইচ্ছা করবে।

তাবলীগের মুরুব্বীরা যদি এ কথা বলেন যে, ঘরে দু' জন থাকলে পালাক্রমে একজন জামাতে যাবে অন্য জন ঘরের কাজকর্ম দেখবে তাহলে অপরাধটি হলো কোথায়?

এ কিতাবের শেষের দিকে হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর খলীফা মাওলানা আব্দুস্ সালাম সাহেবের একটি ঘটনা আসছে যে, হযরত হাকীমুল উম্মত তাঁর পিতার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেননি। অথচ তাবলীগের মুরুব্বীরা পিতা অসন্তুষ্ট হলে তাকে সন্তুষ্ট করার জোর তাগিদ দেন। আর আমি তো পিতার অনুমতি ছাড়া জামাতে যেতেই অনুমতি দেই না। অথচ আমার দৃষ্টিতে এসলাহে নফসের চেয়ে তাবলীগের গুরুত্ব কম নয়। সুতরাং তাবলীগের উপর অভিযোগকারীদের আগে হযরত হাকীমুল উম্মতের উপর অভিযোগ করা উচিত। কেননা, তিনি তো পিতার অসন্তুষ্টিরও কোন তোয়াক্কা করেননি।

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত হাকীমুল উম্মতের খেদমতে চিঠি লিখলো, হযরতের দরবারে দু' মাস থাকার খুবই আগ্রহ। কিন্তু সংসারে আমার স্ত্রী ও দু'

সন্তান রয়েছে। এদের ফেলে আসা সম্ভব হচ্ছে না। জবাবে হযরত লিখলেন, স্ত্রীকে তাঁর পিত্রালয়ে তাদের সম্মতিক্রমে রেখে আসো। তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। (তারবিয়াতুস্ সালেক)

এই ঘটনাকে সামনে রেখে বলুন তো; তাবলীগের মুরুব্বীরাও যদি স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে জামাতে বের হওয়ার কথা বলেন, তবে তাদের উপর কেন অভিযোগের ঝড় নেমে আসে যে, এরা বান্দার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

তারবিয়াতুস্ সালেকে রয়েছে, একবার এক ব্যক্তি হযরত হাকীমুল উম্মতের খেদমতে তার নিজের অবস্থা জানিয়ে লিখলো, আমি দেড় হাজার টাকার ঋণী। চামড়ার ব্যবসাই আমার উপার্জনের উৎস। হুজুরের কাছে আরয, আমাকে আট দিনের জন্য হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার অবশ্যই অনুমতি দিয়ে দিন। হতে পারে এ অল্প সময়েই আমার হালতের পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি আমার ঋণের সমস্যাটি অন্তরায় হয় তবে আরজ করবো, ধরে নিন এ মুহূর্তে যদি হঠাৎ আমাকে শারীরিক কোন অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য হাকীম আজমল সাহেবের কাছে যেতে হয় তখন তো আর এসব বাধা অন্তরায় হবে না। তখন তো আমি এ কথাই বলবো যে, শরীর ঠিক না হলে করজ আদায় করব কি করে? তাই শরীরের হিফাযত আগে করা উচিত। ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরতের খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি চাচ্ছি। কেননা আমার দৃষ্টিতে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষা রূহানী সুস্থতার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা অধিক।

মোটকথা, যদি হযরত মুনাসেব মনে করেন তাহলে খেদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি দিন।

এ দীর্ঘ চিঠির জবাবে হযরত সংক্ষেপে লিখেন, আপনার সার্বিক অবস্থার ভিত্তিতে আসতে কোন নিষেধ নেই।

তাবলীগ জামাতের লোকেরাও যদি কোন ঋণী ব্যক্তিকে রূহানী একান্ত কোন প্রয়োজনে জামাতে বের হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে অপরাধটা কোথায়? মানুষ বিবাহ শাদীতে নিছক সুনাম অর্জন ইত্যাদি অনর্থ উদ্দেশ্যে সুদ ভিত্তিক ঋণ নিতেও দ্বিধা করে না। কারো সমালোচনার পাত্রও হয় না। ওলামা কেরামের শত বাধাও তাদের ফিরাতে পারে না। কিন্তু দ্বীনী কোন প্রয়োজনে ঋণ

নেয়ার প্রয়োজন হলে শুরু হয়ে যায় সব সমালোচনা আর প্রশ্ন।

যারা নিজের ঋণের ওজর পেশ করে (যদিও আমি নিজেও কোন ঋণী ব্যক্তিকে কিংবা কাউকে ঋণ নিয়ে জামাতে যাওয়ার অনুমতি দেই না; যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র জানা যায়) তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে, এ ঋণ কেন হলো? জামাতে যাওয়ার কারণে, না কোন নাজায়েয রুসুম রেওয়াজ আদায় করতে গিয়ে? আমার শত শত চিঠি মিলবে যাতে আমি এ ধরনের ঋণী ব্যক্তিকে জামাতে যেতে নিষেধ করেছি। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করি এ ঋণ কি জামাতে যাওয়ার কারণে হয়েছে, না মানুষের ভর্ৎসনা থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ শাদীর বিভিন্ন রুসুম রেওয়াজ আদায় করতে গিয়ে হয়েছে? আর ঋণ নেয়ার সময় কার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন? আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক জবাব পাইনি।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি তার এক দীর্ঘ চিঠিতে নিজের দ্বীন-দুনিয়ার বিভিন্ন পেরেশানীর কথা লিখার পর লিখলো যে, বহু দিন ধরে হযরতের কাছে আসার ইচ্ছা করি কিন্তু হয়েই উঠে না। এবার তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার এক আপন জন আমার বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করে বসেছে। ফলে এবারও আসা সম্ভব হল না।

জবাবে হযরত লিখেন, দু'আ করি আপনার যাবতীয় পেরেশানী দূর হয়ে যাক। আর এখানে আসাই আপনার জন্য ভাল ছিল। যদি আসার কোন সুযোগ না হয়; তার তদবীর হল, নিজের সব বিষয় আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে তাঁর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। এটাই উত্তম পন্থা। আমল করে দেখুন।

অধুনা মানুষের কাছে এ ধরনের কথা মনঃপূত হয় না। তাদেরকে বলব, মলমূত্রের পোকার জন্য মলমূত্রই উত্তম খাদ্য। মিষ্টি আর রসগোল্লা তাদের কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তাই বলে মিষ্টি আর রসগোল্লার মূল্য কি কমে যাবে? (হুসনুল আযীয)

হযরত থানুভী (রহঃ) যা বললেন তাবলীগের লোকেরাও তো তাই বলে থাকে যে, নিজের সব বিষয় আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে বেরিয়ে পড়। অথচ তাদের উপর অভিযোগ করা হয় যে, এরা জোর-জবরদস্তী করে; কারো সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করে না। কারো সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর

নেয়া তো দূরের কথা; কেউ অসুবিধার কথা বললেও এই বলে উড়িয়ে দেয় যে, আল্লাহর উপর সপর্দ করে দাও।

এখানে যদি আমি এ কথা বলি যে, এটাও হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর একটি নির্দেশের উপর আমল হচ্ছে যে, "শিক্ষা হবে হযরত থানুভীর আর কর্মধারা হবে আমার" তবে কি অস্বীকার করার কোন উপায় আছে?

এসব ছাড়াও আমার আর একটি অত্যন্ত দুঃখকর অভিজ্ঞতা এই যে, অনেকে ব্যক্তিগত বিভিন্ন পেরেশানীতে পড়ে অনন্যপায় হয়ে নিজামুদ্দীন চলে যায়। সেখানে গিয়ে নিজে থেকে নাম লিখিয়ে দেয়। অতঃপর বাড়ীর সকলে এবং অন্যান্য পাওনাদাররা কৈফিয়ত তলব করলে তখন জান বাঁচানোর জন্য তাবলীগকে ঢাল স্বরূপ পেশ করে দেয় যে, আমাকে জোরপূর্বক জামাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। নিছক শুনা কথা নয়; বরং কোন প্রকার অত্যুক্তি ছাড়া বলছি, আমার কাছে অন্যূন পঞ্চাশটি চিঠি এ ধরনের পৌছেছে, যার প্রত্যেকটির জবাবেই লিখে এসেছি যে, এ পরস্থিতিতে তোমার জন্য জামাতে বের হওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

এ কিতাব লিখার পর ছাপানোর পূর্বেই কীরানাহ থেকে এই ধরনের আর একটি চিঠি এসেছে যা নিম্নরূপ;

পরম শ্রদ্ধেয় হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেব মুদ্দে যিল্লুহু

আস্‌সালামু আলাইকুম

সালাম বাদ আরয এই যে, আমার ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং বেশ ঋণী হয়ে পড়েছি, যার কারণে অস্থির হয়ে দোকান পাট ছেড়ে দিয়েছি। এমনকি পাওনাদারদের জালাতনে বাড়ী-ঘরও ছাড়তে হয়েছে। তারপর অনন্যপায় হয়ে নিযামুদ্দীন এসে পড়েছি। ছেলে-মেয়েদের বাড়ীতেই রেখে এসেছি। তাদেরকে মাত্র পাঁচটি টাকা দিয়ে এসেছি। আমার কাছেও মাত্র সাত টাকা ছিল তাও দিল্লীতে পথ-ভাড়া দিতে গিয়েই শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তাবলীগে যাওয়ার জন্য কোন পয়সা নেই। এখন হযরত যে সিদ্ধান্ত দিবেন তাই ইনশাআল্লাহ মানব। এখন কি বাড়ী চলে যাবো, না জামাতে বের হয়ে

যাবো। আল্লাহর দরবারে দু'আর দরখাস্ত, যেন আল্লাহ এ ঋণের বোঝা থেকে উদ্ধার করেন। ওয়াস্‌সালাম।

জবাব (জাকারিয়ার পক্ষ হতে)

বাদ তাসলীম, আপনার লিখা এ বিস্তারিত বিবরণের প্রেক্ষিতে আমার মত হল আপনার জন্য জামাতে বের হওয়া মোটেই সমীচীন নয়; বরং পরিবার পরিজনের জীবিকার খোঁজ-খবর নেয়া এবং ঋণ পরিশোধ করা একান্ত অপরিহার্য। যদি কীরানাতে অবস্থান করা অসম্ভব হয় তাহলে আশেপাশের কোন এলাকায় গিয়ে মুজুরী কিংবা চাকুরী-বাকুরীর ফিকির করুন। আর নিজে অভুক্ত থেকে প্রথমে পরিবার পরিজনের জীবিকার তারপর ঋণ পরিশোধের ফিকির করুন। ওয়াস্‌সালাম। ১১ রবিউল আউয়াল ৯২ হিঃ

পূর্বেও বলা হয়েছিল যে, এ ধরনের চিঠি আমার কাছে অন্যূন পঞ্চাশটি এসেছে। তখন তেমন গুরুত্ব দেইনি বলে জবাব লিখানোর পর ছিড়ে ফেলেছি। এই চিঠিটি যেহেতু এই মুহূর্তে পেলাম তাই এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

সন্ধান নিলে দেখা যাবে যাদেরকে তাবলীগের সাথীরা পীড়াপীড়ি করেছে তাদেরকে আমার পক্ষ্য থেকে নিষেধও করা হয়েছে।

দু' বছর পূর্বে কীরানাহ থেকে এ ধরনের বিভিন্ন চিঠি এসেছে। কিন্তু মনে হয়, তারা সাথীদের পীড়াপীড়ির কথাই শুধু লিখেছেন; আমার নিষেধের কথা উল্লেখ করেননি। এখনও হয়ত খুঁজলে তাদের কাছে আমার চিঠিগুলো পাওয়া যাবে।

দু'টি বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ভিন্ন মত রয়েছে। এক হল; যাদের দায়িত্বে কোন বান্দার হক রয়েছে তাদের উপর বান্দার হকই আগে আদায় করতে হবে। দ্বিতীয়, যারা কোন হককানী পীরের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের শায়েখ যদি তাদের নিষেধ করেন তাহলে শায়েখের অনুমতি ছাড়া তাদের জন্য অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। এ বিষয়টি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে।

সামালোচনা– ১২

আর একটি প্রশ্ন এই মধ্যে তেমন একটা শুনা যায় না, তবে আগে বেশ শুনা যেত। আরো আশ্চর্যের বিষয়, অনেক আলেমের মুখেও এ ধরনের প্রশ্ন শুনা গিয়েছে যে, তাবলীগ জামাতের এ চিল্লা কোত্থেকে এল? অথচ চিল্লার বিষয়টি কুরআন হাদীছের প্রচুর জায়গায় স্থান পেয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

و واعدنا موسى ثلثين ليلة و اتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة *

আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির। আর সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন,

و فيه اصل للاربعين المعتاد عن المشائخ الذين يشاهدون البركات فيها

সুফিয়া কেরামদের মাঝে প্রচলিত চিল্লা এখান থেকেই এসেছে। যাতে তারা অসংখ্য বরকত প্রত্যক্ষ করেছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহঃ) তরজমা কুরআনের টীকায় লিখেন, বনী ইসরাইল যখন বিভিন্ন পেরেশানী থেকে শান্ত হল তখন তারা মুসা (আঃ)-এর কাছে আসমানী শরীয়তের দাবী করল এবং এই অঙ্গীকারও করল যে, আমরা এর উপর অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমল করব।

মুসা (আঃ) তাদের আরজি আল্লাহর দরবারে পেশ করলেন। আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-কে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অন্ততঃ ৩০ দিন আর উর্ধ্বে ৪০ দিন একাধারে রোযা রেখে তূর পর্বতে এতেকাফ করুন, তবে আপনাকে তাওরাত দান করব।

চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ পাক মুসা (আঃ)-কে তাঁর সাথে কথা বলার মত অসাধারণ সৌভাগ্য দান করেন।

মিশকাত শরীফে বুখারী ও মুসলিম থেকে উদ্ধৃত হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীছে রয়েছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে সাদেক মসদুক

অর্থাৎ নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ তার সৃষ্টির শুরুলগ্নে প্রথমতঃ চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্য রূপেই অবস্থান করে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্তপিণ্ড থাকে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত গোশতের টুকরা থাকে।

এ হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মানুষের জীবনে পরিবর্তন সাধনের জন্য চল্লিশ দিনের বেশ গুরুত্ব রয়েছে।

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে নামায পড়বে সে দু'টি সনদ লাভ করবে। একটি সনদ জাহান্নাম থেকে মুক্তির, অপরটি মুনাফেকী হতে মুক্ত থাকার।

অন্য হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন কোন মসজিদে এভাবে নামায পড়ে যে, প্রথম রাকাত না ছুটে তাঁর জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়। (ফাযায়েলে নামায)

আর এক হাদীছে রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ নামায এভাবে পড়বে যে একটি নামাযও তার মসজিদে ছুটবে না, তবে তার জন্য অগ্নি থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয় এবং আযাব থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। আর সে ব্যক্তি নিফাক থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (ফাযায়েলে হজ্জ)

অন্য এক হাদীছে রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার উম্মত থেকে চল্লিশ দিন যাবত শস্য আটকে রাখার পর তা সদকা করে দেয় তবে তার সদকা কবুল হবে না। (জামেউস্ সাগীর)

অন্য এক হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত ইখলাস (এর সাথে আমল) করে আল্লাহ পাক তার অন্তর থেকে হিকমতের 'ঝরণা' উথলে তার মুখ থেকে নিসৃত করেন। (জামেউস্ সাগীর)

এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীছে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ হাদীছ সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন সুসংবাদ দান করেছেন, যা আমার রচিত ফাযায়েলে কুরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীছ দ্বারাও চল্লিশ সংখ্যার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

অন্য এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে চল্লিশ কদম পর্যন্ত হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অন্য রিওয়ায়েত মতে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (জামেউস্ সাগীর)

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছেলের ইন্তেকাল হওয়ার পর তিনি তার (আযাদকৃত গোলাম) কুরায়েবকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখত বাইরে কতজন মানুষ হবে? গোলাম এসে আরজ করল, প্রচুর মানুষ। ইরশাদ করলেন, চল্লিশ জন হবে তো? গোলাম বললো, জি; হবে। তখন হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, তাহলে জানাযা নিয়ে চল। আমি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে মুসলমানের মৃত্যুর পর এমন চল্লিশ জন ব্যক্তি তার জানাযা নামায পড়ে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি তবে এ মৃতব্যক্তির পক্ষে তাদের এ সুপারিশ কবুল করা হবে।

সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝে তো বিভিন্ন বিষয়ে 'চিল্লা' পালন সুপ্রসিদ্ধ। যেমন, এতেকাফের চিল্লা। আল্লাহর বিভিন্ন নামের চিল্লা, যা তারা মুরীদদের অবস্থা সাপেক্ষে নির্ধারিত করে থাকেন।

হযরত থানুভী (রহঃ) 'হাওয়াখারী' এলাকা থেকে ফিরে আসার পর নীরবতার নতুন এক চিল্লা নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, অনেকে হয়ত আপত্তি তুলবে, এ আবার কেমন কঠিন ও অসাধ্য চিল্লা আবিষ্কার করলো। যাহোক, মানুষ যা ইচ্ছা বলুক, মানুষের কথা আর কতো শুনে পারা যায়। এতে আল-হামদুলিল্লাহ পূর্বসূরীদের সুন্নত জীবিত হবে।

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, তবে কি পূর্বসূরীদের মাঝে এ ধরনের চিল্লার প্রচলন ছিল? ইরশাদ করলেন, ঠিক এ ধরনের অবশ্য ছিল না; তবে তারা কথা কম বলার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিতেন। সুতরাং এটা নিছক পদ্ধতিগত ব্যাপার হল। তখন এক পদ্ধতি ছিল এখন ভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারিত করা হয়েছে। (হুসনুল আযীয)

মুফতী মাহমুদ সাহেব লিখেছিলেন, এ ধরনের চিল্লার নির্দেশ প্রাপ্ত এক ব্যক্তি গলায় তাবিজের ন্যায় বড় অক্ষরে 'খামুশ' লিখে ঝুলিয়ে রেখেছিলো।

একবার জনৈক ব্যক্তি তার বাতেনী দুরাবস্থার কথা লিখলে জবাবে হযরত ইরশাদ করলেন, আল্লাহ সব রোগেরই চিকিৎসা রেখেছেন। প্রয়োজন শুধু সাহস করে ব্যবহার করার। সুতরাং এর চিকিৎসার জন্য আজকের দিন এবং ফিরার দিন বাদ দিয়ে পূর্ণ চল্লিশ দিন অবস্থান করতে হবে। (তরবিয়াতুস্ সালিক)

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেন, শায়খের সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য অন্তত চল্লিশ দিন সোহবতে থাকা আবশ্যক। তবে এটা নিছক বিধানগত ব্যাপার; অন্যথায় এর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। (ইফাযাত)

সমালোচনা- ১৩

আর একটি বহু পুরাতন প্রশ্ন যা প্রথমতঃ নিজেদের লোকদের মাঝে বেশ শোনা যেত আর বিপক্ষের লোকেরাও পত্র পত্রিকায় বেশ ইন্ধন যুগিয়েছে। অতঃপর মাওলানা হেফজুর রহমান ছাহেব (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মাদানী (রহঃ) ছাহেবের জোরদার প্রতিবাদের বদৌলতে নিজেদের লোকেরা অবশ্য প্রকাশ্যে আলোচনা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু নিভৃতে আকার ইংগিতে এখনো অনেককে এ ধরনের কথা বলতে শুনা যায়। আর বিপক্ষের লোকেরা তো এখনো পত্র পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে লিখে থাকে।

সমালোচনাটি হল যে, এ তাবলীগ জামাত গোড়ার দিকে ইংরেজদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পেত। এ অপবাদ মুকালামাতুস্ সাদরাইনে মাওলানা হিফযুর রহমানের নাম দিয়ে ছড়ানো হয়েছে যে, তিনি নাকি বলেছেনঃ হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ)-এর এ তাবলীগী আন্দোলনও গোড়ার দিকে সরকারের পক্ষ থেকে হাজী রশীদ আহমদ ছাহেবের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা পেত। পরে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। (মুকালামাহ)

এদিকে মাওলানা হেফজুর রহমান সাহেব ছিলেন দলীয় বিশিষ্ট কর্মকর্তা এবং জমীয়তে ওলামার সাধারণ পরিচালক। সেই সাথে তবলীগেরও বিশিষ্ট শুভাকাঙ্খী। সুতরাং তার সাক্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার মত ছিল না। তাই এ কথা বেশ ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কিছু দিন পর যখন শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) এর জোরদার প্রতিবাদ করেন এবং এ মর্মে 'কাশফে হাকীকত' নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেন এবং এতে স্বয়ং মাওলানা হেফজুর রহমান ছাহেবেরও এ

কথার প্রতিবাদ উদ্ধৃত করেন। তখন পরিবেশ কিছুটা শান্ত হয়।

মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব বলেন-

এ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে এমন একটি মিথ্যা ও উদ্ভট অপবাদের প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করছি যার মাধ্যমে লেখক কতক মুখলিস বান্দাদের পরস্পরে বিরোধ ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করার ব্যর্থ প্রয়াস পেয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য; মুকালামাতুস্ সাদরাইনের নিম্নোক্ত বক্তব্য (অতঃপর মাওলানা মুকালামাতুস্ সাদরাঈনের বক্তব্যটি উল্লেখ করনে)- و كفى بالله شهيدا আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষ্যদাতা।

"এ বক্তব্যের এক একটি অক্ষর মিথ্যা ও ভিত্তিহীন" আমি এ ধরনের কথা কখনো বলিনি। আর না মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর আন্দোলন সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি আমি করেছি।

سبحانك هذا بهتان عظيم

বরং এতে লিখক, তাঁর স্বভাব অসাধুতার পরিচয় দিয়ে আমার পক্ষ থেকে এ মিথ্যা রচনা করে। এর দ্বারা এমন কতক মুখলেছ বান্দাকেও জমিয়তে ওলামা হীন্দের প্রতি বিতৃষ্ণ করার অপচেষ্টা করেছেন; যারা একই সাথে মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর এ আন্দোলনকে গভীরভাবে ভালবাসেন এবং জমিয়তে ওলামা হীন্দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিও অকপট শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সুতরাং এখন পাঠকবর্গের কাছেই এর বিচার-ভার রইল যে, তারা শরীয়ত ও নৈতিকতাবর্জিত এই উদ্ভট গুজব বিশ্বাস করবেন, না এর প্রতিবাদে আমার বক্তব্যকে বিশ্বাস করবেন। তবে লিখকের এ অনধিকার চর্চা সম্পর্কে আমার এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলার নেই-

و الى المشتكى و الله بصير بالعباد

সব অভিযোগ অনুযোগ একমাত্র আল্লাহর কাছেই ন্যস্ত। আর তিনি তাঁর বান্দাদের সবকিছু দেখেন।

এরপর হযরত শায়খুল ইসলাম লিখেন যে, মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেবের এ উক্তির প্রতিবাদে হযরত আল্লামা উছমানী ছাহেবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি অন্যান্য সদস্যবর্গের প্রতি মাওলানা

হেফযুর রহমান সাহেবের এ বর্ণনা এবং এ বিষয়ে অস্বীকৃতির সত্যায়ন তলব করেন। তবে অন্যান্য সমালোচনাগুলোর কোন জবাব দেননি।

হযরত মাদানী (রহঃ) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর লিখেন যে, হযরত মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেব كفى بالله شهيدا و سبحانك هذا بهتان এবং عظيم এ ধরনের কঠোর বাক্যে এর জোরদার প্রতিবাদ করেছেন।

অতঃপর কাশফে হাকীকত পুস্তিকায় অন্যান্য বক্তব্যের প্রতিবাদের পর মাওলানা উছমানীকে লক্ষ্য করে লিখেন যে, আপনার তো নিশ্চয়ই অজানা নেই যে, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস এবং জমীয়তে ওলামার আন্দোলন শুরু হলো তখন সরকারের তত্ত্বাবধানে 'তরগীবে সালাত' নামে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। দিল্লীতেও এ সংস্থার বেশ তৎপরতা ছিল। এমনকি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) সরল মনে এটাকে ধর্মীয় আন্দোলন মনে করে তার ভক্তবৃন্দকে এতে অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়ে দেন। এ আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু দিন না যেতেই একদিন সন্ধ্যাবেলা 'শাহরী লীগ' নামে শহরে একটি মিছিল বের হয়। এ লীগ প্রকাশ্যভাবে আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এ মিছিলে আঞ্জুমানে তরগীবে সালাতের কর্মীদেরকেই প্রথম কাতারে দেখা গেল। এ কাণ্ড দেখে মুসলিম সম্প্রদায় শুধু বিস্মিত হননি; বরং অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন।

কয়েক দিন পর মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এ ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং নিজামুদ্দীনে এসে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজেকে এবং নিজের জামাতকে এ দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর দাওয়াতী এ আন্দোলন তো সে ঘটনার অনেক পরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। সুতরাং সে কথার অবতারণা করা মিথ্যুক সাজার বোকামী বৈ কি? কিন্তু মুকালামাতুস্ সাদরাঈনের রচয়িতা অসৎ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে উপরোক্ত বিষয়ের পরিবর্তে এ মিথ্যা রচনা করে প্রকাশ করেছেন, যার ফলে মাওলানা হেফযুর রহমান সাহেবকে এর জোরদার প্রতিবাদ করতে হয়েছে।

فلا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

এ সমালোচনা অনেক পুরাতন হয়ে গিয়েছে এবং নিজেদের মাঝে এর অস্তিত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এর পরেও তাবলীগ বিরোধীদের অনেকে মুকালামাতুস্ সাদরাঈনের বরাতে মাওলানা হেফযুর রহমানের নামে এ মিথ্যা উক্তি বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করে থাকেন। যার কারণে আমাকে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হলো; বরং আমার এ পুস্তিকাটিও এ জন্যই রচনা করতে হয়েছে যে, আমার কোন আলোচনা ও রচনা থেকে কেউ যেন ভ্রান্তির সৃষ্টি না করতে পারে।

সমালোচনা– ১৪

আরেকটি নতুন অভিযোগ যা ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায়নি। এক বন্ধু বললেন যে, কোন এক ভদ্রলোক তাঁর পুস্তিকায় লিখেছেন, "তবলীগী জামাতের লোকেরা হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কিতাব পড়তে বাধা প্রদান করে।" ভদ্রলোক আরো লিখেন, "আরও দুঃখকর বিষয় যে, জনৈক আলেম যদিও তিনি অস্থিরচিত্ততায় বেশ প্রসিদ্ধ তবুও তাকে উল্লেখযোগ্য আলিম ও লেখক হিসেবে গণ্য করা হয়। আর তিনি নিজে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের সুবিশাল সমাজে বিশেষতঃ ফতোয়া বিভাগে অদ্বিতীয় হওয়ার দাবীদার। তিনি জেদ্দায় অবস্থানরত। এক ব্যক্তিকে এক চিঠিতে লিখেনঃ মাওলানা থানুভী (রহঃ)-এর কিতাবসমূহ যেন না পড়া হয়।" এই ছিল হুবহু লেখকের বক্তব্য।

অভিযোগটি অন্যান্য অভিযোগের ন্যায় অস্পষ্টভাবে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অথচ জামাতের সদস্য সংখ্যা হাজার নয়, লাখ নয়, কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমার জানামতে দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে তাবলীগ জামাতের সাথী নেই। সুতরাং কে বলেছে বা কাকে বলেছে, সুনির্দিষ্টভাবে না জানা পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

উপরন্তু তবলীগের পাঠ্যসূচীতে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বেহেশতী জেওর প্রত্যেকেই পড়ে থাকেন এবং পড়ার তাকীদ করা হয়। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর সুপ্রসিদ্ধ ইরশাদ একাধিক জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে যে, "শিক্ষা হবে হযরত থানুভীর আর পদ্ধতি হবে আমার"। অনুরূপভাবে তবলীগী নেছাবে বিশেষভাবে হযরত থানুভী রচিত জাযাউল আমালের বেশ তাকীদ রয়েছে।

হযরত (রহঃ) তার বিভিন্ন চিঠিতে বার বার এর তাকীদ করেছেন। এক চিঠিতে লিখেন, আমার ইচ্ছা হয় তাবলীগ জামাত থেকে একটি নেছাব নির্ধারিত করা হোক। এ ক্ষেত্রে এক সময় হয়ত আপনাদের মত আহলে ইলমের পরামর্শের প্রয়োজন হবে। তবে এই মুহূর্তে আমি মোটামুটি পাঁচটি কিতাব নির্ধারিত করে রেখেছি। তার মধ্যে সর্বপ্রথম জাযাউল আমালের উল্লেখ করেছেন।

অন্য এক চিঠিতে লিখেনঃ আমার একান্ত কামনা এ তাবলীগী মেহনতের সাথে যারা জড়িত তাদের সাথে তাবলীগের সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত কিতাবগুলো থাকুক। সেগুলো হল যা এ পর্যন্ত মনোনিত করা হয়েছে; জাযাউল আমাল, চল্লিশ হাদীছ ইত্যাদি।

অন্যত্র লিখেনঃ তবলীগী এলাকাগুলোতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলোর খুব প্রচলন হওয়া একান্ত আবশ্যক (জাযাউল আমাল ইত্যাদি)।

আরেক জায়গায় লিখেনঃ আমাদের এই জামাতের এমন একটি নিসাবনামা তৈরী হওয়া একান্ত আবশ্যক যা প্রতিটি মানুষের রগ ও রেষায় মিশে যাবে। যার পদ্ধতি হবে যারা লেখাপড়া জানেন তারা প্রথমে নিজে পড়বেন তারপর অন্যদের পড়ে শোনাবেন এবং এর মধ্যে যেসব আমলগুলো রয়েছে, তার উপর প্রথমে নিজে আমল করার চেষ্টা করবেন, তারপর অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবেন। এই মুহূর্তে পাঁচটি কিতাবের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে– রাহে নাজাত, জাযাউল আমাল ইত্যাদি।

এক চিঠিতে মেওয়াতের মুরব্বীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত দান প্রসঙ্গে নবম প্যারায় লিখেনঃ হযরত থানুভী (রহঃ) থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য আবশ্যক তাঁর প্রতি মহব্বত জন্মানো এবং তাঁর মুতাআল্লিকীনদের ভালবাসা। তাঁর কিতাবগুলো পাঠ করা। তাঁর কিতাবগুলোর মাধ্যমে ইলম হাসিল হবে আর তাঁর মুতাআল্লিকীনদের থেকে হাসিল হবে আমল।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর ইন্তিকালের পর হযরত দেহলুভী (রহঃ) তাঁর বন্ধু-বান্ধবের কাছে সমবেদনা প্রকাশ করে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে হযরত (রহঃ)-এর জন্য ঈসালে ছওয়াবের এবং তাঁর শিক্ষাগুলোর প্রচার প্রসারের জন্য চেষ্টা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর মুতাআল্লিকীনদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য এলে হযরত দেহলুভী (রহঃ) ইরশাদ করলেন, আমাদের হযরত থানুভী (রহঃ)-এর মত যার ভক্ত ও অনুরক্ত সংখ্যা এত সুবিস্তৃত তার তা'জিয়াত (সমবেদনা প্রকাশ) ব্যাপক আকারে হওয়া উচিত। আমার ইচ্ছা হয় এই মুহূর্তে হযরত থানুভীর সকল মুতাআল্লিকীনদের তাজিয়াত (সমবেদনা) প্রকাশ করা হোক। বিশেষতঃ এ কথা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া হোক যে, হযরত (রহঃ)-এর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, হযরতের যাবতীয় বরকত থেকে উপকৃত হওয়া, সেই সাথে হযরতের দর্জা বুলন্দের চেষ্টায় অংশগ্রহণ করা। আর হযরতের রূহের আনন্দ বৃদ্ধির জন্য সবচে' উত্তম পন্থা হল, হযরতের রেখে যাওয়া শিক্ষা ও আদর্শের উপর অনঢ় থাকা এবং সেগুলোর অধিক প্রচার প্রসারের চেষ্টা করা। (মল্‌ফুযাতে হযরত দেহলুভী)

আলোচ্য অভিযোগকারীর অভিযোগের দ্বিতীয় অংশটি যাকে তিনি দুঃখকর বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। এ অভিযোগ এই প্রথম কানে আসল। ঘটনাচক্রে এ বিষয়টি যখন শুনছিলাম সেই মুহূর্তে মাওলানা আমার কাছেই ছিলেন। তিনিও বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এ অভিযোগ তো ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। এ সময় নিজামুদ্দীনের মুরব্বীরাও তাশরীফ এনেছিলেন। তাদেরও একই বক্তব্য যে, এ ঘটনা ইতিপূর্বে কখনো আমাদের কানে আসেনি। আমি আশেপাশের মুফতীদের কাছেও জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনারা কেউ এ ধরনের উক্তি করেছেন কিনা? তারা প্রত্যেকেই এ ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তখন আমি অভিযোগকারীর কাছে অস্থিরচিত্ত আলেমের নাম এবং জেদ্দার সেই ভদ্রলোকের ঠিকানা চেয়ে পত্র লিখলাম। পূর্ণ পত্রটি নিম্নরূপঃ

গত পরশুর ডাকে আপনার প্রেরিত একখানা রিসালাহ হস্তগত হয়েছে। শরীর-স্বাস্থ্য যখন ভাল ছিল তখন তো পক্ষও বিপক্ষ সব ধরনের বিষয়াদি পড়ার বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু ইদানিং কয়েক বছর যাবৎ অসুস্থতার তীব্রতা এবং চক্ষুর দুর্বলতার কারণে জরুরী চিঠিপত্র শোনা ও জবাব লিখা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

আমার এক বন্ধুর কাছে শুনতে পেলাম, এ রিসালায় নিজামুদ্দীনের তাবলীগ সম্পর্কে আপনার কিছু উক্তি ব্যক্ত হয়েছে। তাই কয়েক কিস্তিতে সামান্য সামান্য করে শুনে নিলাম। এতে এমন কোন বিষয় ছিল না; ওলামায়ে

কেরামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও চিঠিপত্রে যার জবাব দেয়া হয়নি। অবশ্য এতে একটি বিষয় নতুন ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায়নি এবং নিজামুদ্দীনের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কিংবা তবলীগের সাথীদের মধ্যে কেউ শুনেছেন বলেও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আপনি এ রিসালার দশম পৃষ্ঠায় বিশেষতঃ তাবলীগ জামাত সম্পর্কে উক্তি করেছেন যে, "এরা হযরত থানুভী (রহঃ)-এর রচনাবলী পড়তে বাধা প্রদান করেন।" এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হল কে বা কারা বাধা প্রদান করেছে অনুরূপভাবে সে আলেম ছাহেবের নাম লিখে পাঠালে আমি সরাসরি তাদের কাছে কৈফিয়াত তলব করব। আর জেদ্দায় যার নামে চিঠি লিখা হয়েছিল তারও নাম ঠিকানা দরকার।

একজন ব্যক্তির একটি মাত্র চিঠির ভিত্তিতে গোটা জামাতকে এমন মারাত্মকভাবে অভিযুক্ত করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা বলাইবাহুল্য। যদি সত্যি আপনি মুখলিস হতেন তাহলে আপনার উচিত ছিল এ বিষয়টিকে পুস্তিকায় প্রকাশ করার আগে মারকাযের মুরুব্বীদের সাথে যোগাযোগ করা। অন্ততঃ এ অধমের সাথে যোগাযোগ করলেও তো সে আলিম সাহেবের কাছে কৈফিয়ত তলব করা যেত।

বিশেষতঃ এ জামাতের উদ্যোক্তার প্রসিদ্ধ বাণী যা আপনি নিজেও আপনার রেসালায় বারবার উদ্ধৃত করেছেন এবং বিদআতপন্থীরাও তাদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করে থাকেন যে, "শিক্ষা হবে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর আর কর্মপদ্ধতি হবে আমার"। সুতরাং এমতাবস্থায় কোন একজনের বক্তব্যকে গোটা জামাতের সাথে সম্পৃক্ত করা ধার্মিকতা ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু বিশুদ্ধ তা আপনিই ভাল জানেন।

যদি কোন ব্যক্তি নিজস্ব কোন মুছলেহাতের প্রেক্ষিতে কিংবা হযরত হাকীমুল উম্মতের সাথে সম্পর্কের গৌণতার কারণে এমন কোন উক্তি করে থাকেন, যা স্বয়ং আন্দোলনের উদ্যোক্তার একাধিক বক্তব্যের পরিপন্থী; তা জামাতের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া আমার দৃষ্টিতে হযরত হাকীমুল উম্মতের সাথেও বেয়াদবি করার নামান্তর। কেননা তবলীগী জামাত এখন হিন্দুস্তান, পাকিস্তানেই শুধু নয় হেজাজ, ইরাক, লণ্ডন, আমেরিকা, আফ্রিকা, বার্মাসহ গোটা ভূপৃষ্ঠে

ছড়িয়ে পড়েছে। অপরপক্ষে হযরত থানুভী (রহঃ) কিংবা অন্য কোন আকাবিরদের ভক্তবৃন্দ সারা দুনিয়ায় আছে বলে দাবী করা যাবে না। তাহলে আপনি যারা হযরত থানুভীর ভক্ত নয় তাদের জন্য দলীল পেশ করে দিলেন যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা হযরত থানুভী (রহঃ)-এর রচনাবলী পড়তে বাধা প্রদান করেন।

যাহোক, উল্লেখিত চিঠি যিনি লিখেছেন, যাকে লেখা হয়েছে উভয়ের নাম লিখে জানিয়ে দিন। ওয়াস্‌সালাম।

যাকারিয়া

১৭ই সফর ১৩৯২ হিজরী

ভদ্রলোক এর জবাবে সেই সাধারণ অভিযোগগুলোই পুনরায় লিখে পাঠিয়েছেন যার সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

যাহোক, আমি অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও সেই অস্থিরচিত্ত মুফতী ছাহেবের সন্ধান নিতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তা হলে সরাসরি তার কাছ থেকে বিষয়টি জানা যেত। দীর্ঘদিন পর এমন এক ব্যক্তির নাম জানা গেল যেদিন আমাকে এ রিসালাহ সর্বপ্রথম পড়ে শোনানো হচ্ছিল। আর ঘটনাক্রমে সেই মুহূর্তে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনিও অত্যন্ত বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, থানুভী (রহঃ)-এর কিতাব পড়তে বাধা প্রদান করেন এমন কারো সম্পর্কে আমার জানা নেই।

জেদ্দার সেই ভদ্রলোকের ঠিকানা দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। তা না হলে সরাসরি তার কাছ থেকেও চিঠি লিখে সন্ধান নেয়া যেত।

তাছাড়া এ কথা কারোই অজানা নেই যে, এই জামাতে সব ধরনের লোকই অংশগ্রহণ করে। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, দ্বীন সম্পর্কে যাদের মোটেই ধারণা নেই, নামায সম্পর্কে যারা অজ্ঞ; পীর মাশায়েখদের আদব সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকার কথা নয়। হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর মলফুযাতের বিভিন্ন জায়গায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের এ জামাত ধোপাখানা তুল্য, যাতে পাক নাপাক সব ধরনের কাপড়ই জমা হয় এবং পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে।

এ কথা অস্বীকার করার কার সাধ্য আছে যে, এ জামাতের উসীলায় লক্ষ নয় কোটি কোটি বদদ্বীন দ্বীনদার বনে গেছে এবং হাজার নয় লাখো লাখো কালিমা-নামায সম্পর্কে অজ্ঞ তাহাজ্জুদগুজার বনে গেছে। যারা কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, এমন বহু সংখ্যক লোক এ জামাতের বরকতে মাশায়েখদের সাথে এছলাহী সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে এবং অনেকে হযরত হাকীমুল উম্মত, হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী (রহঃ) ও হযরত রায়পুরী (রহঃ)-এর খেলাফতপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছেন।

এ কথার ধারণা করা মোটেই যুক্তিসংগত নয় যে, কোন ব্যক্তি জামাতে নাম লিখানো মাত্রই জ্ঞান ও গুণের উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়ে যাবে; বরং চরিত্র শুদ্ধির জন্য বছরকে বছর মুজাহাদা করা আবশ্যক।

যারা হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বিরোধিতা করেন লক্ষ্য করতে হবে এরা জামাতে অংশগ্রহণ করার পূর্বেও হযরতের বিরোধী ছিলো কিনা? যদি এমন হয় যে, জামাতে অংশগ্রহণের পূর্বে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বেশ ভক্ত ছিলো; জামাতে অংশগ্রহণের পর তাদের এ ভক্তিতে ভাটা পড়েছে তবে তো অবশ্যই জামাতকে অভিযুক্ত করা সংগত হবে।

অপরপক্ষে যদি এমন হয় যে, আগে থেকেই হযরতের ঘোর বিরোধী ছিলো তবে এ কারণে তাবলীগকে অভিযুক্ত করা চিত্তের অনুদারতা ও তাবলীগ জামাতের সাথে বিরোধিতার পরিচায়ক হবে।

এ কথা অস্বীকার করার কার সাধ্য আছে যে, লীগ ও কংগ্রেসের সেই কঠিন মুহূর্তে উভয় পক্ষের শুধু সাধারণই নয় নিম্নশ্রেণীর ওলামা কেরাম পর্যন্ত একে অপরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং একে অপরকে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করতো। একে অপরের কিতাব পড়া তো দূরের কথা কিতাবের নাম নেয়া পর্যন্ত পছন্দ করতো না। আর উভয় পক্ষের সদস্যরা প্রচুর পরিমাণে তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করত। অতঃপর পূর্ব বিদ্বেষের ভিত্তিতে এদের কারো মুখ থেকে কোন আপত্তিকর উক্তি বের হওয়া অসম্ভব নয়; বরং আমার অভিজ্ঞতা তো এই, আর আশাকরি কেউ অস্বীকার করবেন না যে, তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণের পর পূর্বের সেই অনুদারতা দলাদলি লাঘব পেয়েছে।

আমি পূর্বের কোন এক প্রশ্নের জবাব প্রসঙ্গে লিখে এসেছি যে, শুধু আমার

কাছেই নয়; বরং শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামের অনেকের কাছেই লোকেরা স্বীকার করেছে যে, আমরা তো ইতিপূর্বে ওলামা কেরামের প্রতি এতটুকু বীতশ্রদ্ধ ছিলাম যে, সাক্ষাত করাও পছন্দ করতাম না। এখন এই তবলীগের বরকতে আমরা আপনাদের খাদেম রূপে হয়ে আছি।

যাহোক, বহু চেষ্টা তদবীরের পর সে ভদ্রলোক অস্থিরচিত্ত আলেম ছাহেবের নাম আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। ঘটনাচক্রে তিনি তখন বিদেশের সফরে ছিলেন। আমি তার কাছেও পত্র মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েই এ কথা অস্বীকার করে পর পর দু'টি চিঠি লিখেন; যদিও তা একই দিনে আমার হস্তগত হয়েছে। যাহোক তিনি প্রথম চিঠিতে লিখেন–

এতে ফতোয়ার বিষয়টি না হলে হয়ত আমার নিজের ব্যাপারেই ধরে নিতাম। কিন্তু ফতোয়ার কথা বলাতেই আমার সন্দেহ হয়েছে। কেননা, ফতোয়া লেখার ব্যাপারে আমি সর্বদা গা বাঁচিয়ে চলে থাকি। জানি না কোত্থেকে ভদ্রলোকের আমার ব্যাপারে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আর কেইবা তাকে এ কথা জানিয়েছে।

যাহোক, এ কথার ভিত্তিহীনতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমি যেহেতু হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কিতাবগুলো আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ, বিশেষতঃ ওলামা কেরামের জন্য তা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক মনে করি; সুতরাং এ কথা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথেই বলতে পারি যে, এ ধরনের কথা আমি অন্তত কখনো লিখিনি। বেশীর চেয়ে বেশী এতটুকু হতে পারে যে জামাতে তালীমের ব্যাপারে কেউ পরামর্শ চাইলে তাকে হয়ত ফাযায়েলের কিতাবের পরামর্শ দিয়েছি। আর তবলীগের কাজের জন্য এটাই সমীচীন মনে করি। আর আশা করি কোন মুখলেছ ব্যক্তিই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

এ কথা বাস্তব সত্য যে, ফাযায়েলের কিতাবগুলোর উসীলায় আল্লাহর হাজারো বান্দা ওলীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

জেদ্দায় কারো সাথে আমার পত্র যোগাযোগ নেই। তবে এক ব্যক্তির ব্যাপারে ধারণা হচ্ছে, সম্ভবত তার থেকে এ কথা উঠেছে। সফর থেকে ফিরে এসে তার সাথে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি লিখেন, গতকাল বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে একটি চিঠি লিখেছিলাম যা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল। তা হল, আমার পক্ষ থেকে যে মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে তা মিথ্যা হওয়ার আরেকটি যুক্তি হল, আমি সাধারণতঃ লোকদেরকে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কিতাবাদি পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি। এ পরামর্শ সাধারণ বয়ানেও দিয়ে থাকি। তাবলীগ জামাতের সাথে জড়িত হওয়ার শুরু থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে কখনো আমার ভিন্নমত হয়নি। হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কিতাবাদির সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে।

তবে এ কথা আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, তবলীগী কাজের সার্বিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করলে তালীমের হালকায় হযরতের ফাযায়েলগুলোই পড়া উচিত।

অনেকে আমার কাছে আমার কিতাবগুলোর ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেছিল। জবাবে আমি বলেছি, তাহলে তো এক সময় এ প্রশ্ন উঠবে যে, মাওলানা তৈয়ব সাহেব, মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবর আবাদী কিংবা মাওলানা আলী মিয়ার কিতাবগুলোও পড়া হোক।

অনুরূপভাবে তালীমের হালকায় হযরত থানুভী (রহঃ)-এর কিতাবগুলোও পড়া হলে আরেক জামাত থেকে প্রস্তাব উঠবে, হযরত মাদানী (রহঃ)-এর কিতাবগুলোও পড়া উচিত। নকশবন্দী সিলসিলার লোকেরা চাইবে হযরত ইমাম রব্বানী, খাজা মাসুম কিংবা এ সিলসিলার অন্য কোন আকাবীরের কিতাব পড়া হোক। আর উম্মতের বর্তমান যে পরিস্থিতি সেদিকে তাকালে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তখন এ বিষয়কে কেন্দ্র করে জঘন্য রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তাই ফাযায়েলের কিতাব পড়ার মধ্যেই পূর্ন নিরাপদ ও মঙ্গল নিহিত। আর আলহামদুলিল্লাহ এই কিতাবগুলোর উপকারিতা ও ফলাফলও সকলের সামনে পরিষ্কার।

সমালোচনা- ১৫

হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর উপর আরেকটি অভিযোগ হল যে, তিনি সব ধরনের লোকদের সাথে মেলামেশা করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত দেহলুভী (রহঃ) নিজেই বলেন, আমি দ্বীনের স্বার্থে সব ধরনের এবং সব শ্রেণীর মানুষের সাথে

এবং মুসলমানদের সকল দলের সাথে মেলামেশা করতে ভালবাসি। অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করি। এতে আমার কতক বন্ধু আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমি তাদের অপারগ মনে করে তাদের এ অসন্তুষ্টি বরদাশত করে নেয়া এবং তাদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা অবশ্যকরণীয় মনে করি।

হযরত দেহলুভী (রহঃ) আরো বলেন, মানুষ মনে করে যে, এটি আমাদের হযরত (রহঃ)-এর নীতি ও রুচির পরিপন্থী। কিন্তু আমার বক্তব্য হল যুক্তি ও অভিজ্ঞতার নিরিখে কোন বিষয় দ্বীনের জন্য ফলপ্রসূ প্রমাণিত হওয়ার পর 'শায়খ করেননি' নিছক এ অজুহাতে তা পরিহার করা মারাত্মক ভুল। (মলফুযাতে হযরত দেহলুভী)

তবে মনে রাখতে হবে যে, হযরতের বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, যে কেউ শায়েখের মত উপেক্ষা করা আরম্ভ করবে; বরং এর জন্য নিজেকেও শায়েখের পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে।

হযরত কুতুবুল ইরশাদ গঙ্গুহী (রহঃ) তার শায়খ করেননি এমন বহু কাজ করেছেন। হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)ও কতক বিষয়ে তাঁর শায়খকে ছেড়ে হযরত গঙ্গুহী (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন। সুতরাং এ বিষয়টি অনেক উর্ধ্বের ও সূক্ষ্ম।

হযরত মাওলানা আশেক এলাহী (রহঃ) তাযকেরাতুর রশীদের দ্বিতীয় খণ্ডে রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে হযরত ইমামে রব্বানী (রহঃ)-এর সূক্ষ্মদর্শীতার আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। আমার শুধু এতটুকু বলার ছিল যে, কোন দল কিংবা আকাবিরদের কেউই সাধারণ সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি।

সমালোচনা- ১৬

তাবলীগ জামাতের উপর আরেকটি স্বতন্ত্র অভিযোগ হল, তাঁরা সমালোচকদের সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

আমার দৃষ্টিতে এ সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থ। কেননা কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে না বললে সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ তাবলীগ জামাতের লোকদের নিজেদের প্রচুর কর্মব্যস্ততার কারণে এ ফুরসতও

থাকে না যে, অর্থহীন সমালোচনা শুনে বেড়াবে। আমাদের আকাবিররাও এ ধরনের অর্থহীন সমালোচনা এড়িয়ে চলেছেন। হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর উপর সর্বদা সমালোচনার ঝড় থাকত। হযরত ইরশাদ করেন, মানুষ চাই নেক হোক কিংবা আবিদ, আলিম হোক কিংবা জাহিল কোন অবস্থাতেই সমালোচনা থেকে রেহাই পেতে পারে না। তাই সবচে' নিরাপদ পন্থা হল; সমালোচকদের বকতে দাও আর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়। (তার দীর্ঘ বক্তব্যের অংশবিশেষ– ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর হেকায়াতুস্ শেকায়াত নামে একটি স্বতন্ত্র রিসালাহ এক সময় পড়েছিলাম এবং আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতেও রয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে তা খুঁজে পাওয়া গেল না।

যাহোক, এর ভূমিকাটি কয়েক মাস পূর্বে আল-ইমদাদ থেকে নিয়ে হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর রিসালাহ খান খলীলের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করেছিলাম। তা হল–

"হামদ ও সালাতের পর আরয এই যে, দীর্ঘদিন যাবত আমার উপর সুধীদের পক্ষ থেকে অর্থহীন সমালোচনার ঝড় চলে আসছে। যার অধিকাংশই অনুদারতা ও অনিষ্ট নির্ভর। সুতরাং কয়েকটি অনিবার্য কারণেই এর জবাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি। প্রথমতঃ আমার দৃষ্টিতে এসব সমালোচনা দৃষ্টিপাতের যোগ্যই নয়।

দ্বিতীয়তঃ এসব সমালোচনার জবাব দিয়েও কোন লাভ নেই। এতে কোন সমাধান তো হয়ই না বরং কথা আরো দীর্ঘ হতে থাকে। ফলে অনর্থ সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই হাসিল হয় না।

তৃতীয়তঃ এছাড়াও আমার প্রচুর ব্যস্ততা রয়েছে। সুতরাং এর জন্য সময় বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি এসব সমালোচনার জবাব দানে আমার মাঝে এখলাছ খুঁজে পাইনি। মুখলেছ বান্দাদের কথা বলছি না; তবে আমার মত নফস্ প্রভাবিতদের নিয়ত সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, জবাব না দিলে ভক্তদের সংখ্যা কমে যাবে এবং ব্যক্তিত্বে আঘাত আসবে। একথায়

সাধারণকে সন্তুষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অবশ্য এও সত্য যে, মজ্জাগতভাবেই সাধারণকে সন্তুষ্ট করা আমি পছন্দ করি না।

এ আলোচনা বেশ দীর্ঘ। এতে হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ) এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, অর্থহীন সমালোচনার প্রতি তিনি নিজেও দৃষ্টিপাত করেন না, অন্যদেরকেও বারণ করে থাকেন।

একবার হযরতের কাছে একটি বে-নামী চিঠি আসল। হযরত ইরশাদ করলেন, এর জবাবী লেফাফা যখন নেই জবাবেরও প্রয়োজন নেই। সুতরাং এটি আলাদা রেখে দাও। পড়ারও দরকার নেই। সে তো অর্থহীন একটি কাজ করেছে। আমি কেন তা শুনে অর্থহীন কাজ করবো এবং শুধু শুধু নিজের মন খারাপ করবো। সুতরাং তিনি না শুনেই তা ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন।

অতঃপর ইরশাদ করলেন, একবার আযমগড়ে এক লোক আমাকে একটি চিঠি দিয়ে অমনিই চলে গেল। আমি ওয়াজের পর না পড়ে সেখানেই বাতির মধ্যে জ্বালিয়ে ফেললাম। জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, না পড়ে জ্বালিয়ে ফেলতে কিভাবে আপনার মনে মানল। আমার পক্ষে তো কিছুতেই তা সম্ভব হত না।

আমি (হযরত থানুভী) আরয করলাম, যুক্তির দাবী এটাই ছিল। কেননা, তার জবাবের প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই জবাব না নিয়ে চলে যেত না। সুতরাং আমার পড়ারই বা প্রয়োজন কি? কেননা এতে গালমন্দই বা লিখে রেখেছে কিনা তাও বা কে জানে?

অন্যত্র ইরশাদ করেন, মানুষ না বুঝে শুনেই সমালোচনা করে বসে। আসলে কিছু বলার আগে প্রথমে ভালভাবে বুঝে-শুনে নেয়া উচিত।

আমিও সাধারণ সমালোচকদের প্রথমে জিজ্ঞাসা করে নেই, এ বিষয়টি কি আপনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, না কারো কাছে শুনেছেন? নিজামুদ্দীন কতদিন অবস্থান করেছেন? বাহিরে কি কখনো চিল্লায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, যাতে বাইরের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ দর্শনের এবং সঠিক অভিজ্ঞতার সুযোগ হত।

হযরত হাকীমুল উম্মত অন্যত্র ইরশাদ করেন, কারো কাছে অবস্থান করলেই আপনার সকল সংশয়ের নিরসন ঘটবে। সুতরাং আপনাকে কারো কাছে অবস্থান করা উচিত এবং সব প্রশ্ন একবারে পেশ করে দিয়ে দু' মাস পর্যন্ত মুখ বন্ধ

রাখুন। দেখবেন কোন প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকবে না। আর এটাই হল প্রকৃত পদ্ধতি। তা না করে কারো সাথে সাক্ষাত হলেই তার সামনে সব সংশয় পেশ করে দেয়া উচিত নয়। এতে তার থেকে পৃথক হওয়ার পর পুনরায় সব সংশয় নতুনভাবে জেগে উঠে। অনুরূপভাবে সেসব সংশয়ই গ্রহণযোগ্য যা কাজে নামার পর দেখা দেয়। কাজে নামার পূর্বে কোন সংশয়ের মূল্য নেই।

আমি মীরাঠে মুতামারুল আনসারের এক জলসায় স্পষ্ট বলেছিলাম, যাদের সামনে কোন বিষয়ে সংশয় দেখা দেয় তারা চল্লিশ দিনের জন্য আমার কাছে এসে অবস্থান করুন এবং সবগুলো প্রশ্ন একটি কাগজে লিখে আমার কাছে দিয়ে এ চল্লিশ দিন একেবারেই মুখ বন্ধ রাখুন। ইনশাআল্লাহ সকল সংশয়েরই নিরসন ঘটে যাবে। (দীর্ঘ বক্তব্যের অংশবিশেষ– হুসনুল আযীয)

হযরত আল-হাজ্জ কারী তৈয়ব সাহেব সাহারানপুরের এক তবলীগী ইজতেমায়ে ইরশাদ করেন, সেসব প্রশ্নই শুধু গ্রহণযোগ্য যা কাজে নামার পর করা হয়। বাইরে বসে থেকে যেসব প্রশ্ন করা হয় তা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজে নেমে যদি প্রশ্ন করা হয় তবে ত যুক্তি সংগত। কিন্তু কাজে নেমে কেউ প্রশ্ন করে না। কেননা, কাজে নামার পর এর উপকারিতা পরিষ্কার হয়ে যায়। সুতরাং বুঝা গেল, সব প্রশ্নই বাইরের লোকের যা গ্রহণযোগ্য নয়। ['কেয়া তবলীগী কাম জরুরী হায়' কিতাবে সন্নিবেশিত দীর্ঘ আলোচনার অংশবিশেষ।]

হযরত থানুভী (রহঃ) অন্যত্র ইরশাদ করেন, এ যুগ অত্যন্ত ফিতনার যুগ। যে বেচারা নিজের ধর্ম, বুযুর্গানে দ্বীনের নীতি ও পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করে, সকলেই তাদের পিছে কোমর বেঁধে লেগে যায় এবং তাকে অস্থির করে ছাড়ে। এ অপরাধে আমাকেও অনেকের সমালোচনার পাত্র হতে হয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিনি। কথা বলতে আমিও শিখেছি। মুখ আল্লাহ আমাকেও দিয়েছেন। কলমও আল্লাহ আমাকে দান করছেন। কিন্তু এ পদ্ধতি আমার পছন্দ নয়। (ইফাযাত)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, সমালোচকদের সমালোচনার প্রতি লক্ষ্য করতে গেলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। সুতরাং মানুষের উচিত, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক পরিষ্কার রেখে অন্যদের কথার দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ না করা। (হুসনুল আযীয)

চাচাজানের বক্তব্য এটাই ছিল যে, "শিক্ষা হবে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর

আর কর্ম পদ্ধতি হবে আমার"। সুতরাং হযরত থানুভী (রহঃ)-এর উপরোক্ত শিক্ষা অনুযায়ী যদি নিজামুদ্দীনের মুরুব্বীগণ কারো সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তবে তাদের অপরাধটা কোথায়। তা ছাড়া এসব অনর্থ বিষয়ের দৃষ্টিপাত করার তাদের ফুরসতই বা কোথায়। দৈনিক শত শত মানুষের যাতায়াত হচ্ছে। অনেক সময় নবাগতদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের কাজ করবে, না অস্পষ্ট সমালোচনার জবাব দিয়ে বেড়াবে? অবশ্য অন্যান্য ওলামা কেরাম যেমন, হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা কারী তৈয়ব ছাহেব (রহঃ), মাওলানা মুহাম্মদ মঞ্জুর নু'মানী ছাহেব (রহঃ), দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী মাহমুদুল হাসান (রহঃ) ছাহেব নিজেদের কলম ও কালামে এসব সাধারণ সমালোচনার বহু জবাব দিয়ে এসেছেন, যা বিভিন্ন রিসালায় বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষতঃ "কেয়া তবলীগী কাম জরুরী হায়" কিতাবে এদের বয়ান ও রচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হযরত মাওলানা মঞ্জুর ছাহেবের জবাবগুলো তো আল-ফোরকানে প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে। আর কতক সাধারণ সমালোচনার জবাব আমি অধমও এ পুস্তিকার শুরুতে লিখে এসেছি, যা সাধারণভাবে শোনা যায়।

যাহোক, এ কথা নিশ্চিত যে, নিজামুদ্দীনের ওলামা কেরাম এ সব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনে কোন ত্রুটি করেন না, যা তাদেরই উপলব্ধি হবে যারা কিছু দিন সেখানে অবস্থান করেছেন, কিংবা বিভিন্ন ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেছেন অথবা জমাত রওয়ানা হওয়ার সময় যে হেদায়েত দান করা হয় তা শুনেছেন। যাতে শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, সাথী সঙ্গীদের সাথে সদ্ব্যবহার, কারো জিনিস অনুমতি ছাড়া স্পর্শ না করা, অনুমতি নিয়ে নিলেও কাজ সেরে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদি খুটিনাটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক করা হয়। যার প্রতি সাধারণতঃ ভ্রুক্ষেপও করা হয় না। এ বিদায়ী হেদায়েত কমপক্ষে আধাঘন্টা আর অনেক সময় এক থেকে দু' ঘন্টা দীর্ঘ হয়ে যায়।

একটি ইজতেমার হেদায়েত স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মদ ছানী হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেবের জীবনীর শেষের দিকে সন্নিবেশিত করেছেন। দশ পৃষ্ঠার এ দীর্ঘ আলোচনার সবটুকু এখানে উল্লেখ করা দুষ্করই বটে বিধায়

শেষের দিকের কয়েকটি জরুরী বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

তিনি ইরশাদ করেন, জামাতে বের হয়ে চারটি কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। সবচে' প্রথম বিষয় হল ঈমান ও একীনের এবং ঈমানওয়ালা আমলের দাওয়াত। এই দাওয়াতের উদ্দেশ্যে উমুমী ও খুসুসী গাশত করতে হবে। যার যাবতীয় উসূল ও আদবসমূহ গাশতে বের হওয়ার সময় বলা হবে। তা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। তারপর যখন আপনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে অলিতে-গলিতে বের হবেন শয়তান আপনাকে সেখানকার যাবতীয় চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট করবে। তাই সর্বপ্রথম দু'আ করে নিতে হবে, যাতে আল্লাহ শয়তানের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হেফাযত করেন এবং তাঁর মর্জিমাফিক চলার তৌফিক দান করেন। গাশতের সম্পূর্ণ সময়টুকু পূর্ণ যত্নের সাথে আল্লাহর জালাল জামাল এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে। দৃষ্টি নীচু রাখবে এবং নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রাখবে। যেমন, রুগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় রুগী নিজে এবং তাঁর সাথী সংগীরা হাসপাতালের বিশাল অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে না; বরং রুগীর চিকিৎসাই একমাত্র তাদের লক্ষ্য থাকে।

খুসুসী গাশতের সময় যদি সে মনোযোগ সহকারে কথা শুনতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে কৌশলে তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে সেখান থেকে চলে আসবে। অবশ্য যদি তার মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার সামনে পূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরবে। খুসুসী গাশতে শীর্ষস্থানীয় ওলামা কেরামের কাছে গেলে তাদের কাছে শুধু দু'আর দরখাস্ত করবে। তাদের মনোযোগ পরিলক্ষিত হলে এ কাজের কিছুটা আলোচনা করবে।

দ্বিতীয়তঃ তালীমের সময় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযমত অন্তরে বসিয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে বসবে।

তৃতীয় ও চতুর্থতঃ দাওয়াত ও তালীম ছাড়া অবসর সময়ে অন্য কোন কাজ না থাকলে নফল নামায, তেলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল কিংবা আল্লাহর কোন বান্দার খেদমতে ব্যস্ত থাকবে। জামাতের পূর্ণ সময়টি মূল লক্ষ্য হিসেবে এ চারিটি কাজেই ব্যস্ত থাকবে।

এ ছাড়া চারটি কাজ করতে হবে অপারগতা বশত। আর চারটি কাজ

সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। প্রথম চারটি কাজ হল; খাওয়া দাওয়া, যাবতীয় প্রয়োজনাদি পুরা করা, ঘুমানো ও পরস্পরে কথা বলা। এগুলো মানব জীবনে একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়। সুতরাং এগুলোর জন্য এতটুকুই সময় দিতে হবে যতটুকু একান্ত আবশ্যক; না হলেই নয়। ঘুমানোর জন্য দিবারাত্রি ৬ ঘন্টাই যথেষ্ট। অপরপক্ষে চারটি কাজ সম্পূর্ণ পরিহার করে চলবে।

১। সওয়াল করা, এমনকি কারো সামনে নিজের প্রয়োজন প্রকাশও করবে না। এটাও এক ধরনের সওয়াল।

২। 'ইশরাফ' তথা মনের সওয়াল অর্থাৎ মুখে কিছু চাইল না কিন্তু মনে মনে কারো কাছে কিছু পাওয়ার আশা করল।

৩। ইস্‌রাফ তথা অপচয়। এ 'ইস্‌রাফ' সর্বাবস্থাতেই দোষণীয় ও ক্ষতিকর। আর আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে 'ইসরাফ' করার ফলে নিজেরও ক্ষতি হয় সাথী সঙ্গীদেরও ক্ষতি হয়।

৪। অনুমতি ছাড়া কারো কিছু ব্যবহার করা। এতে অনেক সময় সাথী সংগীর বেশ কষ্ট হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ হারাম। অবশ্য অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করাতে ক্ষতি নেই।

আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং আপনাদের ২৪ ঘন্টা যেন এ বিষয়গুলির প্রতি যত্ন সহকারে অতিবাহিত হয়। এ আমলগুলি পূর্ণ পাবন্দীর সাথে পালন করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাদের কাছে ঘুরে বেড়াবেন এবং নিজের জন্য, গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্য সেই সাথে সাধারণ মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করবেন। এটাই হবে আপনাদের আমল এবং আপনাদের ওযীফা। তাহলে আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ পাক আপনাদের কস্মিনকালেও মাহরুম করবেন না।

(সাওয়ানেহে ইউছুফী)

নিজামুদ্দীন থেকে জমাতগুলো বের হওয়ার সময় অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিস্তারিত হেদায়েত দিয়ে দেয়া হয় এবং নিজামুদ্দীনের মসজিদে একটি বড় বোর্ডে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে সকলের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে। বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

জরুরী হেদায়েত

তবলীগ জামাতে বের হয়ে এ বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক; অন্যথায় লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকা বেশী।

১। কালিমাওয়ালা এবং ইলমওয়ালা প্রতিটি ব্যক্তিকে মনেপ্রাণে ইকরাম ও শ্রদ্ধা করবে এবং এর মশক করবে।

২। অন্যের দোষ-ত্রুটি থেকে নিজের চক্ষু বন্ধ রাখবে এবং নিজের দোষ ত্রুটি তালাশ করতে থাকবে।

৩। বয়ান তালীমের হালকা এবং মজলিশে কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী কিংবা ব্যক্তিকে নিন্দা বা ভর্ৎসনা করবে না। যারা এখনও জামাতে সময় লাগাতে পারেননি তাদেরকেও ছোট মনে করবে না।

৪। প্রত্যেক এলাকার বুযুর্গানে দ্বীন ওলামা ও মাশায়েখের কাছে ফায়দা হাসিল করা এবং দু'আ নেয়ার জন্য যাবে এবং তাদের মুতাআল্লিকীনদের সাথে ইকরাম ও মহব্বতের সাথে মিলে কাজ করবে; কারো সমালোচনা করবে না।

৫। জামাতে বের হওয়াকে পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির উসীলা বানাবে না; বরং অর্জিত ফায়দাগুলোকে কুরবানী করার মশক করবে।

৬। বয়ানের মধ্যে নিজের কৃতিত্ব শোনাবে না। আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও সাহাবা কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন ও সালফে সালেহীনদের ঘটনাবলী শুনিয়ে উৎসাহ প্রদান করবে এবং আল্লাহ কর্তৃক তারা যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেন সেগুলোর আলোচনা করবে।

৭। আল্লাহ পাকই একমাত্র সবকিছু করেন। দিনের বেলায় আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিরলস চেষ্টা করবে আর রাতের বেলায় আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে। যা কিছু ফলাফল দেখা যায় তা আল্লারই করুণা মনে করবে।

এ বিজ্ঞপ্তি কয়েক বছর ধরে মসজিদে ঝুলানো রয়েছে এবং আগতদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়। জামাতগুলো বাইরে যাওয়ার সময় এসব হেদায়েত

বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় এবং ফিরে আসার পর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাদের কারগোজারী শোনা হয় এবং এতে যেসব ভুল-ত্রুটি হয় তার সংশোধন ও সতর্ক করা হয়। সাহারানপুরে যেসব জামাত আসে তাদের কোন বে-উসুলী কিংবা বয়ানে কোন ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হলে তৎক্ষণাৎ আমি মারকাযে জামাতের বিস্তারিত বিবরণ আমীরের নামসহ জানিয়ে দেই। অতঃপর এ জামাত ফিরে গেলে এ বিষয়ে তাদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করার সংবাদও আমার কাছে পৌঁছে।

আমার দৃষ্টিতে এমন সুবিস্তৃত কাজের মাঝে মারকাযের এ তৎপরতা ও দায়িত্বশীলতা প্রশংসার যোগ্য। দূর থেকে সমালোচনা করাতে আমার দৃষ্টিতে তবলীগ জামাতের কোন উপকার হয় না। হতে পারে সমালোচকদের নেক নিয়তের কারণে তারা ছওয়াব পেয়ে যাবেন।

আর যারা ভুল-ত্রুটি করেন, তাদেরকে যে শাসন করার কথা বলা হয় এর অর্থ কি? তাদেরকে কি চাবুক লাগাতে হবে, না জেল খানায় পাঠাতে হবে? সতর্ক ও এছলাহ তো যথাসম্ভব করাই হচ্ছে। অধুনা হেদায়েতি আলোচনা বেশীরভাগ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ওমর পালনপুরীই করে থাকেন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তা উল্লেখ করছি।

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى

আল্লাহ তা'আলা গোটা মানব গোষ্ঠীর পরিস্থিতি আমলের সাথে জুড়ে রেখেছেন; বস্তু সামগ্রীর সাথে নয়। আর আমলকে জুড়ে রেখেছেন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জুড়েছেন অন্তরের সাথে। আর অন্তর আল্লাহ পাকের মুষ্ঠিগত। অন্তর আল্লাহমুখী হলে আমল আল্লাহর জন্য হবে। ফলে দুনিয়া ও আখেরাতের এমনকি স্ত্রীর মুখে লোকমা উঠিয়ে দিলেও সদকার ছওয়াব মিলবে। অপরপক্ষে দিল গায়রুল্লাহমুখী হলে আমলও গায়রুল্লাহমুখী হবে এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হবে। এমনকি দানশীল, শহীদ, কারীও দোযখে যাবে।

সুতরাং দিল আল্লাহমুখী হওয়া সবচে' বেশী জরুরী ও আবশ্যক আর এটাকেই হেদায়েত বলা হয়। হেদায়েত হল একটি নূর, যা মানুষের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। যেমন, সূর্যের আলোতে বস্তু সামগ্রীর লাভ লোকসান

পরিলক্ষিত হয়। যাহেরী বস্তু সামগ্রীর লাভ লোকসান প্রত্যক্ষ করার জন্য রয়েছে যাহেরী আলো তথা চন্দ্র-সূর্য।

অপরপক্ষে বাতেনী আমলসমূহের লাভ লোকসান দেখানোর জন্য আল্লাহ পাক বাতেনী নূর তথা হেদায়েত সৃষ্টি করেছেন। অন্তরে হেদায়েতের নূর হলে আমানত ও সততার মাঝেই লাভ পরিদৃষ্ট হবে আর বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যার মাঝে ক্ষতি দেখা যাবে।

অপরপক্ষে গোমরাহীর অন্ধকার হলে যাবতীয় আমলের লাভ লোকসান দেখা যায় না। ফলে যখন আমল খারাপ হয়ে যায় পরিস্থিতিও তখন প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বুঝা গেল মানব জীবনে সবচে' বেশী প্রয়োজন হেদায়েতের। আর হেদায়েত আল্লাহ পাক নিজের হাতে রেখেছেন।

انك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء و هو اعلم بالمهتدين

আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত প্রাপ্তির জন্য দু'আ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এজন্যই আল্লাহ পাক সূরায়ে ফাতেহায় হেদায়েতের দু'আ সকলের জন্য সাধারণ করে দিয়েছেন। হেদায়েতের দু'আর ন্যায় অন্য কোন দুআকে এতটুকু আবশ্যক করেননি। প্রতিটি নামাযী দৈনিক অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশ বার এই দু'আ করে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, এ দুনিয়া দারুল আসবাব তথা উপকরণের মাধ্যমে হাসিলের জায়গা। সুতরাং দু'আর সাথে সাথে আসবাব এখতিয়ার করাও আবশ্যক। বিয়ে করেই সন্তানের দু'আ করতে হয়। অনুরূপভাবে খেতখামারে পূর্ণ মেহনত করার পরই বরকতের দু'আ করতে হয়। সুতরাং হেদায়েতের দু'আ করার সাথে সাথে মেহনত করাও আবশ্যক। মুজাহাদা করার পরই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

সুতরাং দু'টি বিষয় হলো, মুজাহাদা ও দু'আ। উভয়টির বাস্তবায়নের পরই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের দৃঢ় আশা করা যায়। মুজাহাদা ইনফেরাদী তথা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে হেদায়েতও ইনফেরাদী মিলবে এবং আমলও ইনফেরাদী বনবে। ফলে পরিস্থিতিও ইনফেরাদীভাবে অনুকূল হবে।

অপরপক্ষে মুজাহাদা ইজতেমায়ী তথা সামাগ্রিকভাবে হলে হেদায়েতও

সামগ্রিকভাবে জীবিত হবে এবং আমলও সামগ্রিকভাবে বনবে। পরিস্থিতিও সামগ্রিকভাবে অনুকূল হবে। এই মুজাহাদার জন্যই জামাতগুলো আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে থাকে।

যারা জামাতে না যেয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছেন তারাও বাড়ী গিয়ে স্থানীয় কাজ করবেন। অর্থাৎ দৈনিক দুই গাশত ও মসজিদে তালীম করবেন এবং ঘরে পরিবার পরিজনদের নিয়ে ফাযায়েলের কিতাব পড়বেন, যাতে তাদের মাঝেও দ্বীনের উপর চলার আগ্রহ জন্মায়। আর মাসে তিন দিন আশেপাশের গ্রামে (দাওয়াতের উদ্দেশ্যে) যাবেন। সাপ্তাহিক ইজতেমায়ে শবগোজারী করবেন। এই কয়টি হল এজতেমায়ী আমল। এছাড়া প্রত্যেকে অন্তত ছয় তাসবীহ পুরা করবেন। কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন। ফরয নামায ছাড়াও যতটুকু সম্ভব নফল আদায় করবেন। যেহেতু বাড়ী গিয়ে আপনাদেরকেও স্থানীয় কাজ করতে হবে সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় যারা বের হচ্ছেন তাদের সামনে যেসব উসূল ও আদব বলা হচ্ছে সেগুলো আপনারাও মনোযোগ সহকারে শুনে রাখুন। এখন শুনুন; মুজাহাদা-এর অর্থ কি?

মুজাহাদা হল আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে নিজেকে যাবতীয় আমলের মাঝে ব্যস্ত করা। শরীয়তে আমল তো অনেক রয়েছে, তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে কয়েকটি বুনিয়াদী আমলে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে দ্বীনের অন্যান্য আমলের উপর চলার যোগ্যতা পয়দা হয়। সেই বুনিয়াদী আমলগুলো হল, মসজিদের আমল অর্থাৎ নিজেকে ঈমানী মজলিসে, তালীমের হালকায়, নামাযে, যিকির-আযকারে, দাওয়াতে, আখেরাতের আলোচনায়, খেদমতগোজারীতে এবং দু'আয় আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে মশগুল রাখা। মুজাহাদার জন্য এ আমলগুলোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নফসের খেলাফ নিছক কষ্ট করাই মুজাহাদার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ কষ্ট করা নফসেরই চাহিদা হল।

অপরপক্ষে মুজাহাদার দিকে নফছ অগ্রসর হতে দেয় না। নফস মানুষের সবচে' বড় দুশমন। নফসের প্রথম চেষ্টা হল সে মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জড়িয়ে রাখে। আমলের দিকে অগ্রসর হতে দেয় না। নিতান্ত কেউ আমলের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলে, নফস সে আমলের উপর জমে থাকতে দেয় না। এই জন্যই দেখা যায় তালীম বয়ান কিংবা জিকির ও তেলাওয়াত থেকে নফস

মানুষকে যে কোন বাহানায় বাজারে নিয়ে যায়।

যদি কেউ এসব আমলে জমে যায়, তাহলে নফস তাকে খাওয়া দাওয়া এসতেঞ্জা করা এবং ঘুমানোর সময় বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে সব আমলের নূর শেষ করে দেয়। আর যদি কেউ এতেও সুন্নতের উপর অনড় থাকে তখন নফস বাড়ী ফিরে যাবার পর ব্যবসা বাণিজ্য ও পারিবারিক ব্যস্ততায় এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, সে স্থানীয় তালীম গাশত যিকির ও ইবাদত ছেড়ে বসে।

আর যদি কেউ স্থানীয় আমলে স্থির থাকে অর্থাৎ কাজকর্ম পারিবারিক ব্যস্ততার পাশাপাশি তালীম গাশত যিকির আযকার ই'বাদত ও মশওয়ারায় ফিকিরের সাথে লেগে থাকে তখন নফসের সর্বশেষ আক্রমণ হয় যে, তাকে কোন আমল থেকে বাধা দেয় না; বরং এ আমলগুলোর ইখলাস নষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ এ নিয়ত হবে যে, এর বিনিময়ে লোকদের মাঝে ইজ্জত সম্মান ও প্রসুদ্ধি লাভ হবে। মানুষ বরকতের জন্য বাড়ী নিয়ে যাবে। সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। পার্থিব স্বার্থসিদ্ধি হবে। এক কথায় এসব আমলগুলো আল্লাহর জন্য হওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে করানোর চেষ্টা করবে। আর এসব আমলগুলো যখন পার্থিব উদ্দেশ্যে হবে তখন আর মুজাহাদা থাকে না। এসব আমলগুলো তখনই দ্বীনী মুজাহাদা বলে পরিগণিত হয়, যখন এগুলো একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর তখনই এতে শক্তির সঞ্চার হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের নূর এসে হেদায়েতের কারণ হয়। নফসের এ ষড়যন্ত্র মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।

সুতরাং আমাদের প্রথম কাজ হবে বস্তু সামগ্রীকে কুরবানী দিয়ে মসজিদের আমলে অভ্যস্ত হওয়া। এ ব্যাপারে বরাবর নিজের নিয়তের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। এ ফিকির মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। নিয়তে এখলাস পরিলক্ষিত না হলেও এসব আমলগুলোতে জমে থাকবে এবং ফিকির করতে থাকবে; তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ ইখলাস দান করে দিবেন। সুতরাং বে-ফিকির হওয়া উচিত নয়।

এ আমলগুলো আঞ্জাম দেওয়ার পদ্ধতি হল জামাত রওনা হওয়ার সময় আমীর মামুর পরস্পরে পরিচিত হয়ে নিবে, প্রত্যেক সাথীর স্তর জেনে নিবে। আমীরের আনুগত্য একান্ত জরুরী। আমীর যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীছ মুতাবেক নির্দেশ করবে ততক্ষণ তার নির্দেশ মানতে হবে। বরং তার বলার

আগে ইশারা ও ইচ্ছার উপর কাজ করার চেষ্টা করবে। আমীরের আনুগত্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য সহজ হবে এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্য সহজ হবে।

অপরপক্ষে আমীর নিজেকে সকলের খাদেম মনে করবে। মা'মুররা আমীরকে নিজেদের চেয়ে বড় মনে করবে। নিজে থেকে যে আমীর হতে আগ্রহী তাকে আমীর বানাবে না। এ ধরনের আমীরকে আল্লাহ তার নফসের হাতে সঁপে দেন। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি আমীর হতে ভয় পায় সে-ই আমীর হওয়ার যোগ্য। যে ব্যক্তি আমীর হতে আগ্রহী নয়, মাশওয়ারার মাধ্যমে তাকে আমীর বানিয়ে দেয়া হয়; তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে দেন। অর্থাৎ তার সাথে গায়েবী সাহায্য থাকে।

হযরতজী দামাত বারাকাতুহুম বলে থাকেন, আমীর তো আমীরই; আমের তথা শাসক নয়। অর্থাৎ তার সাথে সর্বদায় আমরের ফিকির লেগে থাকবে। সুতরাং আমীর শাসক সুলভ নির্দেশ দিবে না, বরং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে লোকদের দ্বারা দ্বীনের কাজ নিবে।

২৪ ঘন্টার রুটিন

এবার শুনুন ২৪ ঘন্টা কিভাবে কাটাতে হবে। প্রথমে জামাতের দু' একজন সাথীকে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নির্ধারিত করে নেয়া হবে, যাতে বাকী সব সাথীরা নিশ্চিন্তে আমলে জুড়তে পারে। সে দু'জন সাথী যানবাহনের ব্যবস্থা করবে, আর অন্য সকলে ষ্টেশনে তালীম শুরু করে দিবে। এ ধরনের সাধারণ স্থানগুলোতে ঈমান, আখলাক, ইবাদত, আখেরাত ও মানবতার আলোচনা করতে হবে, যাতে যে-ই বসে সে-ই উপকৃত হয় এবং সঠিক মানবতার পরিবেশ গড়ে উঠে। রেলগাড়ীতে একই বগীতে আরোহণ সম্ভব না হলে দু' তিন বগীতে আরোহণ করবে। রেলের সময়টুকু রুটিন বানিয়ে নিবে। তালীম, তেলাওয়াত ও যিকির আযকারে যেন সময় কাটে। আর নামায যেন সময় মত জামাতের সাথে আদায় হয়।

দুই দুই জন করে জামাত করে নিবে। কোন ষ্টেশনে রেলগাড়ী বেশী সময়

অবস্থান করবে বলে নিশ্চিত হতে পারলে নেমে জামাতের সাথে নামায পড়বে। এর দ্বারা সাধারণভাবে ইবাদতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর যদি রেলগাড়ী বেশীক্ষণ অবস্থান করবে বলে নিশ্চিত না হওয়া যায়, তাহলে নিজের বগীতেই দু'ই দু'জন করে জামাত করে নিবে। শুধু ফরয, বিতর এবং ফযরের সুন্নত পড়বে। অন্যান্য সুন্নত ও নফল ছেড়ে দিবে, যাতে মুসাফিরদের কষ্ট না হয়। ফরযও সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করবে। ফযরের আযানের সময় মুসাফিররা ঘুমিয়ে থাকে সুতরাং এ সময় আযান হালকা আওয়াযে দিবে।

রেলগাড়ীতে সাথীদের ফিকির বানিয়ে নিবে যাতে সামনে গিয়ে কোন প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না হয়। রেলগাড়ী থেকে নামার পূর্বে একজন সাথী মোতায়েন করে নিবে, যাতে সকলে নেমে যাওয়ার পর কারো কিছু রয়ে গেল কিনা দেখে নিতে পারে। রেলগাড়ী থেকে নেমে শহরে প্রবেশ করার পূর্বে সব সাথী মিলে দু'আ করে নিবে। তবে সামান মাঝে রাখবে, যাতে কিছু হারিয়ে না যায়। বস্তি দেখার যে মছনূন দু'আ রয়েছে তা পড়ে নিলে অত্যন্ত ভাল; অন্যথায় সে সময়ের উপযোগী দু'আ করে নিবে। দু'আর পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে সব সাথীর যেহেন তৈরী করে নিবে যে, সকল সাথী যেন দৃষ্টি নীচু রেখে আল্লাহর যিকিরের সাথে চলে, কোন পরনারীর প্রতি কিংবা কোন ছবির প্রতি যেন দৃষ্টি না পড়ে। দৃষ্টি-পথেই মানুষের মনে অনিষ্টতা প্রবেশ করে।

মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পায়ের তারপর ডান পায়ের জুতা খুলবে। তবে মসজিদে আগে ডান পা প্রবেশ করাবে, তারপর বাম পা। মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়বে এবং এতেকাফের নিয়ত করে নিবে। বিছানাপত্র মসজিদের বাইরে কোন কামরা থাকলে তাতেই রাখবে; অন্যথায় মসজিদের এক কোণে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে, যাতে নামাযীদের কষ্ট না হয়।

তারপর ওযু করে মকরূহ সময় না হলে দু' রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে সব সাথী মাশওয়ারায় বসে যাবে। মাশওয়ারায় ২৪ ঘন্টার রুটিন বানিয়ে নিবে এবং সাথীদের দায়িত্ব বন্টন করে নিবে। দু'টি বিষয়ের প্রতি খুব ভালভাবে ফিকির করবে। প্রথমতঃ এ এলাকা থেকে জামাত কিভাবে বের হতে পারে, এখানে স্থানীয় কাজ কিভাবে চালু হতে পারে। এ বিষয়ে সব সাথীই যেন ফিকির- সেই চেষ্টা করবে।

মাশওয়ারায় স্থানীয় সাথীদেরকেও শরীক করে নিবে, যাতে এলাকার সঠিক পরিস্থিতি জানা যায়। এখানে তালীম, গাশত হচ্ছে কিনা, এখানকার লোকেরা জামাতে বের হয় কিনা, এমন কেউ আছে কিনা যিনি জামাতে যাওয়ার এরাদা করেছেন- পূর্ণ পরিস্থিতি জেনে সেই হিসেবে মেহনত করতে হবে। সবচেয়ে প্রথম মাশওয়ারা করতে হবে খাবার কে রান্না করবে। কেননা নিজের খেয়ে কাজ করলে তাতে শক্তি সঞ্চার হয়। রান্না করার সাথী নির্ধারিত করে তারপর খুসুসী গাশতের জন্য জামাত তৈরী করবে।

মশওয়ারায় একই ব্যক্তিকে দৈনিক একই কাজ দিবে না; বরং পালাক্রমে সব সাথীকে সব ধরনের কাজ দিবে, যাতে দাওয়াত, তালীম, গাশত, রান্না করা সব ধরনের কাজে সব সাথী পারদর্শী হয়ে যায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্য জামাত চালাতে পারে।

মশওয়ারায় আমীর যার মতামত জিজ্ঞাসা করবে সেই শুধু মত দিবে। সব সাথী অত্যন্ত ফিকিরের সাথে মশওয়ারা করবে; উদাসীন হবে না। মত পেশ করার সময় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে।

প্রথমতঃ এই কাজের এবং সাথীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে মতামত পেশ করবে, অর্থাৎ নিজের চাহিদা মাফিক পরামর্শ দিবে না। যেমন, নিজের মাথা ব্যথার কারণে ঘুমাতে ইচ্ছা করছে কিন্তু কাজের এবং সাথীদের ফায়দা রয়েছে তালীমের মধ্যে; তখন ঘুমানোর মত দেবে না, এটা আমানতের খেয়ানত হবে। বরং তালীমেরই মত দিবে এবং তালীম শুরু হয়ে গেলে নিজের অপারগতার কথা জানিয়ে আমীর সাহেবের কাছে অনুমতি নিয়ে বিশ্রাম করবে। কিন্তু শুধু নিজের কারণে বিশ্রাম করার পরামর্শ দিবে না।

দ্বিতীয়তঃ কারো মতকে উপেক্ষা করে নিজের মত প্রকাশ করবে না। ভিন্ন মত পোষণ করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যের মতকে উপেক্ষা করে নয়। যেমন, কেউ মত দিল এখন বিশ্রাম করা উচিত আর আপনার মতে তালীম করা উচিত। তাহলে সোজাসুজি বলে দিন, এখন তালীম করা উচিত এবং যুক্তি এই। এরূপ বলা উচিত নয় যে, বিশ্রামের জন্য তো আমরা এখানে আসিনি। এটা কি বিশ্রামের সময় হল? এ ধরনের উপেক্ষামূলক কথায় সাথীদের মন ভেঙ্গে যাবে।

তৃতীয়তঃ বল প্রয়োগমূলক মত প্রকাশ করবে না। যেমন, এখন তো তালীমই হবে। তালীম ছাড়া আর কি হতে পারে? যেন আমীরের উপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এটাও ভুল আচরণ।

আমীর ছাহেব মতামতের সময় সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ফয়সালা দিবে। যেদিকে বেশী মানুষের মত সেদিকে ফায়সালা দিতে হবে এমনটি নয়। সকলের মতামত শোনার পর আল্লাহ তার মনে যা ঢালেন সে অনুপাতে ফায়সালা দিবে। তবে সব সাথীর মতামতের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে। যেমন, কারো মত হল এখন ঘুমানো উচিত, কারো মত হল তালীম করা উচিত, আর আমীর ছাহেব এখন তালীমের ফায়সালা দিতে চাচ্ছেন; তাহলে এরূপ বলতে হবে যে, ভাই সাথীরা! সকলেই ক্লান্ত। বিশ্রাম নেয়া আবশ্যক। কেননা, সাথীরা সব অসুস্থ হয়ে পড়লে সামনে কাজ করা যাবে না। আর দিনে একটু বিশ্রাম করে নিলে রাত্রে তাহাজ্জুদে উঠাও সহজ হয়। সুতরাং বিশ্রাম করাও একান্ত আবশ্যক। যেমন ভাইয়েরা পরামর্শ দিলেন। তবে আমরা যেহেতু নতুন এলাকায় এসেছি, এসেই শুয়ে পড়লে মানুষ খারাপ ধারণা করবে। কেননা, তারা তো আর আমাদের অপারগতার কথা জানবে না; সুতরাং সব দিক ভেবে আমার মতে কিছুক্ষণ তালীম হয়ে যাক, তারপর বিশ্রাম করে নেয়া যাবে।

এভাবে সাথীদের পরস্পরে জোড়মিল অক্ষুণ্ন থাকে। আমীরের ফয়সালার পর সব সাথী পূর্ণ উৎসাহের সাথে কাজে নেমে যাবে। কোন সাথীই নিজের মতকে ওহীর ন্যায় সুদৃঢ় মনে করবে না এবং নিজের মতামতকেই মানানোর চেষ্টা করবে না; বরং যার মতের অনুকুল ফায়সালা হয়, সে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে যে, না জানি আমার এ মতে নফসের ষড়যন্ত্র রয়েছে এবং খুব ফিকিরের সাথে মঙ্গলের দু'আ করতে থাকবে। আর যার মতের পরিপন্থী ফায়সালা হয় সে আপন মনে খুশী হবে যে, এ ফায়সালা অন্তত আমার নফসের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে গেল। অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে কাজে নেমে যাবে।

খুসুসী গাশতের আগেই নিজেদের খাওয়া দাওয়ার এন্তেজামের জন্য লোক নির্ধারিত করে নিবে। খাওয়া দাওয়ার ইন্তেজাম না করে খুসুসী গাশতে গেলে যদি কোন বিত্তশালী খাওয়া দাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন স্বভাবতই

গলার স্বর নীচু হয়ে যাবে। ফলে দাওয়াতের রূহ শেষ হয়ে যাবে। এই জন্যই প্রত্যেক জামাত নিজেদের হাড়ী পাতিল সাথে নিয়ে যাবে এবং এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার সময় এ গ্রাম থেকেই চাল ডাল কিনে নিবে, যাতে সেখানে গিয়ে কিছু কেনার প্রয়োজন না হয়।

জামাতের কৃতিত্ব হল, তারা নিজেদের খাবার নিজেরা রান্না করবে আর স্থানীয় লোকের কৃতিত্ব হল, তারা জামাতকে রান্না করতে দিবে না। কোন এলাকায় মেহমানদারীর গুণ থাকলে সেটাকে শেষ করতে হবে না; বরং জামাতের লোকেরা তাদেরকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করবে যে, আমাদের সাথে তালীম গাশত ও বয়ানে অংশগ্রহণ করা এবং চিল্লা-তিন চিল্লার জন্য সাথী বের করে দেয়াই আমাদের মেহমানদারী। এসব মেহনতে অংশগ্রহণ করার সাথে খাওয়া দাওয়ার মেহমানদারীও যদি করা হয় তাতে ক্ষতি নেই। জামাতের সাথীরা সবদিক ভেবে দু' এক বেলার জন্য গ্রহণ করে নিবে। জামাতের সাথীরা এদিকে লক্ষ্য রাখবে যে, দাওয়াত গ্রহণ না করাতে যদি অধিক ফায়দা মনে হয় এবং এমন মনে হয় যে, এতে লোকদের মাঝে অধিক প্রভাব পড়বে এবং দ্বীনের নিকটতর হবে তবে একরামের সাথে তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে দিবে। যেমন, এরূপ বলবে যে, এ এলাকায় তুমিই তো একমাত্র ফিকিরমন্দ সাথী। তুমি যদি রান্না বান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়ো, তাহলে আমাদের সাথে দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করবে কে? তা না করে বরং তুমি আমাদের সাথে কাজের ফিকির করো। এ ধরনের কোন সুন্দর কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিবে।

আর যদি এরূপ মনে হয় যে, দাওয়াত গ্রহণ করলে এলাকার লোক কাছে ভিড়বে, তাহলে নিজেদেরকে ইশরাফ তথা মনের ছওয়াল থেকে বাঁচিয়ে দু' এক বেলার জন্য গ্রহণ করে নিবে, কিংবা নিজেদের খাবার ও মেজবানের খাবার এক সাথে নিয়ে এক সাথে বসে খেয়ে নিবে।

মোটকথা, দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে একরামের সাথে করবে। আর গ্রহণ করলে নিজেদেরকে ইশরাফ থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। জামাতের জযবা হবে নিজের খাবার; নিজে রান্না করার। আর এলাকাবাসীর জযবা হবে মেহমানদারী করার।

খুসুসী গাশতের জন্য স্থানীয় একজনসহ তিন চারজন সাথী যাবে। খুসুসী

গাশতে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কাছে যাওয়া হয়। যদি ধর্মীয় দিক থেকে সম্মানিত ব্যক্তি হন যেমন, কোন বুযুর্গ, আলিম, পীর কিংবা শায়খ এ ধরনের মান্যবরদের কাছে যেতে তাদের সাক্ষাতের সময় যেতে হবে। তাদের রুটিনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন অসময় যাবে না। তাদের কাছে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে যাবে না; বরং তাদের কাছে কুরআন ও হাদীছের যে নূর রয়েছে সে নূর থেকে ফয়েয হাসিল করার উদ্দেশ্যে যাবে। যদি মুখে ফায়দা হাসিল করার কথা প্রকাশ করে অথচ মনে ফায়দা হাসিল করার উদ্দেশ্য নেই, তবে ফায়দা হাসিল হবে না বরং এর দ্বারা আল্লাহওলাদের মন আপনাদের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। তাই ফায়দা হাসিল করার নিয়তেই যাবেন।

যদি তার মনোযোগ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শোনাবে। উম্মতের হালত এবং এ কাজের ফায়দা জানাবে, যাতে তাদের অন্তরে দু'আ করার আগ্রহ জন্মায়। এতে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হয়ে যাবে। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন এলাকা কিংবা গ্রামের বদনাম বর্ণনা করবে না।

আর যদি তিনি মনোযোগ দিতে সক্ষম না হন, তাহলে সামান্য সময় বসে দু'আর দরখাস্ত করে চলে আসবে। এতেও খুসুসী গাশত আদায় হয়ে যাবে।

যদি পার্থিব দিক থেকে সম্মানিত ব্যক্তির কাছে যেতে হয় যেমন, এলাকার চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কিংবা বিত্তশালী সে ক্ষেত্রে নিজের হেফাযত করা একান্ত আবশ্যক। তার পার্থিব আসবাবপত্রের প্রভাব নিজের মনে যেন না পড়ে। অন্যথায় দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে তার কাছ থেকে দুনিয়ার দাওয়াত নিয়ে আসার আশংকা রয়েছে। দৃষ্টি নীচু রেখে আল্লাহর যিকির করা অবস্থায় যাবে।

খুসুসী গাশতে এক সাথীকে আমীর নিযুক্ত করে নিবে। সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি বুঝে তার সাথে আলোচনা করবে। তবে আলোচনা ৬ নম্বরের ভিতরেই সীমিত থাকবে। কোন বিতর্কিত কিংবা রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করবে না। কারো পক্ষের বা বিপক্ষের আলোচনাও করবে না। তাকে যতটুকু সময়ের জন্য সম্ভব বের করে আনার চেষ্টা করবে। যদি বিরক্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে অন্তত মসজিদে এলান করার কিংবা তার নিজের লোকদের মধ্য হতে কোন একজনকে গাশতের সাথে দেয়ার জন্য প্রস্তুত করবে। এতটুকুই যথেষ্ট।

তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তার এলান করার কারণে কিংবা তার কোন লোক গাশতে অংশগ্রহণ করার কারণে যেন দ্বীনী মুছলেহাতের পরিপন্থী না হয়। বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সামনে অকস্মাৎ কষ্টের কথা আলোচনা না করে আখেরাতে অনন্ত অসীমকাল ইজ্জত ও সম্মানের কথা এমনভাবে আলোচনা করবে যাতে এই মেহনত, সাধনা ও কুরবানী তার জন্য সহজ অনুভূত হয় এবং সুসংবাদ বলে মনে হয়। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

بشروا و لا تنفروا يسروا و لا تعسروا

উমুমী গাশত, তালীম, বয়ান এবং তাশকীলের সময়ও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

দ্বিতীয়তঃ 'উমুমী গাশত'। এই গাশত আমাদের দাওয়াতের কাজের মেরুদণ্ড। উমুমী গাশতে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে নামাযের পর সাধারণ বয়ান হবে সে নামাযের পূর্বের নামাযে জামাত যেন মসজিদে থাকে। স্থানীয় গাশতের বেলায়ও এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যেমন, মাগরিবের পরে বয়ান হলে আছরের সময় জামাত যেন মসজিদে থাকে। অনেক সময় স্থানীয় গাশতে শুধু ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, আজ ইশার পূর্বে গাশত হবে। খাওয়া দাওয়া সেরে সকলে চলে আসবেন। লোকেরা সব কাজ সেরে ফুরসত মত মসজিদে আসে এবং গতানুগতিক গাশত হয়। এভাবে বছরকে বছর গাশত হওয়া সত্ত্বেও নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। নিছক সময় কাটানো ছাড়া আর কিছুই হয় না। অবশ্য একেবারেই না হওয়ার চেয়ে এতটুকু হওয়া ভাল। কিন্তু এর দ্বারা দ্বীনী পরিবেশ গড়ে উঠার আশা করা যায় না।

সুতরাং মাগরিবের পর বয়ানের প্রোগ্রাম হলে আছরের নামাযের পর জোরদার এলান করবে এবং লোকদেরকে উৎসাহিত করে এই তশকীল করবে যে, আছর থেকে ইশা পর্যন্ত সময় দেয়ার জন্য কে কে প্রস্তুত আছেন? যেমন তিন চিল্লার 'তাশকীল' করা হয় অনুরূপভাবে আছর থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ের জন্য তাশকীল করা হবে। যারা এতটুকু সময়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান তাদেরকে আগে বাড়িয়ে দিবে আর অন্যদের সাথে পীড়াপীড়ি করবে না। বরং তারা যেতে চাইলে এই বলে ছেড়ে দিবে যে, আগামী নামাযে যেন ফারেগ হয়ে আসে এবং অন্যদেরকেও দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসে।

যারা আছর থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে তাদের এ সময়টুকু আমানত বলে মনে করবে সুতরাং সকলকে আমলে জোড়ার চেষ্টা করবে। যদি লোক বেশী হয় তাহলে উমুমী গাশতের যে কয়টি জামাত বানানো প্রয়োজন সে কয়টি জামাত বানাবে। যদি জানা যায় যে, আশেপাশে বিশেষ ব্যক্তিবর্গও রয়েছেন তাহলে প্রয়োজন মতে খুসুসী গাশতের জন্য তিন কিংবা চারজনের জামাত তৈরী করে পাঠিয়ে দিবে, যাতে বিশেষ বিশেষ লোকদের কাছে গিয়ে পূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে নগদ বয়ানে নিয়ে আসা যায়।

এরপরও মসজিদে যারা বেঁচে যাবে তাদেরকে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দাওয়াতের আলোচনা করবে আর কয়েক সাথী যিকির ও দু'আয় মশগুল থাকবে আর কয়েক সাথী প্রস্তুত থাকবে যাতে বাহির থেকে যেসব নতুন সাথী আসবে তাদের নামায না পড়া হয়ে থাকলে ওযু এস্তেঞ্জা করিয়ে সে সময়ের ফরয নামায পড়িয়ে বয়ানে বসিয়ে দিবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বয়ানে তাদের মন বসাতে চেষ্টা করবে এবং তাদের তশকীলের ফিকির করবে।

উমুমী গাশত গতানুগতিকভাবে যেন না হয়; বরং অত্যন্ত গুরুত্ব ও ফিকিরের সাথে যেন হয়। দশজন করে এক একটি জামাত তৈরী করবে। এতে একজন আমীর, একজন স্থানীয় রাহবার ও একজন মুতাকাল্লেম নিযুক্ত হবে। সকলে মিলে দু'আ করে গাশতে রওনা হবে। সকলে মিলেমিশে চলবে। দৃষ্টি নীচু রেখে যিকিরের সাথে চলবে। রাহবার যার কাছে নিয়ে যাবে মুতাকাল্লিম তার সাথে আলোচনা করবে। আমীরের দায়িত্ব হল জামাতকে শৃংখলাবদ্ধ রাখা। রাহবারকে বুঝিয়ে দিবে, সে যেন লোকদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করে। যেমন, এই লোকটি বে-নামাযী কিংবা মদ্যপায়ী। এরূপ না বলে শুধু সাক্ষাত করিয়ে দিবে। মুতাকাল্লিম স্থান-কাল-পাত্র বুঝে আলোচনা করবে। তার শ্রদ্ধাও যেন অক্ষুণ্ন থাকে এবং আলোচনাও যেন হয়ে যায়। কথা তিরস্কারের স্বরে নয়; বরং কোমল স্বরে বলবে। অনুরূপভাবে এলান করার মত সংক্ষিপ্ত যেন না হয় এবং দীর্ঘও যেন না হয়। বরং এমনভাবে আলোচনা করবে যে, নগদ মসজিদে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

গাশতের জন্য এমন কোন শব্দ নির্ধারিত নেই যে, সবক্ষেত্রে চলতে পারে। মোটামুটি এ ধরনের বলবে যে, ভাই আমি, আপনি, আমরা সকলেই মুসলমান।

আমরা কালিমা পড়ে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছি যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশ মানবো এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মতে জীবন পরিচালনা করবো। এর মধ্যে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী নিহীত রয়েছে। তবে এর জন্য মেহনত করার প্রয়োজন রয়েছে। এই মেহনতকে লক্ষ্য করেই আপনাদের এলাকায় জামাত এসেছে। এখনও মসজিদে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সুতরাং আমাদের সাথে চলুন। আর ওমুক নামাযের পর এ মেহনত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে কালিমাও শুনা যেতে পারে, তবে সবক্ষেত্রে নয়। উপরোক্ত বাক্যগুলোর মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কমবেশীও করা যেতে পারে।

যে কয়জন মসজিদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় নিজেদের একজন সাথীসহ তাদের মসজিদে পাঠিয়ে দিবে। মসজিদে যেতে প্রস্তুত না হলে নিজেদের সাথে গাশতে শরীক করে নিবে। যদি এতেও প্রস্তুত না হয় তাহলে পরবর্তী নামাযে বন্ধু-বান্ধবসহ বয়ানে অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিবে। এটা সর্বনিম্ন স্তর। অন্যথায় নগদ সাথে নিয়ে নেয়াই উচিত।

এই গাশতের মাধ্যমে গাফলতির স্থলে আল্লাহর স্মরণের মশক করতে হবে। তাওয়াজু এবং সবর শিখতে হবে। ইকরামের সাথে আল্লাহর হুকুম পৌছানোর মশক করতে হবে। এ গাশতে নিজের এছলাহের নিয়ত হবে। গাশতে বলপ্রয়োগ যেন না হয়; বরং অত্যন্ত কোমল স্বরে লোকদেরকে আপন করার চেষ্টা করবে। গাশতের মাধ্যমে সারা গ্রাম যেন ঘুরা হয়ে যায়।

রাত্রের বয়ান স্থানীয় সাথীদের পরামর্শে মাগরিবের পরে কিংবা ইশার পরে যখনই হয় তাতে বক্তা প্রথম থেকে নিযুক্ত করে নিতে হবে। বয়ানে ৬ নম্বরের মধ্য থেকেই আলোচনা হবে। দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও আখেরাতের মহত্ব ও স্থায়ীত্ব সম্পর্কে জোরদার আলোচনা করবে। আম্বিয়া কেরাম (আঃ), সাহাবা কেরাম (রাঃ)-দের বিশুদ্ধ ঘটনাবলী বর্ণনা করে চার চার মাসের তাগাদা করবে। এই বয়ানে জামাতের সব সাথীকেই ফিকির করতে হবে। শুধু বক্তার উপর ছেড়ে দিবে না এবং বক্তাকে দাঁড়া করিয়ে দিয়ে সাথীরা বিশ্রামে কিংবা চা পান করতে চলে যাবে না। বক্তা হলেন গোটা জামাতের মুখতুল্য। সুতরাং সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে মুখের আছর হবে। নামাযের পর এলান করে

সংক্ষিপ্ত সুন্নত পড়ে সব সাথী অনুনয় বিনয় করে মাজমা জুড়ে নিবে। এই ইজতেমায়ী আমলের সময় নিজের ইনফেরাদী আমলগুলো সামান্য বিলম্বিত করে নিবে। যেমন, মাগরিবের পরে আউয়াবীনের পূর্বে প্রথমে মাজমা জুড়ে নেয়ার ফিকির করবে। হতে পারে এই মাজমা থেকে বহু দায়ী তৈরী হয়ে যাবে এবং বহু ফরজ আদায় করনেওয়ালা বনে যাবে। যার মর্যাদা নফলের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নফল ছেড়ে দিতে হবে; বরং মাজমা জমে যাওয়ার পর দু' তিনজন করে এক কোণে নিজের আউয়াবীন পড়ে নিবে। যাতে ইজতেমায়ী ইনফেরাদী উভয় কাজই একের পর এক হয়ে যায়। নফল ও যিকির আযকারেও কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় বরং আরও অধিক যত্ন নেয়া হয়।

বয়ানের পর তাশকীলের সময় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে, যাতে লোকেরা চিল্লা, তিন চিল্লার জন্য নাম লিখিয়ে নেয়। তারপর সাথীরা স্থানীয় সাথীদের তাশকীল করার চেষ্টা করবে। তাদের সমস্যার সমাধান বাতাবে। তাদের ওজর শুনে প্রভাবিত হয়ে যাবে না; বরং হিকমতের সাথে তার সমাধান বাতাবে। দ্বীনের মেহনত সম্পর্কে এমন গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করবে যে, মানুষ যেন নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান খুঁজে নেয়।

তবে কারো সমস্যার জবাব দিতে গিয়ে 'মজযুব' হয়ে যাবে না। যেমন, সে বলছে, আমার স্ত্রী অসুস্থ। আর আপনি বলছেন, "বাদ দেও তোমার স্ত্রী। স্ত্রী মরে গেলেই কি আসে যায়। দ্বীনের স্তম্ভ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। উম্মত সব জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে আর তুমি স্ত্রী নিয়ে পড়ে আছো"। এ ধরনের কথা মোটেই ঠিক নয়। তাহলে এ লোক আর কখনও বয়ানে বসবে না। তার সমস্যা এবং অসুবিধার কথা শুনে সমবেদনা প্রকাশ করবে। তারপর অত্যন্ত গাম্ভির্যতার সাথে শরীয়তের সীমারেখা ঠিক রেখে তার সমাধান বাতাবে। তারপর সামান্য সময়ের জন্য প্রস্তুত করবে। এমনকি কেউ তিন দিন কিংবা এক দিন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তারও অত্যন্ত কদরের সাথে নাম নিবে এবং এর এ সময়টুকু যাতে ভালভাবে কাটে সে চেষ্টা করবে। তাহলে এ তিন দিনই তিন চিল্লা হয়ে যাবে। যারা নাম লিখাবে তাদের সময় এবং ঠিকানাও লিখে নিবে।

তারপর সকালে উশুলী গাশত করে জামাত তৈরী করে সাথে একজন পুরাতন সাথী দিয়ে নগদ জামাত বের করে দিবে। রওনা করার সময় সংক্ষিপ্তভাবে উসূল ও আদবও বর্ণনা করে দিবে। যদি এক দিনে জামাত বের করা সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় দিনও সেখানেই অবস্থান করবে। এক জামাত আরেক জামাতকে বের করবে এটাই হল প্রকৃত নিয়ম। এজতেমা থেকে জামাত বের হওয়া হল দ্বিতীয় পর্যায়ের। যে কয় জামাত বের হল, এটাই আপনার সকল মেহনতের ফলাফল।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, কয়েকটি কাজ করলে জামাত বের করা সহজ হয়। প্রথমতঃ নিজেরা রান্না করে খাওয়া। দ্বিতীয়তঃ ওসূলী গাশ্ত করা। অর্থাৎ, যারা আগে থেকে বের হওয়ার ওয়াদা করেছেন কিংবা এখন ওয়াদা করেছেন তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত করা। তবে অন্যান্য জায়গায়ও তাশকীল জারী রাখবে।

বাইরে যাওয়ার জন্য যারা নাম লিখিয়েছেন তারা ছাড়া অবশিষ্ট যারা রয়ে গিয়েছেন তাদের স্থানীয় কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। বরং তাদের থেকে নাম তলব করে স্থানীয় কাজের জন্য একটি জামাত তৈরী করে দিবে।

এই স্থানীয় জামাতের দায়িত্ব হবে প্রথমতঃ সময় নির্ধারিত করে মসজিদে দৈনিক তালীম জারী করা।

দ্বিতীয়তঃ সপ্তাহে দুই গাশ্ত করা। একটি নিজ মসজিদের আশেপাশে আর একটি অন্য মসজিদে। তবে দ্বিতীয় গাশ্ত সেখানকার স্থানীয় লোকদের দ্বারা করাতে হবে যাতে দু' তিন সপ্তাহ পর তারা নিজেরাই গাশত করতে পারে। সেখানে গাশ্ত চালু হয়ে গেলে তাদের দায়িত্বও হবে নিজেদের মসজিদে গাশ্ত করার সাথে সাথে অন্যান্য মসজিদেও গাশত চালু করা। আর প্রথম মসজিদের সাথীরা তৃতীয় কোন মসজিদে গাশ্ত চালু করবে। এক কথায় দ্বিতীয় গাশ্ত হবে অন্যান্য মসজিদে গাশ্ত চালু করার জন্য। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদের সাথীরা নিজেদের মসজিদে গাশ্ত করার সাথে সাথে দ্বিতীয় গাশ্তে অন্যান্য মসজিদেও গাশ্ত চালু করবে।

তৃতীয়তঃ নিজেদের গাশ্তের দিন বয়ানের পর চিল্লা, তিন চিল্লার জন্য কিংবা অন্ততঃ তিন দিনের জন্য জামাত তৈরী করবে। নিজেও তিন দিনের জন্য জামাতে যাবে।

চতুর্থতঃ নিজেদের এলাকায় সাপ্তাহিক এজতেমা হলে সেখানে আছর থেকে

পরের দিন ইশরাক পর্যন্ত নিজেও যাবে, অন্যদেরও নিয়ে যাবে। এই সাপ্তাহিক এজতেমা গোটা শহরের মেহনতের সারনির্যাস। প্রত্যেক মহল্লার লোকেরা তিন দিন কিংবা তারচে' বেশী সময়ের জামাত নিয়ে আসবে। যাতে সপ্তাহিক এই এজতেমা নিছক বয়ান পর্যন্ত ক্ষান্ত না থাকে; বরং প্রত্যেক মহল্লা থেকে জামাতবদ্ধ হয়ে আসবে। প্রত্যেক মহল্লা থেকে দু' জন করেও যদি চিল্লার জন্য আসে তাহলে প্রতি সপ্তাহে চিল্লা-তিন চিল্লার দু' তিনটি জামাত বের হতে পারে। অন্যথায় তিন দিনের জামাত যে কয়টি সম্ভব নিয়ে আসবে।

সাপ্তাহিক এজতেমায় প্রত্যেকে নিজ নিজ খাবার সাথে নিয়ে আসবে এবং আসর থেকে পরদিন ইশরাক পর্যন্ত এই পরিবেশে অবস্থান করবে। রাত্রে বয়ান হবে। সকালে সব জামাত বের হয়ে যাবে।

আশে-পাশের এলাকায় তিন দিনের জন্য যেসব জামাত যাবে তারাও এ ধরনের মেহনত করে চিল্লা, তিন দিনের জন্য জামাত তৈরী করবে এবং সেখানে স্থানীয় জামাত তৈরী করে উপরোক্ত দায়িত্বগুলো তাদেরকেও বুঝিয়ে দিবে। স্থানীয় জামাত এ কাজগুলো নিজেও করবে মহল্লার অন্যদেরকেও উৎসাহিত করবে। তালীম, গাশ্ত ও মাসে তিন দিন আর সাপ্তাহিক এজতেমা চালু থাকলে তাতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। সাপ্তাহিক এজতেমা কোথাও চালু না থাকলে হযরতজী (দামাত বারাকাতুহুম)-কে জিজ্ঞাসা না করে চালু করবে না।

এগুলো তো ছিল এজতেমায়ী পর্যায়ের আমল। তাছাড়া স্থানীয় জামাতগুলো কিছু এনফেরাদী আমলও করবে। তা হল; অন্তত ছয় তাসবীহ, তেলাওয়াত, নফলের প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি। এগুলো নিজে করবে এবং প্রত্যেক গাশতের তারীখে মাজমা'তে উপস্থিত সকলকে এ আমলগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। সেই সাথে সকলে যেন ঘরে পরিবার পরিজনদের নিয়ে ফাযায়েলের তালীম করে– সে ব্যাপারেও উৎসাহিত করবে, যাতে মহিলা ও বাচ্চাদের মাঝেও ইবাদত, যিকির ও দ্বীনী পরিবেশ গড়ে উঠে। এভাবে কোন প্রকার হৈ চৈ ছাড়াই হাজার হাজার ঘরে মহিলাদের মাঝে কাজ চালু হয়ে যাবে। ফাযায়েলের তা'লীমের উসীলায় ইনশাআল্লাহ পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন সাধন হবে। এভাবে কাজ করলে মসজিদের বাইরের লোকেরা মসজিদে এসে নামাযী বনতে থাকবে আর নামাযীরা দায়ী বনতে থাকবে এবং কাজে অগ্রসর

হতে থাকবে এবং অতি সহজে দলে দলে কর্মী বনতে থাকবে। এতে লোকদের পারিবারিক এবং কাজ-কারবারে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

যাহোক, বাইরের জন্য তাশকীল করার সাথে সাথে স্থানীয় জামাত তৈরী করে তাদের উপরও উপরোক্ত কাজগুলো সঁপে দিবে।

এই সবগুলো ছিল দাওয়াত সংক্রান্ত আমল। অর্থাৎ খুসুসী গাশত, উমুমী গাশত, বয়ান ও ইনফেরাদীভাবে রিকসায় গাড়ীতে যার সাথেই সাক্ষাত হয়; হিকমতের সাথে দাওয়াত দেয়া। এগুলো ছাড়া জামাত নিজেদেরকে তালীমে ব্যস্ত রাখবে। তালীম অত্যন্ত মনযোগ সহকারে করবে। তালীমের প্রথম কাজ হল, ফাযায়েলের কিতাব শুনা ও শুনানো। এই তালীমে শুধু ফাযায়েলের তালীম হবে। এতে আমলের প্রতি আগ্রহ জন্মে এবং এতে কোন প্রকার মতানৈক্য সৃষ্টি হয় না।

অপর পক্ষে মাসআলা-মাসায়েল যেহেতু মতবিরোধ সাপেক্ষ; তাই এজতেমায়ী আমলে মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা হয় না। যেমন ধরুন; তালীমে যদি ওযুতে চার ফরযের কথা উঠে তাহলে স্বভাবতই শাফী মাযহাবের কেউ তাতে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা, শাফী মাযহাবে ওযুতে ছয় ফরয। অপরপক্ষে ফাযায়েলে যেহেতু কারো দ্বিমত নেই। যেমন, জামাতে নামাযে সাতাশ গুণ বেশী ছওয়াবের ব্যাপারে সকলেই একমত। সুতরাং ফাযায়েলের তালীমে সকলেই জুড়তে পারবে।

এমনকি তালীমের হালকায় শুধু হানাফী সাথী হলেও মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি নেই। কেননা, জামাতে অধিকাংশই সাধারণ লোক হয়ে থাকে। সুতরাং মাসআলা মাসায়েল আলোচনা করতে গিয়ে ভুল করে ফেলবে। তাই মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারটি ওলামা কেরামের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। ফাযায়েলের তালীম দ্বারা লোকদেরকে দ্বীনের পিপাসু বানাতে হবে। যখন তারা পিপাসু হয়ে পানি তলব করবে অর্থাৎ মাসায়েল জিজ্ঞাসা করবে, তখন তাদের বলে দিতে হবে তোমরা নিজ নিজ কূপে পানি পান কর। অর্থাৎ, হানাফীরা হানাফী ওলামা কেরামের কাছে, শাফীরা শাফী ওলামা কেরামের কাছে, আহলে হাদীছ সম্প্রদায় আহলে হাদীছ ওলামা কেরামের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। এভাবে সকলে মিলেমিশে চলতে পারবে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, জামাতের লোকদের মাসআলা মাসায়েলের জরুরত নেই; অবশ্যই জরুরত আছে। ফাযায়েল ছাড়া তো আমল দুরুস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মাসায়েল ছাড়া আমল দুরুস্তই হবে না। ফাযায়েলের মাধ্যমে শুধু আমলের জযবা পয়দা হয়। সুতরাং এজতেমায়ী তা'লীমে শুধু ফাযায়েলের আলোচনা হবে। আর মাসায়েল এনফেরাদীভাবে ওলামা কেরামের কাছে শিখে নিবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, নামায-রোযা সব বিষয়েই ওলামা কেরামের শরণাপন্ন হবে।

কোটি কোটি মুসলমান বে-নামাযী হয়ে কবরে যাচ্ছে আর আমরা খুঁটিনাটি বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে আছি। এটা মোটেই সমীচীন নয়। সুতরাং যে কোন মূল্যে মুসলমানকে প্রথমে নামাযের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তারপর তারা নিজেরাই ওলামা কেরামের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নিবে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্দেশে হযরত শায়খুল হাদীছ মাওলানা জাকারিয়া (রহঃ) ফাযায়েলের যেসব কিতাব রচনা করেছেন, যাতে হেকায়েতে ছাহাবাও রয়েছে তালীমের হালকায় সেগুলোই পড়তে হবে। অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে, এ কিতাবগুলো তো বহুবার পড়া হয়েছে; এবার নতুন কিছু জানার জন্য নতুন কোন কিতাব পড়া দরকার। বস্তুতঃ নিছক 'জানা'ই আমাদের এ তালীমের উদ্দেশ্য নয়; বরং তালীমের মুখ্য উদ্দেশ্য হল; কুরআন ও হাদীছের আলোচনা থেকে 'আছর' গ্রহণ করা। যেমন, আনন্দ কিংবা দুঃখের খবরে মানুষের মনে ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তদ্রূপ কুরআন ও হাদীছের আলোচনা থেকেও যেন মনে ক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন বার বার এ হাদীছগুলো আযমতের সাথে শ্রবণ করা।

বলাবাহুল্য যে, নিছক 'জানা'র দ্বারাই মানুষ আমলের প্রতি উৎসাহিত হয় না। যদি তাই হত তাহলে মদ্যপায়ী মদ হারাম জানা সত্ত্বেও কেন মদ থেকে বিরত থাকে না? অনুরূপভাবে বে-নামাযী নামায ফরয হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও কেন নামায পড়ে না? সুতরাং বোঝা গেল, প্রকৃত ইলমের নূরই মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর তালীমের হালকায় আযমতের সাথে বসার দ্বারাই এ নূর হাসিল হয়। তাই এ হাদীস এবং ছাহেবে হাদীছের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পূর্ণ শ্রদ্ধা মনে জমিয়ে বসবে এবং বাহ্যিক

বসার পদ্ধতিও যেন শ্রদ্ধাসুলভ হয়। ওযু সহকারে খুশবু ব্যবহার করে বসলে আরও বেশী ফায়দা হওয়ার আশা করা যায়। গ্রাম্য লোকেরা এসব বিষয়ের প্রতি যত্ন নেয়ার কারণে অনেক দ্রুত আছর গ্রহণ করে এবং আমল শুরু করে দেয়।

অন্তরে যেন এ ফাযায়েলগুলোর এমন প্রভাব পড়ে যে, প্রতিটি আমলের সময়ই যেন সে ফযীলতগুলো মনে থাকে আর এসব বিষয়গুলো আলিম-গায়রে আলেম, নতুন-পুরাতন সকলের জন্যই আবশ্যক এবং মৃত্যু পর্যন্ত সকলেই এইগুলোর প্রতি মোহতাজ। আর এসবগুলো হাসিল হবে কুরআন ও হাদীছের আযমত দ্বারা।

হাদীছের তালীমে হযরত শায়খ (রহঃ) যতটুকু ব্যাখ্যা লিখেছেন ততটুকুই পড়বে; নিজে থেকে কোন আলোচনা করবে না। অবশ্য কোন জটিল বিষয় হলে সেটাকে অর্থ করে বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে। তালীম চলাকালে গাশত করবে, যাতে এলাকার লোকেরাও অংশগ্রহণ করতে পারে।

তালীমের হালকার দ্বিতীয় কাজ হল পরস্পরে কুরআন শুনানো। অন্ততঃ সুরায়ে ফাতেহাসহ কয়েকটি সূরা একে অপরকে শুনাবে, হালকা বানিয়ে বসবে। এলাকার লোকদের মাঝে অনুভূতি সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। অন্যথায় এ সামান্য সময় পূর্ণ নামায ঠিক করা মোটেই সম্ভব নয়; বরং শুধু শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ফলে তাকে তাশকীল করাও সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু জামাতের সাথীদেরকে এক ছবক দুই ছবক করে নামাযের সবকিছু শিখাতে হবে। যাতে চিল্লায় অন্তত নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়। যার যতটুকু জানা আছে সে অন্যকে শিখাবে।

দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত হল, দ্বীন শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের হলে ফেরেশতাগণ পায়ের নীচে ডানা বিছিয়ে দেন। আর দ্বীন শিক্ষা দানকারীর ফযীলত হল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল অধিবাসী, এমনকি গর্তের পিপড়া এবং সমুদ্রের মৎস্য পর্যন্ত তাদের জন্য দু'আ করে। সুতরাং যে শিখবে আর যে শিখাবে উভয়ের মাঝে আগ্রহ উদ্দীপনা থাকা উচিত।

এ হালকাতে সম্পূর্ণ তাজবীদ শেখাতে গেলে সাধারণ লোকের জন্য কঠিন হয়ে যাবে এবং তারা ঘাবড়ে যাবে। সুতরাং প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে তার

ভুল ধরিয়ে দিবে। মৌলিখ ভুলগুলো সংশোধন করে দিবে, যা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে নেয়া সম্ভব, যাতে শেখার আগ্রহ বাকী থাকে এবং নিজের ভুলের অনুভূতি জন্মায় এবং কুরআন শিক্ষা করা কঠিন মনে না হয়।

অনেক সময় ভুল সংশোধন করতে গেলে যদি কারো লজ্জা পাওয়ার সম্ভাবনা হয়, যেমন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন তাহলে কারো নাম না নিয়ে সামগ্রিকভাবে বলে দিবে। এতে এছলাহও হয়ে যাবে কেউ লজ্জাও পাবে না। ইজতেমায়ী তালীমে আত্যাহিয়্যাতু ও দোয়ায়ে কুনুত পড়বে না, কেননা এতেও মতবিরোধ রয়েছে। কালিমা তায়্যেবা, সুরা ফাতেহাসহ শুধু কয়েকটি সুরা পড়বে। আর ইনফেরাদী তালীমেও অন্যান্য জিনিসও শিখবে।

এই তালীমে ৬ নম্বরের আলোচনাও করবে। মূলতঃ ৬ নম্বর শুধু বয়ান শেখার জন্য নয়; নিজের জীবনে এ ৬ নম্বরের অনুশীলন করতে হবে। কালিমার দাওয়াত এত পরিমাণ দিবে যে, সবকিছু সরে আল্লাহর যাতের একীন মনে বসে যায় এবং সব তরীকা থেকে কামিয়াবীর একীন বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় কামিয়াবীর একীন জমে যায়। নামায এমন যত্ন সহকারে পড়বে যে, ২৪ ঘন্টার জীবন নামাযের হাকীকতের উপর বনে যায় এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হয়ে যায়। তালীমের হালকায় বসে এমন আগ্রহ জন্মাবে যে, প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে সন্ধান নিয়ে নিবে, এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা কি?

আল্লাহর যিকির এত পরিমাণ করবে যে, আল্লাহর ধ্যান অন্তরে বসে যায়। যার ফলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং সব সময় আল্লাহর পাকের নির্দেশ পালন করা সহজ হয়ে যায়।

এসব গুণগুলো অর্জন করা সত্ত্বেও অন্য মুসলমানকে নিজের চেয়ে ভাল মনে করার চেষ্টা করবে। এর ফলেই নিজের মনে তাওয়াযু (বিনয়) জন্মাবে। অপরপক্ষে যদি এসব আমলগুলো করার পর নিজের মধ্যে 'উজব্' তথা আত্মগর্ববোধ এবং নিজেকে বড় মনে করার ব্যাধি জন্মায় তাহলে সব আমল ছারখার হয়ে যাবে। এর মধ্যে সর্ব নিম্নস্তরের হল; বান্দার হক আদায় করা। তা না হলে যার হক নষ্ট করবে নিজের সব আমল তার অংশে চলে যাবে। আর ইকরাম তার চেয়েও উর্ধ্বের বিষয়।

এসব আমলগুলো দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে করবে না বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তেই করবে। অধুনা মানুষ দ্বীনের কোন কাজ করার পর লক্ষ্য করতে থাকে, পার্থিব কি স্বার্থসিদ্ধি হল। আখেরাতের কোন জযবা মানুষের মাঝে নেই। যার ফলে আজ আমলের শক্তি হারিয়ে গিয়েছে।

ছাহাবা কেরাম (রাঃ) দ্বীনের জন্য তাঁদের দুনিয়াকে কুরবানী দিতেন। ফলে তাঁদের দ্বীনের মাঝে বেশী শক্তি ছিল। কেননা, তাদের আমলের মাঝে আল্লাহর সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ়। এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, জামাতে বের হওয়ার সময় নিজের জান এবং নিজের কষ্টার্জিত মাল নিয়ে বের হবে এবং লক্ষ্য করবে দ্বীনের জন্য আমার দুনিয়ার কতটুকু কুরবানী হচ্ছে। এই কুরবানীর পরিমাণেই ইখলাস পয়দা হবে।

মোটকথা, নিজের দ্বীনকে দুনিয়া উপার্জনের উপকরণ বানাবে না; বরং আখেরাত হাসিল করার উপকরণ বানাবে। তাহলে আল্লাহ অনুগ্রহ করে দুনিয়াও দান করে দিবেন। তবে আমাদের নিয়ত দুনিয়া হবে না। আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে নিয়ত হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এসব ছাড়া দাওয়াতের আমলও শেখার বিষয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন নবী আসবেন না। হযরত ঈসা (আঃ)ও তাঁর অনুসারী হয়ে আসবেন। সুতরাং দাওয়াতের এ দায়িত্ব উম্মতকেই পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের (১০০%) শতকরা একশ' ভাগকেই দায়ী বানিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি, গ্রাম্য সাধারণ মানুষ এবং কঠোর ভাষী বেদুঈনদেরকেও দায়ী বানিয়েছেন। নবুয়তের পর সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব উম্মতের উপর অর্পণ করেছেন তা হল দাওয়াত। যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ফরয ছিল না তখন থেকে শেষ পর্যন্ত দাওয়াতের আমল চলে এসেছে। আজও প্রতিটি মানুষকে দায়ী' রূপে গড়ে তুলতে হবে।

দায়ী'র দৃষ্টান্ত ঘোষক তুল্য। আর ঘোষণাকারীর জন্য সে বিষয়ে সম্যক অবগত হওয়া আবশ্যক নয়। যতটুকু ঘোষণা দিচ্ছে ততটুকু জানাই যথেষ্ট। দাওয়াত হল যমীন তুল্য আর ঈমান শিকড় তুল্য, যার উপর দ্বীনের বৃক্ষ দাঁড়ায়। দাওয়াতের আমল দ্বারা ঈমান সুদৃঢ় হয়। তাই এর জন্য প্রত্যেকে নিজের

যাবতীয় ব্যস্ততার মধ্য হতে একবার চারটি মাস ফারেগ করুন। তারপর সাধ্যানুযায়ী বছরে চার মাস, ছয় মাস কিংবা ১ চিল্লা দিতে থাকুন। বাৎসরিক, মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক দ্বীনের খেদমতের জন্য রুটিন তৈরী করে নিন।

এটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছয় নম্বরের আলোচনা; সাথীদের মাঝে এগুলো আলোচনা করতে হবে। যাহোক, তালীমের হালকায় ফাযায়েলের কিতাব পড়া, কুরআন শুনানো ও ছয় নম্বরের আলোচনা হবে। সেই সাথে সাথীদের অন্য কোন কিছু বোঝানোর জন্য এ সময় ধীর-সুস্থিরে বোঝানো যেতে পারে। যেমন, কোন বে-উসুলী হলে ইজতেমায়ীভাবে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

দাওয়াত ও তালীমের পর তৃতীয় কাজ হল, যিকরে এলাহী। আর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ যিকির হল তেলাওয়াতে কুরআন। দৈনিক এতটুকু পরিমাণ তেলাওয়াত করার রুটিন বানিয়ে নিবে, যা দৈনিক করা সম্ভব। আর যাদের কুরআন শরীফ শিখা হয়নি তারা দৈনিক পনর বিশ মিনিট কিংবা আধা ঘন্টা কুরআন শিখার পিছনে ব্যয় করবে। তবে নামাযে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আগেই শিখে নিবে। তারপর সম্পূর্ণ কুরআন শিখার নিয়তে দৈনিক কিছু কিছু মেহনত করবে।

এ ছাড়াও মছনূন যিকির-আযকার যেমন- তৃতীয় কালিমা, দরুদ শরীফ, এস্তেগফার অন্তত দু'শ বার করে পড়বে এবং দৈনন্দিনের মছনুন দু'আগুলো যেমন- খাওয়ার আগে পরে, এস্তেঞ্জার আগে পরে, ঘুমানোর সময়, ঘুম থেকে উঠে, মসজিদে প্রবেশ করার সময়, মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এবং বাহনে আরোহণকালে, এসব সময়ের যেসব মছনূন দু'আ রয়েছে সেগুলো মুখস্থ করে আমল করার চেষ্টা করবে এবং আজীবন যেন নিজের জীবনেও এগুলো এসে যায়। বাড়ীতে পরিবার পরিজনদের মাঝেও এ সুন্নতগুলো জীবিত করতে চেষ্টা করবে। তবে এ সুন্নতগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে মুখস্থ করবে। মনগড়া সুন্নত যেন না হয়। এসব মছনূন যিকির আযকারগুলোতে অনেক নূর রয়েছে এবং এতে উম্মতের কারোও বিরোধও নেই।

তেলাওয়াত এবং মছনূন যিকির আযকার ছাড়া কেউ কোন হক্কানী পীরের মুরীদ হয়ে থাকলে নিজের শায়খের বাতানো ওযীফাও পূরণ করবে। যদি কয়েকজন পীরের মুরীদ একই জমাতে থাকে তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ

শায়খের বাতানো তরীকায় যিকির করবে। কেউ কোন বুযুর্গের সমালোচনা করবে না। উম্মতকে যে কোন উপায়ে যিকিরের উপর উঠাতে হবে।

এর পাশাপাশি একাকীত্বে এবং লোক সমাগমে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দু'আ করবে। আমাদের এ কাজ দু'আ দ্বারাই অগ্রসর হবে। সুতরাং দিনভর অক্লান্ত মেহনত করতে হবে আর একাকীত্বে অশ্রু ঝরিয়ে দু'আ করতে হবে। বলা যায় না, কার চোখের পানি আল্লাহ পছন্দ করে নেন এবং হেদায়েতের দরজা খুলে দেন।

দাওয়াত তালীম ও যিকিরের সাথে অন্যান্য ইবাদতও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে আদায় করবে। ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করার চেষ্টা করবে। 'তাকবীরে উলা' যেন না ছুটে যায় এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। নামায অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আদায় করবে। ফরয ছাড়া কাযা নামায, সুন্নত ও নফলেরও এহতেমাম করবে। ইশরাক, চাশত, আউয়াবীন তাহাজ্জুদের প্রতিও যত্নবান থাকবে।

তাবলীগের সাথীদের বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া উচিত তাহলে সারাদিনের যাবতীয় কাজে শক্তি সঞ্চারিত হবে।

رهبان بالليل و فرسان بالنهار

দিনের বেলা দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বান্দার সামনে দাঁড়াবে আর রাতের বেলা দু'আর জন্য আল্লাহর সামনে হাত উঠাবে। দিনের বেলা বান্দাদেরকে আল্লাহর কুদরতের কথা বুঝাবে আর রাতের বেলা আল্লাহর রহমতকে বান্দার দিকে আকৃষ্ট করাবে। দিনের বেলা يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ এর দৃশ্য হবে আর রাতের বেলা يا ايها المزمل -এর দৃষ্টান্ত হবে। কিন্তু নতুন সাথীদের বেলায় তাহাজ্জুদের প্রতি এমন জোর দিবে না যে, তারা বিরক্ত হয়ে পড়ে। নফলকে নফলের স্তরেই রাখতে হবে; ফরযের মর্যাদা দেয়া যাবে না। অবশ্য এমনভাবে উৎসাহিত করবে যাতে নিজে থেকেই আগ্রহী হয়। তখন নতুন সাথীদেরও জাগিয়ে দিতে কোন ক্ষতি নেই।

দাওয়াত তালীম যিকির ও ইবাদতের পাশাপাশি সাথীদের দেখমতও করবে। সাথীদের যত পরিমাণ খেদমত করা হবে ততই পরস্পরের জোড়মিল

অব্যাহত থাকবে। সুতরাং প্রত্যেক সাথীর মধ্যেই যেন খেদমতের জযবা থাকে, কারো মাঝেই যেন খেদমত পাওয়ার আগ্রহ না থাকে; তবেই জমাতে জোড়মিল সৃষ্টি হবে। অপরপক্ষে সকলেই যদি খেদমত পাওয়ার আশা করে খেদমত করার জযবা কারো মধ্যে না থাকে তখন জমাতে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হবে।

কষ্টের সময় নিজেকে পেশ করবে আর আরামের সময় অন্যকে পেশ করবে। ঐ জামাত বরকতপূর্ণ যে জামাত পরস্পরের হৃদ্যতা ও ভালবাসার সাথে সময় কাটিয়ে আসে। এর সহজ পদ্ধতি হল, প্রত্যেকে নিজেকে সকলের চেয়ে ছোট মনে করবে; তাহলে পরস্পরে জোড়মিল পয়দা হবে। আর অপরপক্ষে প্রত্যেকেই নিজেকে বড় মনে করলে পরস্পরে বিবাদ সৃষ্টি হবে। বিনয়ে জোড়মিল সৃষ্টি হয়, আর অহংকারে গড়মিল সৃষ্টি হয়।

এগুলো তো ছিল করণীয় কাজ। এছাড়া কতগুলো কাজ রয়েছে বর্জনীয়, যা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে চলতে হবে। তা হল; প্রথমতঃ 'ইশরাফ', দ্বিতীয়তঃ সওয়াল। অন্যের খাবার, পয়সা কিংবা অন্য কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করা এবং পাওয়ার আশা করা হল 'ইশরাফ'। আর মুখে চেয়ে বসলে সেটা হবে 'সওয়াল'। দায়ী কখনো সওয়ালকারী হয় না। পবিত্র কুরআনে নবীদের কথা বলা হয়েছে−

ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا على الله

কোন কিছুর প্রয়োজন হলে নামায পড়ে আল্লাহর কাছে চাইবে। মানুষের কাছে চাইবে না। এর দ্বারা দু'আর শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয়তঃ অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে। খাওয়া দাওয়া আসবাবপত্র যেন অত্যন্ত সাদাসিধা হয়। এর ফলে পারিবারিক জীবন যাপনও সাদাসিধাই হবে আর সাদাসিধা জীবন যাপন সর্বাবস্থাতেই কাম্য। এর বরকতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ঘটবে।

চতুর্থতঃ কারো জিনিস অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করবে না। অনুমতি নিলেও নিয়মমত ব্যবহার করবে এবং অপাত্রে ব্যবহার করবে না এবং তার প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করবে না। এ কয়েকটি বিষয় সম্পূর্ণ পরিহার করে চলবে।

এগুলো তো হল নিছক চেষ্টা তদ্‌বীর; অন্যথায় সবকিছু তো আল্লাহ পাকই

করবেন। তাই সাধ্যানুযায়ী মেহনত করার পর নিজের পাপ পংকিলতা ও ত্রুটির কথা স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে খুব আহাজারী করবে। শয়তান প্রথমতঃ মানুষকে মেহনত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। আর এটাই হল অবাধ্যতা। আর মেহনত করেই ফেললে তার মাঝে আত্মগর্ববোধ জন্মিয়ে দেয়। সুতরাং মেহনত করার পাশাপাশি আল্লাহর দরবারে আহাজারী করা উচিত। তাহলে আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে দ্বীন প্রসারিত করবেন বলে আশা করা যায়।

প্রত্যেক জামাত যতটুকু সময় লিখিয়েছে তা পূর্ণ না করে ফিরবে না। কম তো নয়ই বরং দু' একদিন বেশী লাগানোর চেষ্টা করবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে যে, সাথীদের প্রত্যেকেই যেন দায়ী বনে যায়। এর পদ্ধতি হল; তাদের দ্বারা গাশত, তালীম, বয়ান ইত্যাদি সব ধরনের কাজই করাবে। মাঝে মধ্যে নতুন জামাত সাথে করে তিন দিনের জন্য পৃথক করে দিবে। জামাতের দায়িত্ব মাথায় চাপলে তখন দাওয়াতের কাজ পরিষ্কার হবে। তিন দিন পর ফিরে আসলে তার কাছ থেকে পূর্ণ কারগোজারী শুনবে। এরপর সে যখন সাথে থাকবে প্রতিটি জিনিস যত্ন সহকারে শিখবে।

প্রত্যেক জামাত লক্ষ্য করবে; তাদের সাথে জামাত চালাতে পারে এমন কতজন আছে, সাথীদের সময় কেমন কাটলো, যেখানে গিয়েছে সেখান থেকে কয়টি জামাত বের হল এবং কত জায়গায় স্থানীয় কাজ আরম্ভ হল। স্বয়ং নিজের সময় কেমন কাটলো। প্রত্যেক জামাত এভাবে নিজেরাই নিজের হিসাব নিকাশ করবে।

আমাদের এ দাওয়াতের দু'টি দিক রয়েছে। হিজরত ও নুছরত। হিজরত হল নিজের পছন্দনীয় যাবতীয় বিষয়াদিকে উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়া আর নুছরত হল; নিজের এলাকায় কোন জামাত আসলে তাদের সহযোগিতা করা। তাদের কাজে এবং এলাকা থেকে জামাত বের করার ব্যাপারে সাহায্য করা। নিছক দু' এক বেলা দাওয়াত খাওয়ানোই নুছরত নয়; বরং যে মহা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসেছে সে উদ্দেশ্য সফলে তাদের সহযোগিতা করাই হল প্রকৃত নুছরত। এর দ্বারাই ইনশাআল্লাহ দ্বীনের প্রচার প্রসার লাভ হবে।

হাবশাবাসীরাও মক্কার মোহাজেরদের নুছরত করেছিল কিন্তু তারা শুধু বসবাসের জায়গা দিয়েছিল এবং একরাম করেছিল; দাওয়াতের কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেনি। ফলে হাবশায় দ্বীন প্রসার লাভ করেনি। অপরপক্ষে মদীনাবাসীরা তাদের যাবতীয় জরুরত পূরণ করার পাশাপাশি দ্বীনের মেহনতেও তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে মদীনায় দ্বীন প্রসার লাভ করেছিল।

নুছরতের আরেকটি দিক হল নিজেদের বস্তি থেকে যেসব ভাই আল্লাহর রাস্তায় আছেন তাদের দায়িত্বগুলোর খোজ-খবর নেয়া। যেমন, তার মাধ্যমে যে তালীম ও গাশত চালু ছিল তার চলে যাওয়ার পর অন্যরা সেগুলো আঞ্জাম দিবে। কিংবা সে যে মক্তবে পড়াচ্ছিল তার চলে যাওয়ার পর অন্যরা পালাক্রমে মক্তবের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, যাতে ছেলেদের পড়াশোনায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। অনুরূপভাবে নিজের স্ত্রীর মাধ্যমে তার পরিবার পরিজনের খোঁজ-খবর নিবে। তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজের স্ত্রীর মাধ্যমে সেবা শুশ্রুষার ব্যবস্থা করবে। সদাইপত্র আনার প্রয়োজন হলে এনে দিবে। এক কথায় তার পরিবার পরিজন যেন তার অনুপস্থিতি অনুভব না করে।

من خلف الغارى كمن غزا

আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত যারা বের হয়েছে তাদের খোঁজ-খবর নিবে। তবে এর উপরই ক্ষান্ত থাকবে না; বরং নিজেও হিজরত করার চেষ্টা করবে। কেননা, হিজরতই হল মূল কাজ।

لولا الهجرت لكنت امرا من الانصار

জামাত থেকে ফিরে এসে কেউ যদি সাংসারিক কিংবা কাজ কারবারে সমস্যায় আক্রান্ত হয় তাহলে তাকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং সান্ত্বনা দিবে। যাতে সে ভবিস্যতে সাহস না হারিয়ে ফেলে।

এই হেদায়েত সম্প্রতিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং বিস্তারিত দেয়া হয়ে থাকে। নিছক জামাত বের করাই যে তাদের উদ্দেশ্য এ ধারণা ভুল।

সমালোচনা- ১৭

আরেকটি প্রশ্ন প্রায় শোনা যায় যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা ফাযায়েলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, মাসায়েলের কিতাবের প্রতি মোটেই গুরুত্ব দেয় না। এ অভিযোগটিও যখন আলিমদের মুখে শুনি তখন অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়। এ কথা বাস্তব সত্য যে, তাবলীগী নেছাবে ফাযায়েলের কিতাবের প্রতি গুরুত্ব বেশী।

এজন্যই হযরত দেহলুভী (রহঃ) ইরশাদ করেনঃ ফাযায়েলের গুরুত্ব মাসায়েলের চেয়ে বেশী। ফাযায়েল দ্বারা আমল সমূহের ছওয়াবের বিশ্বাস জন্মায়। আর এটাই হল ঈমানের স্তর। এর দ্বারাই মানুষ আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। আর আমলের জন্য প্রস্তুত হলেই তো মাসায়েল জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হবে। এজন্য আমাদের দৃষ্টিতে ফাযায়েলের গুরুত্ব বেশী।

(মলফুযাতে হযরত দেহলুভী)

হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর মলফুযাত ও জীবনীতে তাদের এ মর্মে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। উপরোক্ত হেদায়েতে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে যে, মাসআলা-মাসায়েল যেহেতু বিতর্কিত তাই এজতেমায়ী তালীমে মাসআলা মাসায়েলের আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া কুরআন ও হাদীছেও এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে ফাযায়েলের আলোচনা করে যেহেন তৈরী করা হয়েছে। তারপর হুকুম আহকাম নাযিল করা হয়েছে। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক এই তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে। তাতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রথম থেকেই হালাল হারামের হুকুম আহকাম নাযিল হলে মানুষের পক্ষে তা কঠিন হয়ে পড়ত এবং তারা অস্বীকার করে বসত।

হযরত থানুভী (রহঃ) ইরশাদ করেন যে, প্রথমে আমারও এ বিষয়ে সংশয় ছিল যে, ওলামা কেরাম ওয়াজের মধ্যে আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন না কেন এবং শুধু উৎসাহমূলক আলোচনাতেই ক্ষান্ত থাকেন। এ সংশয় শুধু সাধারণ বক্তাদের উপরই নয়; বরং ওলামা কেরামদের উপরও ছিল। এমনকি আমাদের আকাবিরদের উপরও ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অভিজ্ঞতার

নিরীখে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ওয়াজের মধ্যে আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা উচিৎ নয় বিশেষতঃ বুদ্ধি ও বিবেকের এ দৈন্যতার যুগে। উৎসাহমূলক আলোচনা পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকা উচিত।

একবার লক্ষ্মৌতে বয়ান করতে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেখানে আমি হঠাৎ করে সুদ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু শ্রতাদের বোধগম্য না হওয়ায় তারা তা ঘুলিয়ে ফেলে এবং পরস্পরে মতবিরোধ শুরু করে দেয়। পরিশেষে সমাধানের জন্য পুনরায় আমার কাছে আসে। তা না করে যদি প্রয়োজন মতে কোন সুর্নিদিষ্ট মাসআলার সমাধানের জন্য আসত তাহলে আর এ ধরনের ঘুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা ছিল না। (ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

অন্য এক বক্তব্যে এ ঘটনাকেই তিনি ভিন্নভাবে আলোচনা করে পরিশেষে ইরশাদ করেন, এসব ভেবেই ওলামা কেরাম ওয়াজের মধ্যে শুধু উৎসাহমূলক আলোচনাই করে থাকেন। (হুসনুল আজীজ)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, আমার বয়ান সাধারণতঃ আশাব্যঞ্জক আলোচনাই বেশী হয়ে থাকে। ভীতিপ্রদর্শনমূলক আলোচনা কমই হয়ে থাকে। এতে আমার উদ্দেশ্য, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা গড়ে উঠুক। অবশ্য এ কথাও ভাবি যে, আশাব্যঞ্জক আলোচনা বেশী হলে গুনাহের দুঃসাহস না বেড়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা সৃষ্টি হলে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনাই নেই।

হযরত হাজী ছাহেবের পদ্ধতিও এটাই ছিল। তিনি শুধু সান্ত্বনাই প্রদান করতেন। কোন অবস্থাতেই নিরাশ হতে দিতেন না। তিনি বলতেন, আমরা হলাম ইহসান ও অনুগ্রহের বান্দা। যতদিন আরাম-আয়েশে থাকি ঈমান আক্বীদা ও নামায-রোযা সবকিছু ঠিক থাকে। যেই বিপদ এসে পড়ে তখন আর কিছু বাকী থাকে না। (হুসনুল আজীজ)

হযরত আলহাজ্জ কারী তৈয়ব ছাহেব তাঁর এক বয়ানে এ সমালোচনার বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ মানুষ অভিযোগ করে যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা শুধু ফাযায়েলেরই আলোচনা করেন; মাসায়েলের আলোচনা করেন না। অথচ দ্বীন বিশুদ্ধ হয় মাসায়েল দ্বারা। ফাযায়েল শোনা দ্বারা অবশ্য

মনের মধ্যে আগ্রহ জন্মায় কিন্তু সঠিক মাসআলা না জানা থাকলে অধিক আগ্রহে মনগড়া আমল শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে নিঃসন্দেহে মানুষ বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এর জবাব হল, প্রথমতঃ এ দাবী সম্পূর্ণ উদ্ভট ও অন্তসার শূন্য যে, এ পদ্ধতিতে মানুষ বেদআতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। বলুন তো; তাবলীগ জামাতের এ দীর্ঘ চল্লিশ বছরে এ পদ্ধতির কারণে ক'জন বিদআতে লিপ্ত হয়েছে? তবে প্রশ্ন হল মাসায়েলের আলোচনা হয় না কেন?

এর জবাব যদি এই দেয়া হয় যে, আমরা প্রথমে ফাযায়েলের আলোচনার মাধ্যমে আগ্রহ জন্মাতে চাচ্ছি তারপর মাসায়েলের আলোচনা করব; এ জবাবও ঠিক নয়। কেননা তখন প্রশ্ন হবে, তাবলীগ জামাতের চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল এখনো কি আগ্রহ জন্মিয়ে সারেনি? বরং এর সঠিক জবাব হল; তাবলীগ জামাতের লোকেরা শুধু ফাযায়েল আলোচনা করে সত্য কিন্তু মাসায়েলকে তো অস্বীকার করে না। তারা কি কখনো মাসায়েল শিখতে নিষেধ করেছে? কস্মিনকালেও নয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের কাজ করার বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন– দরস তাদরীস (অধ্যয়ন অধ্যাপনা), ওয়াজ নসীহত, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন জনে বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করে থাকে। এটাও একটি পথ গ্রহণ করা হয়েছে যে, ফাযায়েলের আলোচনার মাধ্যমে লোকদের মাঝে দ্বীনী জযবা ও আগ্রহ সৃষ্টি করেন। সুতরাং সব কাজই যে তাদের করতে হবে এমন নয়। আর না তা সম্ভব।

ধরুন; আপনিই যখন কোন কাজ আরম্ভ করেন তখন সে কাজ শুরু করার পূর্বে কিছু লক্ষ্য ও উসূল নির্ধারিত করে নেন এবং নিশ্চয়ই তাতে অন্য সব বিষয় জুড়ে নেন না। তাহলে আপনি কেন অন্য সব বিষয়কে তাতে জুড়ে নেন না।

যাহোক, কেউ সমালোচনা করলে তা শুধু শুনে যান এবং নিজের কাজ করে যান। কাজেই সব সমালোচনার জবাব হয়ে যাবে।

মোটকথা, তাবলীগ জামাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, মানুষের মাঝে দ্বীনী জযবা পয়দা করে দেয়া। তারপর মানুষ এ আগ্রহকে দ্বীনের যে কোন লাইনে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারে। অধিকন্তু দেখা গিয়েছে যে, মানুষের মাঝে যখন

কোন বিষয়ের আগ্রহ জন্মে যায় তখন সে নিজেই তা পূরণ করার জন্য সঠিক পদ্ধতি বেছে নেয় এবং যথাযথ চেষ্টা করে।

যদি আপনার মাঝে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়ে থাকে এবং মাসআলা জানার প্রয়োজন হয় আপনি ওলামা কেরামের সাথে সাক্ষাত করুন, মাদ্রাসায় আসুন এবং মাসআলা মাসায়েল জেনে নিন। তা না করে কাজেও অংশগ্রহণ করবেন না। আর অনর্থ সমালোচনা করে যাবেন এটা তো শুধু কাজ না করার বাহানা হল। যেমন, আমি বলছিলাম যে, প্রত্যেক জামাতেরই কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্ম পদ্ধতি হয়ে থাকে, তার সাথে আরো কিছু চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা মোটেই সমীচীন নয়। এ জামাতও যখন তাদের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছে সুতরাং তাদেরকে তাদের হালেই কাজ করতে দেয়া উচিত।

মোটকথা; তাবলীগের উপকারিতা দিবালোকের মত পরিষ্কার। এ জামাতের উসীলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে ধর্মীয় প্রেরণা জন্মাচ্ছে। যার ফলে অসংখ্য বিদআত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অন্যথায় এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ একমাত্র আল্লাহও তাঁর দ্বীনের উদ্দেশ্যে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে নিজের খেয়ে নিজের পরে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর এ জযবা ইতিপূর্বে কোথায় ছিল? এদের এ অকপট মেহনতের ফলাফলের প্রতি আপনার দৃষ্টি পড়ল না? আর যা তাদের দায়িত্বে নয় তা নিয়েই আপনি সমালোচনা করে বেড়াচ্ছেন। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন এটা কতটুকু যুক্তি যুক্ত।

মোটকথা, এছলাহে নফসের চারটি অংশ এবং চারটি পদ্ধতি রয়েছে। আর এ চারটিই এই তাবলীগ জামাতে রয়েছে। সৎলোকের সান্নিধ্য, যিকির ও ফিকির, আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আর আত্মসমালোচনা; এ সবই এর মধ্যে রয়েছে। আর এ চারটি জিনিসের সমষ্টির নামই হল তাবলীগী জামাত। সাধারণ মানুষের এছলাহে নফসের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন পথ হতে পারে না।

এই পদ্ধতিতে দ্বীনের ব্যাপক প্রসার লাভ হচ্ছে এবং সব দেশেই এই ডাক পৌছে যাচ্ছে। মানুষের আকীদা বিশ্বাস সংশোধিত হচ্ছে। মানুষ দ্রুত আমলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মতে জীবন যাপনের পূর্ণ চেষ্টা করছে। এই সব দেখেও অন্তত সমালোচকদের শান্ত মনে চিন্তা করা উচিৎ।

এ কাজে নিজে বেরিয়ে এর ফলাফল দেখে নিন। তখন আপনি নিজেই অনুভব করবেন যে, এ কাজ দ্বারা আপনার কি উপকার সাধিত হচ্ছে। সুতরাং আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখে নিন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইখলাসের সাথে যে-ই এ কাজে অংশগ্রহণ করবে এর আছর উপলব্ধি করবে।

এ কাজে কালিমার দাওয়াত, নামাযের মেহনত, সাথী সঙ্গীদের সাথে সুসম্পর্ক, যিকির মুহাছাবা সহ অনেক কিছুই রয়েছে। তাই এ মেহনতের উত্তম ফলাফল মানব সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অসংখ্য বদকার নেককার হয়ে যাচ্ছে। এমনকি ভ্রান্ত আক্বীদাপন্থী সঠিক পথে চলে আসছে।

তাছাড়া কাজে নামার পর সমালোচনা করলে সেটাই গ্রহণযোগ্য; বাইরে বসে সমালোচনা করলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজে নেমে সমালোচনা করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে কাজে নেমে কেউ সমালোচনা করে না। কেননা এ কাজে নামার পর এর উপকারিতা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই বুঝা গেল এসব সমালোচনা বাহিরের লোকের, যা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিতে তো সমালোচনা থেকে মাদরাসাওয়ালারাও রেহাই পায়নি। এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি। (কিয়া তাবলীগী কাম জরুরী হাঁয়)

সমালোচনা– ১৮

আরেকটি মুর্খজনোচিত সমালোচনাও শোনা যায় যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাবলীগ জামাত এক সময় তেমনি ফলপ্রসূ ছিল যেমনি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান তাবলীগ যেহেতু হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর নির্ধারিত ধারার উপর নেই তাই এখন তা গোমরাহীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এ সমালোচকদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্যঃ বর্তমান দারুল উলুম দেওবন্দ কি সেই ধারার উপর টিকে আছে, যা হযরত নানুতুবী (রহঃ) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব (রহঃ)-এর যুগে ছিল? অনুরূপভাবে মাযাহেরুল উলূম, সাহারানপুর কি এখন সেই ধারার উপর টিকে আছে যা হযরত মাওলানা আহমদ আলী ছাহেব ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাযহার ছাহেব (রহঃ)-এর যুগে ছিল। বর্তমান জমিয়াতে ওলামা হিন্দ কি সেই হালে বাকী আছে যা হযরত

শায়খুল হিন্দ (রহঃ) ও হযরত মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ সাহেবের যুগে ছিল।

আরো লক্ষ্য করুন, বর্তমান খানকাহগুলো কি সেই হালতে আছে যা হযরত হাজী সাহেব (রহঃ) ও হযরত গঙ্গুহী (রহঃ)-এর যুগে ছিল। যদি না থাকে তা হলে কি এ কথা বলে দিব যে, এসব প্রতিষ্ঠানগুলো গোমরাহীতে পরিণত হয়েগিয়েছে?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ যাতে ইরশাদ হয়েছে, আমার যুগই হল সবচে' উত্তম যুগ, তারপর পরবর্তী যুগ, তারপর পরবর্তী যুগ। তাই 'খাইরুল কুরূন' তথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই স্বর্ণ যুগ থেকে সময় যতই দূরবর্তী হতে যাচ্ছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের সেই খায়ের ও বরকত ততই হ্রাস পাচ্ছে। তাই বলে কি এখন গোটা ইসলামকে গোমরাহ বলে দিতে হবে?

মিশকাত শরীফে বুখারী শরীফের রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের বিন আদী (রহঃ) বলেন, একবার আমর হযরত আনাস (রাঃ)-এর কাছে জালেম শাসক হাজ্জাজের জুলুমের কথা অনুযোগ করলে তিনি ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে বললেন, মনে রাখবে, তোমাদের যে দিন কেটে যাচ্ছে তাই ভাল যাচ্ছে। পরবর্তী যুগ তার চেয়ে মন্দ ছাড়া ভাল আর আসছে না। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথাই শুনেছি।

হযরত যুহরী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আনাস (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে দেখতে পেলাম তিনি কাঁদছেন আর বলছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের এমন কোন জিনিস অবশিষ্ট নেই যা তোমরা পরিবর্তন করনি। এক নামাযই শুধু বাকী ছিল তাও তোমরা ধ্বংস করে দিয়েছো। (এ তথ্য দু'টি হাদীছের সারাংশ)।

বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এমন এক যুগে রয়েছো যে, আদিষ্ট বিষয়ের দশ ভাগের এক ভাগ ছেড়ে দিলেও তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর অচিরেই এমন এক যুগ আসছে যখন মানুষ আদিষ্ট বিষয়ের দশ ভাগের এক ভাগ পালন করলেও নাজাত পেয়ে যাবে। (মিশকাত)

মিশকাত শরীফে তিরমিযি শরীফের বরাতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) ইরশাদ করেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তাশরীফ আনলেন সেদিন মদীনার প্রতিটি জিনিস আলোকিত হয়েগিয়েছিল। আর যেদিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হল, সেদিন সবকিছু নূরশূন্য হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাফন করে আমরা হাতের মাটি না ঝাড়তেই আমাদের মনে এক পরিবর্তন অনুভব করলাম।

সুতরাং আকাবিরদের যুগের বরকত ও নূরসমূহ পরবর্তী যুগে তালাশ করা, অনুরূপভাবে পরবর্তীদেরকে তাদের মাপকাঠিতে মুল্যায়ন করা নিরেট বোকামী বৈ কিছুই নয়।

আমি পঞ্চাশ বছর যাবত দেখে আসছি, আকাবীরদের যেই চলে যাচ্ছেন তার সে শূন্যস্থান আর পূরণ হচ্ছে না। তাদের যুগে যেসব খায়ের ও বরকত ছিল তা পরবর্তী যুগে আর পাওয়া সম্ভব হত না।

মুফতী মাহমুদ ছাহেব তাঁর এক ব্যক্তিগত চিঠিতে এ ধরনের একটি সমালোচনার অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছেন। চিঠিটি "চশমায়ে আফতাবে" ছেপেও গেছে। এর শেষে তিনি লিখেন–

"তাবলীগ জামাত শুধু কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ইসলাহের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ দীন জীবিত করা এবং গোটা মুসলিম উম্মাহর সংস্কারের জন্য। সেই সাথে ইসলামের গণ্ডীসীমা অধিক থেকে অধিকতর প্রশস্ত করা এবং অন্যান্য জাতি সমূহকে পরখ করার জন্য যে, অজ্ঞতার কারণে যেসব ভুল জিনিস ও ভুল পরিবেশ লোকদের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

যেহেতু দাওয়াতের এ সুবিস্তৃত কাজে সব ধরনের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে এবং যথাসাধ্য প্রত্যেকেরই এছলাহ হয়ে থাকে তাই আলেম ও জাহেল, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, নতুন ও পুরাতন, অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, নেককার ও বদকার, যাকির ও গাফিল, ভদ্র ও অভদ্র, শহুরে ও গ্রাম্য, রূঢ় ও কোমল সকলকে একই মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা এবং একই পাল্লায় ওজন করে প্রশ্ন উত্থাপন করা মোটেই সমীচীন নয়।

কারো দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তার সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু সেটাকে মূলধন ধরে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়া যায় না।

আপনার রচনায় ইনশাআল্লাহ কর্মীদের মন ছোট হওয়ার কোন আশংকা নেই। কেননা তাদের মাঝে যারা আহলে ইলম রয়েছেন তারা বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের আলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝে-শুনে এ কাজ করছেন। আপনার এ অস্পষ্ট রচনায় তাদের সেসব দলীলের কোন প্রকার খুঁত সৃষ্টি করতে পারবে না। আর যারা আলিম নন তাদের সামনেও নিজেদের আমল আখলাকের পরিবর্তন ও উন্নতি পরিষ্কার। ফলে তাদের ঈমানে শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। আল্লাহ পাকের রহমত তাদের উপর নাযিল হতে থাকে। ইলম না থাকা সত্ত্বেও এসব জিনিসগুলো তাদেরকে প্রতিদিন এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) তাঁর এক বাণীতে ইরশাদ করেন "সত্য বলতে কি আমরা আমাদের মূল ধারার উপর নেই। আমাদের আকাবীরদের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁদের শুধু ব্যবহার দেখেই মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। (ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

তাহলে এবার বলুন, তিনি যখন তার পূর্বসূরীদের ধারার উপর নেই এর প্রেক্ষিতে কি আমরা এ কথা বলব যে, নাউযুবিল্লাহ খানকায়ে আশরাফিয়া হযরত থানুভী (রহঃ)-এর যুগে গোমরাহীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আমি আমার রিসালা 'আপবীতি'র প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে মাদ্রাসা ও আওকাফের ব্যাপারে আকাবীরদের কর্মধারার কয়েকটি ঘটনা লিখেছি। যার উপর আমল করা তো দূরের কথা সম্প্রতি মাদ্রাসাওয়ালাদের বোধগম্য হবে না। তাহলে কি বলে দিতে হবে যে, সমস্ত মাদ্রাসা গোমরাহীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে! অথচ মাদ্রাসার অস্তিত্ব পক্ষ বিপক্ষ সকলের দৃষ্টিতেই একান্ত আবশ্যক।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমার এ কথা মোটেই উদ্দেশ্য নয় যে, আমি তাবলীগওয়ালাদেরকে নিষ্পাপ বলছি কিংবা তাদের ভুলগুলোকে অস্বীকার করছি এবং তাদের অবৈধ পক্ষপাতিত্ব করছি।

এর আগের বিভিন্ন পেরায় আমি এ কথা একাধিক বার বলে এসেছি যে, কোন দল কিংবা প্রতিষ্ঠানই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমার

উদ্দেশ্য হল, এ সমালোচনার দ্বারা যদি প্রকৃত ইছলাহই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; কোন প্রকার অনিষ্ট সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, তাহলে সমালোচনা ইছলাহের পদ্ধতিতে হওয়া উচিত, যা বিস্তারিত উপরে আলোচিত হয়েছে।

হযরত হাকীমুল উম্মত (রহঃ) তাঁর এক বানীতে ইরশাদ করেনঃ দু' একজন ছাড়া মাদ্রাসা বিদ্বেষীদের সকলেই স্বার্থপরতায় লিপ্ত। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের উপর অভিযোগ আমারও রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা বিদ্বেষীরা অভিযোগের যে পদ্ধতি অবলম্বন করে রেখেছে প্রকৃত পদ্ধতি এটা নয়। তারা তো মাদ্রাসার শিকড় শুদ্ধ উৎপাটন করার ব্যবস্থা করেছে। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু তাদের কর্মপদ্ধতির উপর। অপরপক্ষে মাদ্রাসা বিদ্বেষীদের সাথে বিরোধ হল তারা কোন বিষয়ে সঠিক তথ্য সন্ধান না করেই মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সমালোচনা জুড়ে দেয়। শত্রুতার ও তো সীমা থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ তাদের শত্রুতা তো ছিল মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের সাথে। মাদ্রাসার সাথে তো নয়। সুতরাং এমন আচরণ করা কিংবা এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা যাতে মাদ্রাসার ক্ষতি হয় তা কতটুকু বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তা বলাই বাহুল্য। আর বিশেষ কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে পলিসি অবলম্বন করা মোটেই কৃতিত্ব নয়। এ ধরনের পলিসি আমাদেরও জানা রয়েছে। কিন্তু আমরা তা ঘৃণা করি। (ইফাযাতে ইয়াওমিয়া)

মুবাল্লেগদের সতর্ক করা এবং তাদের সংশোধন করার ব্যাপারে ইতিপূর্বে লিখে এসেছি যে, নিজামুদ্দীন থেকে জমাত রওনা হওয়ার সময় দীর্ঘ দু' ঘন্টা যাবৎ প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত হেদায়েত দিয়ে দেয়া হয়। আজ থেকে ৪২ বছর পূর্বে হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর নির্দেশে আমার রচিত ফাযায়েলে তাবলীগে কয়েকটি অধ্যায়ে মুবাল্লেগীনদের সতর্ক করা হয়েছে এবং একাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ১৩৫৭ হিজরী সালে আমার রচিত আল-ই'তেদাল' কিতাবে সমালোচকদের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে এসেছি, তা এখানে পুনরায় লিখতে গেলে কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

কিতাবের গোড়ার দিকে আমি এ কথাও বলে এসেছি যে, জামাতগুলো যখন মারকাযে ফিরে আসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাদের কারগোজারী শোনা

হয় এবং এতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন এবং সতর্ক করে দেয়া হয়। সাহারানপুর যেসব জামাত আসে তাদের কোন মুরব্বীর ত্রুটি বিচ্যুতির কথা জানতে পারলে কিংবা কোন মুবাল্লেগের ভারসাম্যতা বর্জিত আলোচনার কথা জানতে পারলে সে জামাতের এবং বক্তার নামসহ এবং সুনির্দিষ্টভাবে ভুলগুলোসহ বিস্তারিত মারকাযে লিখে পাঠিয়ে দেই এবং জামাতগুলো মারকাযে ফিরে যাওয়ার পর আমার বরাতে তাদের পাকড়াও করা হয়। অনেক সময় আমি নিজেও তাদেরকে ডেকে সতর্ক করে দেই।

এ বিষয়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে লেখার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ইচ্ছার বাইরে বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল। পরিশেষে এতদ্সংক্রান্ত হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর কয়েকটি বাণী উল্লেখ করে ক্ষান্ত করছি।

বাণী- ১

ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম এবং সবচে' গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল নিজের জীবনের হিসাব নিকাশ করা এবং নিজের দায়িত্ব পালনে কতটুকু ত্রুটি হচ্ছে তা উপলব্ধি করে সেগুলো আদায়ের ফিকির করা। তা না করে অন্যের আমলের হিসাব নিকাশ এবং অন্যের ত্রুটি গণনায় লেগে যাওয়া ইলমী অহংকারের নামান্তর, যা আহলে ইলমের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কবির ভাষায়ঃ

کار خود من کار بیگانه مکن

নিজের ফিকির কর অন্যকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

বাণী- ২

ইরশাদ করেন, আমাদের এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত গোটা দ্বীন শিক্ষা দেয়া। (অর্থাৎ ইসলামের পূর্ণ ইলমী ও আমলী নেজামের সাথে উম্মতকে সংশ্লিষ্ট করা।) এই তো হল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আর জামাতগুলোর নকল হরকত ও ঘোরাফেরা মূল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চেষ্টার ভূমিকা মাত্র। আর কালিমা ও নামাযের তালকীন-তালীম গোটা নিসাবের 'ক-খ-গ' মাত্র। আর এ কথাও পরিষ্কার যে, আমাদের জামাতগুলোর পক্ষে পূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাদের পক্ষে শুধু এতটুকুই সম্ভব যে, বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে একটি আলোড়ন ও চেতনাবোধ সৃষ্টি করে দেয়া এবং গাফেলদের মনোযোগ আকর্ষণ করে স্থানীয় দ্বীনদারদের সাথে জুড়ে দেয়ার এবং স্থানীয় ওলামা ও নেককারদেরকে এই সাধারণ বেচারাদের এছলাহের দায়িত্ব সপে দেয়ার চেষ্টা করা।

প্রত্যেক জায়গার মূল কাজ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণ লোক স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকেই অধিক ফায়দা হাসিল করতে পারে। অবশ্য এর পদ্ধতি আমাদের লোকদের কাছ থেকেই শিখতে হবে, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষাদান এবং শিক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং বেশ অভিজ্ঞতার অধিকারী।

বাণী- ৩

হযরত মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বে হযরত দেহলভী (রহঃ)-এর অসুখের সময় খোঁজ-খবর নিতে আসলেন। হযরত তাকে দেখতেই ইরশাদ করলেন-

"জীবন আমার ওষ্ঠাগত সুতরাং তুমি এখন এসে পড় তাহলে আমি জীবন লাভ করব। আমি চলে যাওয়ার পর আর কি কাজে আসবে।"

মাওলানা জাফর আহমদ ছাহেব বলেন, তাঁর এ কথায় আমার এতটুকু 'আছর' হল যে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। ইতিপূর্বে তাঁর সাথে জামাতে কিছু সময় দেয়ার ওয়াদা করেছিলাম। তিনি সেদিকে ইংগিত করে বললেন, তোমার ওয়াদার কথা মনে আছে তো? আরয করলাম, দিল্লীতে এখন বেশ গরম পড়েছে। সামনে রমজানের ছুটির পর ইনশাআল্লাহ সময় দেব।

ইরশাদ করলেন, তুমি রমজানের আশা করছ। আমি তো শাবানেরও আশা করছি না। আরয করলাম, আচ্ছা; আপনি মন খারাপ করবেন না। আমি এক্ষণি সময় দেব। এ কথা শুনে তার চেহারায় আনন্দ ফুটে উঠল এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেতে লাগলেন। তারপর অনেকক্ষণ বুকের সাথে জড়িয়ে রাখলেন এবং অনেক দু'আ দিলেন।

অতঃপর ইরশাদ করলেন, তুমি তো তাও আমার প্রতি মনোনিবেশ করেছো, অনেক ওলামা কেরাম তো দূর থেকেই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করছেন। তারপর একজন শীর্ষস্থানীয় আলেমের নাম নিয়ে বললেন যে,

তিনি সম্প্রতি তবলীগে অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তিনি আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিছুই বুঝেননি। কেননা তার সাথে আমার অদ্যাবধি সরাসরি কথা হয়নি। লোক মাধ্যমে কথা হয়েছে। লোকমাধ্যমে আমার পক্ষে পূর্ণ বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়া কিভাবে সম্ভব? তাও যদি মাধ্যম দুর্বল হয়।

সুতরাং আমার ইচ্ছা, তুমি কিছু দিন আমার কাছে থেকে যাও; তাহলে বুঝতে পারবে আমি কি চাচ্ছি। দূর থেকে বুঝা সম্ভব নয়। আমি জানি তুমি সম্প্রতি তবলীগে অংশগ্রহণ করছ এবং বিভিন্ন মজলিশে বয়ানও কারো। তোমার বয়ানে উপকারও হয়। কিন্তু আমার যাচিত তাবলীগ এটা নয়।

বাণী– ৪

একবার একটি দ্বীনী মাদ্রাসার এক ছাত্র সমাবেশে আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে কথা শুরু করেন–

আচ্ছা বলত; তোমাদের পরিচয় কি? তারপর নিজেই জবাব দেন। তোমরা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মেহমান। আর মেহমান কর্তৃক মেজবানকে কষ্ট দেয়া সাধারণ লোকের কষ্ট দেয়া অপেক্ষা অনেক জঘন্যতর। সুতরাং তোমরা যদি তালেবুল ইলম হয়ে আল্লাহর মর্জিমাফিক না চল এবং ভ্রান্ত পথের অনুসারী হও তাহলে মনে রাখবে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কষ্টদায়ক মেহমান।

বাণী– ৫

ইরশাদ করেনঃ বন্ধুগণ! এখনো কাজের সময় রয়েছে। সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন দু'টি মারাত্মক আশংকা দেখা দিবে। একটি হল সুদধী আন্দোলন (এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সমূলে উৎপাটন করা)–এর ন্যায় কুফুরের প্রচার প্রসারের প্রচেষ্টা যা সাধারণ জাহেলদের মধ্যে হবে। দ্বিতীয় আশংকা নাস্তিকতার, যা পাশ্চাত্য শাসনের সাথে সাথে আসবে। এ দু'টি গোমরাহী মহাপ্লাবনের মত আসবে। সুতরাং যা কিছু করার তার আগেই করে নাও।

বাণী– ৬

ইরশাদ করেন, আমার এ আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ তালীম ও তরবিয়তের যে পদ্ধতি আমি প্রচলিত করতে চাচ্ছি সে পদ্ধতি 'একমাত্র

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে প্রচলিত ছিল। এ পদ্ধতিতেই সাধারণত দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া হত। এ ছাড়া অন্যান্য যেসব পদ্ধতি নতুন প্রচলিত হয়েছে যেমন পুস্তক রচনা, কিতাবী তালীম ইত্যাদি, এগুলো বিশেষ প্রয়োজন সাপেক্ষে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ এখন সেগুলোকেই আসল ধরে নিয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের প্রচলিত পদ্ধতিকে বিস্মৃত করে দিয়েছে। অথচ সেটাই ছিল প্রকৃত পদ্ধতি। একমাত্র এ পদ্ধতিতেই সাধারণভাবে তারবিয়ত দেয়া সম্ভব।

বাণী– ৭

ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক যেসব প্রতিশ্রুতি দান করেছেন। নিঃসন্দেহে তা সুনিশ্চিত আর মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার নিরিখে যা কিছু কল্পনা ও পরিকল্পনা করে তা নিছক ধারণা ও অন্তসারশূন্য। কিন্তু অধুনা মানুষ তার কাল্পনিক পরিকল্পনা ও নিজস্ব পরিকল্পিত উপায় উপকরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার পিছনেই চেষ্টা সাধনা করে।

অপরপক্ষে আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি লাভের জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তা পূরণ করে সে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য ততখানি চেষ্টা করে না। এর দ্বারা বুঝা যায়, মানুষ তার কাল্পনিক উপায় উপকরণের উপর যতটুকু আস্থাশীল আল্লাহর ওয়াদার প্রতি ততখানি আস্থাশীল নয়। এ অবস্থা শুধু সাধারণ লোকেরই নয়, বরং দু' একজন ছাড়া সাধারণ বিশিষ্ট সকলেরই। আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সুনিশ্চিত ও পরিষ্কার পথ ছেড়ে দিয়ে নিজের কল্পনা প্রসূত উপায় উপকরণে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমাদের এ আন্দোলনের বিশেষ লক্ষ্য হল, মুসলমানদের জীবন থেকে এ বুনিয়াদী অনিষ্ট দূরীকরণের চেষ্টা করা এবং তাদের জীবনকে কল্পনা প্রসুত পথের পরিবর্তে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সুনিশ্চিত পথের উপর নিয়ে আসার চেষ্টা করা। আর এটাই ছিল আম্বিয়া কেরামের পদ্ধতি। তাঁরা তাদের উম্মতকে এ দাওয়াতই দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর ওয়াদার উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং ভরসা করে এর যাবতীয় শর্ত পূর্ণ করার পূর্ণ চেষ্টা করো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে তোমাদের যেমন বিশ্বাস হবে তেমনি আল্লাহর তোমাদের সাথে ব্যবহার

হবে। হাদীছে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে; انا عند ظن عبدى بي আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করবে তেমনি আমাকে পাবে।

বাণী– ৮

ইরশাদ করেন, আমাদের সকল কর্মীদের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তারা যেন জামাতে সময় লাগানোকালে ইলম ও যিকিরের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন। এলম ও যিকিরে উন্নতি ছাড়া দীনের উন্নতী সম্ভব নয়। আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ইলম ও যিকির অর্জন এবং এর পরিপূর্ণতা লাভ এ লাইনে শীর্ষস্থানীয়দের তত্ত্বাবধানে হওয়া উচিত। আম্বিয়া কেরামের ইলম ও যিকির স্বয়ং আল্লাহ পাকের তত্ত্বাবধানে হয়েছে আর সাহাবা কেরামের ইলম ও যিকির রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল। এরপর প্রত্যেক যুগের লোকদের জন্য সে যুগের আহলে ইলম ও আহলে যিকির রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধী। সুতরাং এ যুগের লোকদের ইলম ও যিকিরও বড়দের তত্ত্বাবধানেই হওয়া উচিত।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, জামাতে সময় লাগানোকালে অন্য সব ব্যস্ততা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র জামাতের কাজে ব্যস্ত থাকবে। যেমন, তাবলীগী গাশ্‌ত, ইলম ও যিকির, দ্বীনের উদ্দেশ্যে যেসব সাথীরা বাড়ী-ঘর ছেড়েছেন বিশেষভাবে তাদের এবং সাধারণভাবে অন্যান্যদের খেদমত করার মশক করা। নিয়ত বিশুদ্ধ করা, আত্মসমালোচনা করা। বার বার নিজের ইখলাস ও আত্মসমালোচনার নবায়ন করা।

অর্থাৎ, জামাতে বের হওয়ার সময় এবং বের হওয়ার পর সব সময় এ চিন্তা করতে থাকা। এ চিন্তাকে নবায়ন করা যে, আমি কি সত্যি একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে এবং সেই নিয়ামত লাভের আশায় বের হয়েছি যা দ্বীনের খেদমত, নুসরত ও দ্বীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পিছনে দানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

অর্থাৎ, বার বার নিজের মনে এ কথা বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করবে যে, আমি যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য বের হয়ে থাকি এবং আল্লাহ পাক তা কবুল করে নেন তাহলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দু'টি নিয়ামত লাভ করব, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে।

মোটকথা, আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রদত্ত যাবতীয় প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস এবং আশা মনের মাঝে বার বার বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করবে এবং এই বিশ্বাসের সাথেই যাবতীয় আমল করবে। এরই অর্থ ঈমান ও 'ইহ্‌তিসাব'। আর এটাই আমাদের যাবতীয় আমলের রূহ।

বাণী– ৯

ইরশাদ করেন, "আমাদের এ কাজের সঠিক পদ্ধতি হল, যে কোন পদক্ষেপ নেয়ার সময় যেমন, নিজে জামাতে যাওয়া, কোন জামাত পাঠানো কিংবা কারো সন্দেহ সংশয়ের জবাব দেয়ার ইচ্ছা হয় তখন সর্বপ্রথম নিজের অযোগ্যতা অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার কথা কল্পনা করে এবং আল্লাহ পাককে হাযির-নাযির ও সর্বশক্তিমান বিশ্বাস করে পূর্ণ কাকুতিমিনতির সাথে আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করবে যে,

"আয় আল্লাহ! আপনি একাধিক বার কোন প্রকার উপায় উপকরণ ছাড়াই নিছক নিজের কুদরতের উসীলায় বিরাট বিরাট কাজ সমাধা করেছেন। আয় আল্লাহ! বনী ইসরাঈলের জন্য আপনি নিছক আপনার কুদরতে সমূদ্রের মাঝে শুষ্ক পথ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য একমাত্র আপনার কুদরত ও রহমতের উসীলায় বিশাল অগ্নিকুণ্ড বাগিচায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয় আল্লাহ! আপনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ সৃষ্টি দ্বারা বিরাট বিরাট কাজ নিয়েছেন। আবাবীল পাখী দ্বারা আবরাহা বাদশার সুবিশাল হস্তি বাহিনীকে পরাস্ত করে পবিত্র কাবাঘরের হেফাযত করেছেন। আরবের মুর্খ ও উষ্ট্র-রাখালদের দ্বারা গোটা বিশ্বে দ্বীনের প্রচার প্রশার করেছেন। কায়সার ও কিসরার রাজ সিংহাসন তছনছ করে দিয়েছেন। আয় আল্লাহ! আপনার সেই চিরাচরিত সুন্নত মুতাবিক এই অধম ও অসহায়ের দ্বারাও আপনার দ্বীনের খেদমত নিন। আমি আপনার দ্বীনের যে কাজ করতে যাচ্ছি তার জন্য আপনার কাছে যে পদ্ধতি সঠিক সে পদ্ধতি অবলম্বন করার তৌফীক দান করুন এবং যেসব উপকরণের প্রয়োজন সেগুলো যুগিয়ে দিন।

আল্লাহর কাছে এই দু'আ করে কাজে লেগে যাবে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব উপকরণ পাবে সেগুলো ব্যবহার করবে। তবে পূর্ণ ভরসা থাকবে

আল্লাহর কুদরত ও সাহায্যের উপর এবং চেষ্টাতে ত্রুটি করবে না। সেই সাথে চোখের পানি ঝরিয়ে আল্লাহর সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি লাভের জন্য দু'আ করতে থাকবে; বরং আল্লাহর মদদ ও সাহায্যকেই আসল মনে করবে। আর নিজের চেষ্টাকে তার জন্য শর্ত ও পর্দা মনে করবে।"

বাণী– ১০

ইরশাদ করেন, "আমাদের এ তাবলীগের সারমর্ম হল, প্রত্যেক মুসলমান নিজের চেঁয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছ থেকে দ্বীন আহরণ করবে এবং নিজের চেয়ে কম জ্ঞানীদের মাঝে বিতরণ করবে। তবে নিম্নস্তরের লোকদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কেননা, আমরা যত পরিমাণ এই কালিমাকে অন্যের কাছে পৌঁছাবো ততই আমাদের কালিমাও পরিপূর্ণ ও নুরান্বিত হবে। আমরা যতজনকে নামাযী বানাবো ততই আমাদের নামাযেও পূর্ণতা লাভ হবে।

তাবলীগের প্রধান নীতিহল মুবাল্লিগ তাবলীগ দ্বারা নিজের পূর্ণতা লাভের নিয়ত করবে। নিজেকে অন্যদের হিদায়েতকারী মনে করবে না। কেননা, একমাত্র আল্লাহ পাকই হিদায়েতের মালিক।"

বাণী– ১১

মাওলানা আলী মিয়া হযরত দেহলুভী (রহঃ)-এর জীবনীতে লিখেন যা আমার নিজেরও জানা ছিল; বরং আমি নিজেও প্রথমে বেতন ভোগী মুবাল্লিগদের বেশ পক্ষপাতীত্ব করেছিলাম। আমার তাগিদেই প্রথমে মুবাল্লিগ রাখা হয়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, বেতনভোগী মুবাল্লিগদের অপেক্ষায় ঐসব লোকদের দ্বারাই অধিক ফায়দা হয় যারা কোন প্রকার স্বার্থ ছাড়া একমাত্র দ্বীনী জয্বা নিয়েই কাজ করেন।

হযরত আলী মিয়া বলেন, দিল্লীসহ বিভিন্ন স্থানে তাবলীগ করার জন্য কিছু দিন যাবত পাঁচজন বেতনভোগী মুবাল্লিগ রাখা হয়েছিল, যারা তাবলীগের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রায় আড়াই বছর কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা মাওলানার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়নি এবং মাওলানা এই অকর্মঠ ও রূহশূন্য কাজে বেশ বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের কাজ দ্বারা কাঙ্খিত দ্বীনী ও ইছলাহি ফলাফল হাছিল হচ্ছিল না। সেই আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছিল না যা মেওয়াতের স্বেচ্ছাসেবক নিঃস্বার্থ মুবাল্লিগদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। মাওলানা এ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এটাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে চাচ্ছিলেন। (দ্বীনী দাওয়াত)

বাণী– ১২

এক চিঠিতে হযরত দেহলুভী (রহঃ) ইরশাদ করেনঃ "তাবলীগের জন্য কোন একটি জায়গাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং অন্যান্য জায়গাগুলোকে পরের জন্য রেখে দেয়া একটি মারাত্মক রকমের বুনিয়াদি ভুল। জঘন্য ও বিষাক্ত ধারণা। কস্মিনকালেও এ ধরনের ধারণা মনে জায়গা দেয়া উচিত নয়।

হযরত আলী মিয়া এর সমর্থনে লিখেন যে, কোন একটি জায়গাকেই যদি নিজের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া হয় এবং অন্যান্য জায়গাগুলোর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ না করা হয় তাহলে অনেক সময় মারাত্মক রকমের সাহস হারিয়ে ফেলার এবং মন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা কোন কোন জায়গায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল পরিবেশ হয়ে থাকে। অপর পক্ষে জায়গার বিভিন্নতার কারণে সাহস বৃদ্ধির এবং কর্মোদ্যমের সঞ্চার হয়। (মাকাতিব)

পরিশেষে আমাদের তাবলীগের সাথীদের প্রতি একান্ত আরজ এই যে, হযরত দেহলুভী (রহঃ) ও হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর বাণী, ইরশাদ, জীবনী ও চিঠিপত্রগুলো অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পড়ুন। তাবলীগী কর্মীদের জন্য এগুলো মূল্যবান জিনিস। আর এসব উসূলগুলো যত্নসহকারে পালন করলে এ কাজে উন্নতি সাধিত হবে। যেমন, হযরত দেহলুভী (রহঃ) একাধিকবার ইরশাদ করেছেন যে, এসব উসুলগুলো যত্নসহকারে পালন করলে ইনশাআল্লাহ উন্নতির আশা করা যায়। অপরপক্ষে বে-উসুলির দ্বারা মারাত্মক রকমের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। এ বিষয়ে আমি আমার রচিত ফাযায়েলে তাবলীগে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি।

মুহাম্মদ যাকারিয়া
কান্ধলুভী
বুধবার ২৫ শে রবিউল আওওয়াল ১৩৯২ হিঃ
১০ই মে ১৯৭২ ইং

পরিশিষ্ট

হযরত হাকীমুল উম্মত থানুভী (রহঃ)-এর হিন্দুস্তানী খলীফাদের এ কাজে অংশ গ্রহণ ও মতামত লেখার সময় তাঁর পাকিস্তানী খোলাফাদের সম্পর্কে জানার জন্য সেখানকার কতক বন্ধুবরের কাছে লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। এ পুস্তিকা লেখা শেষ হওয়ার পর কয়েকজনের জবাবী পত্র এসেছে। যেহেতু এর ছাপার কাজ শেষ হয়নি। তাই পরিশিষ্ট হিসেবে তাদের পত্রগুলো সন্নিবেশিত করে দিচ্ছি।

স্নেহাস্পদ আলহাজ্জ মৌলভী এহসানুল হক সাহেব

শিক্ষক মাদ্রাসা আরাবিয়া, রাইবেণ্ড-এর

পত্র

(এক) আমি ডাঃ ইসমাঈল ছাহেবের মারফতে যে পত্র পাঠিয়ে ছিলাম তাতে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর খোলাফাদের সম্পর্কে জানিয়েছিলাম। সতর্কতা স্বরূপ পুনরায় তা লিখে পাঠাচ্ছি–

(ক) মাওলানা আব্দুস সালাম ছাহেব নও শাহরাহ দশ দিনের জন্য এখানে তশরীফ এনেছিলেন। স্থানীয় মারকায ও ইজতেমাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ছেলেকে চিল্লার জন্য পাঠিয়েছেন।

(খ-গ) মাওলানা আব্দুল গনী ছাহেব ফুলপুরী ও পীর ফখরুদ্দীন ছাহেব ঘুটকী (রহঃ) এরা উভয়ই তাবলীগের জবরদস্ত সমর্থক ছিলেন।

(ঘ) মৌলভী মকছুদুল্লাহ ছাহেব বরিশালী তো তাবলীগী জামাতে চিল্লার পর চিল্লায় অংশগ্রহণ করতেন।

(ঙ) মাওলানা নূর বখশ ছাহেব চাটগামীর দু'জন খলীফা মাওলানা আব্দুল হালীম ছাহেব ফেনী ও মাওলানা ছাইদুল হক ছাহেব হাতিয়া– এদের প্রথমজন তো এখনো জীবিত আছেন। তিনি চারমাস লাগানোর জন্য এখানে

এসেছিলেন। অধুনা তিনি তবলীগী সময় পুরা করে করাচীতে আছেন আর দ্বিতীয়জন তবলীগের জবরদস্ত মুরব্বী ছিলেন।

(চ-ছ) মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর ও মাওলানা আতহার আলী ছাহেব সিলেটী পাকিস্তান বিভক্তির পূর্বে জীবিত ছিলেন। এখনকার অবস্থা জানা নেই। এরা উভয়েই তাবলীগের বেশ সমর্থক ছিলেন।

(দুই) পুস্তিকাটির কিতাবত চলাকালীন স্নেহাস্পদ এহসান ছাহেবের একটি চিঠিসহ বেশ কয়েকটি চিঠি হস্তগত হয়। সবগুলো উল্লেখ করা দুষ্কর বিধায় স্নেহাস্পদ এহসান ছাহেবের চিঠিটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি।

আপনার চিঠি বোম্বাই, লণ্ডন, করাচী হয়ে রাইবেণ্ড যখন পৌছেছে তখন আমি সফরে ছিলাম। ফিরে আসার পর চিঠি পেয়ে ধন্য হলাম। তাতে তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়ার নির্দেশ ছিল কিন্তু কিছু বিষয় কাজীজি আব্দুল ওহাব ও মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করার ছিল। আর এরা তিনজন ছিলেন সফরে। যাহোক, এদের ফিরে আসার পর তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে চিঠি লিখে পাঠালাম।

আমাদের এখানে হযরত থানুভী (রহঃ)-এর দু'জন বিশিষ্ট খলীফা পীর ফখরুদ্দীন ছাহেব (রঃ) ও মাওলানা আব্দুল গনী ছাহেব (রহঃ) ফুলপুরী তাবলীগ জামাতের জোরদার সমর্থক ছিলেন। অন্যান্য খোলাফাদের মধ্যে মাওলানা কাজী আব্দুস সালাম সাহেব নওশাহরাহ ও মাওলানা ফকীরুল্লাহ ছাহেব পেশাওয়ার এরা এখনো জীবিত আছেন এবং তবলীগ জামাতের জোরদার সমর্থক। নিজেদের আপনজনদের এখানে পাঠিয়ে থাকেন। প্রথমজন তো এখানে এসে দশ দিন অবস্থান করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) থানভী সিলসিলার খোলাফাদের মধ্যে পীর মকছুদুল্লাহ সাহেব (রহঃ) বরিশালী বেশ তৎপরতার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। এদিকে রাইবেণ্ডেও তশরীফ এনেছিলেন।

মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব হাটহাজারী, মাওলানা আতহার আলী ছাহেব কিশোরগঞ্জ, পীরজী হুজুর ও মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ ছাহেব (হাফেজ্জী হুজুর, লালবাগ, ঢাকা) মৌখিক সমর্থন করেন। আর হযরত হাকীমুল উম্মতের

বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা নূর বখশ সাহেব (রহঃ) ফেনী-এর খলীফা মাওলানা ছাইদুল হক ছাহেবও উত্তর হাতিয়াও বেশ তৎপরতার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর আরেকজন খলীফা মাওলানা আব্দুল হালীম ছাহেব ফেনী গত বছর চার মাসের জন্য এখানে তশরীফ এনেছিলেন। এখন পথ বন্ধ থাকার কারণে করাচী অবস্থানরত আছেন।

(তিন) জনাব আলহাজ্জ মুফতী জয়নুল আবেদীন ছাহেবের পত্র

তিনি লিখেন যে, মুফতী মুহাম্মদ ছফী ছাহেব (মুদ্দযিল্লুহু) রাইবেণ্ডের এজতেমায়ে তশরীফ এনেছিলেন। মক্কী মসজিদ করাচীতেও একাধিকবার তশরীফ এনেছেন, বয়ানও করেছেন এবং তার বয়ানে লোকেরা নামও লিখিয়েছে। হযরতজী (রহঃ) (মাওলানা মুহাম্মদ ইউছুফ ছাহেব) করাচী তশরীফ আনলে হযরত মুফতী ছাহেব তাঁকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে দারুল উলূম দাওয়াত করে নিয়ে যেতেন এবং দারুল উলুমে তাঁর দ্বারা বয়ান করাতেন। আমাকেও একাধিকবার নির্দেশ করেছেন যে, বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে দারুল উলূম এসে বয়ান করো, যাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র জামাতে বেরিয়ে পড়ে।

থানভী (রহঃ)-এর আরেকজন খলীফা মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ ছাহেব (রহঃ)-এরও একই পদ্ধতি ছিল। মুলতানে যখনই তবলীগী এজতেমা হত তিনি খাইরুল মাদারেসের ছুটি দিয়ে দিতেন। হযরতজী মাওলানা এনাম সাহেবকে খাইরুল মাদারেছ দাওয়াত করে নিয়ে বয়ান করাতেন। এমনকি আমিও যখন খাইরুল মাদারেসে যেতাম আমার দ্বারা ছাত্রদের মাঝে বয়ান করাতেন এবং ছাত্ররা নামও লিখাত। খাইরুল মাদারেসের বার্ষিক জলসায় আমাকে অবশ্যই দাওয়াত করতেন এবং বয়ানও তাবলীগের প্রয়োজনীয়তার উপর করাতেন।

হযরত থানুভী (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা মুফতী মুহাম্মদ হাসান ছাহেব (রহঃ)-এর জীবদ্দশায় জামেয়া আশরাফিয়ার জলসায় আমাকে অবশ্যই যেতে হত এবং বয়ানের আলোচ্য বিষয় তাদের পক্ষ থেকেই 'তাবলীগের আবশ্যকতা' নির্ধারিত হত।

একবার নীল গম্বুজ মসজিদে হযরত মুফতী ছাহেবের ভক্তরা দাওয়াতুল

হক্বের কাজ শুরু করল। এদিকে আমাদের সাথীরা সেই মসজিদেই সাপ্তাহিক গাশত ও তালীম করে আসছিল। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করল এ পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি? আমি বললাম, এঁরা যখন একটি কাজ আরম্ভ করেছেন তোমরা অন্য কোন মসজিদে কাজ করো। তাবলীগ করাই তো উদ্দেশ্য।

যাহোক, কিছু দিন পর পুনরায় লাহোর এসে যথারীতি হযরত মুফতী ছাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। আমরে তিস্‌র' এলাকায় অবস্থানকালে তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আমি আরয করলাম, হুজুর দাওয়াত হক্বের কাজ আলহামদুলিল্লাহ শুরুহয়ে গিয়েছে। এজন্য আমি আমার সাথীদেরকে অন্যত্র কাজ করতে বলে গিয়েছি। ইরশাদ করলেন, এদেরকে বাধা না দেয়াই উচিত ছিল। কেননা ওদের প্রোগ্রাম কত দিন অব্যাহত থাকে তা কিছুই বলা যায় না। আর এরা তো নিয়মিত একটি কাজ করে আসছিল আর করবে। আমি আরয করলাম, হযরত! আল্লাহ না করুন, যদি তারা ছেড়েই দেয়; তাহলে এদের পুনরায় আরম্ভ করতে বলে দেব। তাই ঘটল, কিছুদিন পর ওদের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল এবং আমাদের সাথীরা পুনরায় কাজ আরম্ভ করল।

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সব সময়ই এদেরকে নিজেদের মুরব্বী মনে করে এসেছি এবং তারাও আমাদের সর্বদা আপন মনে করে এসেছেন। এখনও দারুল উলুম করাচী জামেয়া আশরাফিয়া ও খাইরুল মাদারেসের সাথে একই সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে।

(চার) জনাব আলহাজ্জ আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের পত্র

তিনি তার চিঠিতে লিখেন যে, মাওলানা আব্দুস্ সালাম ছাহেব হলেন নওশাহরাহ্-এর একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ। মাদ্রাসা হোসায়েন বখশ দিল্লী থেকে ফারেগ হয়েছেন। হযরত থানুভী (রহঃ) পাগড়ী বিতরণের জলসায় উপস্থিত ছিলেন। তাকে পাগড়ী পরানোর সময় যখন মুছাফাহা করলেন ; তাকে লক্ষ্য করে বললেন, দু' তিন মাস পর থানাভুন আমার কাছে চলে এসো। হযরতের কথামত তিনি থানাভুন গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু এক মাস পর তাঁর পিতার চিঠি এলো যে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট। ফিরে চলে এসো। আমার খেদমত তোমার উপর আবশ্যক।

হযরত থানুভী (রহঃ) নিজেই তাঁকে এই মর্মে চিঠি লিখতে বলে দিলেন যে, আমি যে কাজে ব্যস্ত আছি তা শেষ না করে পিতার খেদমতে যাওয়া জায়েয নেই এবং তাঁকে যেতে দিলেন না। তিন মাস পর খেলাফত দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

আজ থেকে চার পাঁচ বছর পূর্বে 'টেকস্‌লা' এলাকায় আমাদের একটি ইজতেমা হল। সেখানে তিনি তিন দিনের জন্য তশরীফ এনেছিলেন এবং সাধারণ লোকদের সাথে আত্মগোপন করে রইলেন। ফলে আমরা তার অবস্থানের কথা টেরও পাইনি। দশ দিনের জন্য নাম লিখিয়ে রাইবেণ্ড চলে এলেন। ফজরের পর এ অধমেরই বয়ান হত। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ বয়ান শুনতেন। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে মাঝে মধ্যে পেশাবের জন্য উঠে যেতেন।

সে সময়ই তাঁকে জামাতে বাইরে পাঠানো হয়েছিল। জামাতে থাকাকালীন আট দশ দিন পর এখানে রাইবেণ্ডে ডেকে আনা হত। তারপর অন্য কোন জামাতের সাথে পাঠিয়ে দেয়া হত। এর মধ্যেই তিনি চিল্লা পুরা করার ইচ্ছা করেন। তিনি নিজেকে এমনভাবে গোপন করে রাখেন যে, আমরা ধরতেও পারিনি তিনি আলেম, না সাধারণ লোক।

একবার আমি তার কাছ থেকে অতিক্রম করছিলাম কিংবা তিনিই আমার কাছে তশরীফ নিয়ে আসেন যে, তোমার সাথে নীরবে কিছু কথা বলব। আমি আরয করলাম, বলুন। তিনি তার কিছু ওযীফার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, তোমার নির্দেশ পেলে এতে আরও কিছু বাড়িয়ে নেব। আরয করলামঃ আপনি যার হাতে বায়আত হয়েছেন তাকেই বরং জিজ্ঞাসা করুন। আমি তো আলেমও নই, পীরও নই। ইরশাদ করলেন, তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে।

এ আলোচনার মাঝে তাঁর পূর্ণ বিবরণ জানতে পেরে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম যে, তিনি তো নিজেকে গোপন করতে সার্থক হয়েছেন। আর আমরা তাকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছি। তারপর ইরশাদ করলেন, আমি তোমার সব ক'টি বয়ান আগাগোড়া শুনেছি। আমার দু'টি ছেলে দাওরা ফারেগ। তাদেরকে তারবিয়তের জন্য তোমার কাছে পাঠিয়ে দিব। আমি আরয করলাম। অবশ্যই

পাঠিয়ে দিন। সেই সাথে এই দু'আও করুন আল্লাহ পাক যেন তাদের দ্বারা আমাকে উপকৃত করেন। ইরশাদ করলেন, আরে বলো না, ওদের ঝোঁক হয়ে পড়েছে কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রতি। কিছু দিন তোমার কাছে কাটালে ইনশাআল্লাহ ওদের বেশ ফায়দা হবে।

তার মসজিদেই প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এদিকে দু' তিন সপ্তাহ পূর্বে আমি নওশাহরাহ গিয়েছিলাম। সাক্ষাতের জন্য তার কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি ছিলেন না। আমি জামাতে ফিরে এলাম। তিনি মাগরিবের নামায এখানে এসেই পড়লেন এবং এ বান্দার বয়ানে আগাগোড়া বসে রইলেন। আমরা টের পেলে অবশ্য তাকেই বয়ান করার জন্য আরয করতাম। এশার পর সাক্ষাত হয় এবং খাওয়া দাওয়া এক সাথেই হয়। তারপর তিনি চলে যান।

তার শুধু একটি বিষয়ে অভিযোগ ছিল যে, শুক্রবার দিন জামাতগুলোকে এমন সব এলাকায়ও পাঠিয়ে দেয়া হয় যেখানে জুমার নামায হয় না। এতে জুমার নামাযের গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয়। তার এ অভিযোগের পর আমরা শুক্রবার দিনের পরিবর্তে বৃহস্পতিবার দিন জামাত রওনা করার সিদ্ধান্ত নেই।

এসব বিস্তারিত তথ্য এজন্য লিখেছি যে, তিনি দীর্ঘদিন আমাদের এখানেও কাটিয়েছেন, জামাতের সাথে বাইরেও গিয়েছেন, সেই সাথে তিনি কঠোর সমালোচকও বটে।

ভরপুর মজলিশেও বক্তাকে ভুল ধরিয়ে দিতে কারও তোয়াক্কা করতেন না। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে তিনি আমাদের কোন বিষয়ে সমালোচনা করেননি।

গত বছর পাহাড়ী অঞ্চলে জামাতের সাথে এক কষ্টকর সফরেও তিনি গিয়েছিলেন। একবার শুধু আমার অনুরোধে এক ইজতেমায়েও অংশগ্রহণ করেন।

ইতিপূর্বেও আমি একাধিকবার বলে এসেছি যে, নিজামুদ্দীনের হযরতদের এসব সমালোচনার জবাব দেয়ার না তাদের ফুরসত আছে আর না তাদের জন্য এদিকে মনোনিবেশ করা উচিত। অবশ্য অন্যান্য ওলামা কেরাম এসব সমালোচনার কলমে ও কালামে বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। বিশেষত হযরত

আলহাজ্জ কারী মুহাম্মদ তৈয়ব ছাহেব (রহঃ), মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী ছাহেব, আলহাজ্জ মুফতী মাহমুদুল হাসান গঙ্গুহী ছাহেব (রহঃ) প্রমুখ। তাদের দু' একটি আলোচনা এ পুস্তিকাটিতেও গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ বক্তব্য "কেয়া তবলীগী কাম জরুরী হাঁয়" কিতাবে বিস্তারিত সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই কিতাবের পরিশিষ্টে আল-ফুরকান থেকে মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী ছাহেবের একটি নিবন্ধ উদ্ধৃত করে নিবন্ধটি এখানেই ক্ষান্ত করছি।

তাবলীগ জামাত ও কিছু সমালোচনা

রচনায় ঃ মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নোমানী

আল-ফুরকান জিলহজ্জ ১৩ ৭৯ হিজরী

কয়েক মাস পূর্বে বোম্বাইয়ের জনৈক আলিম আমার নামে লিখা তার এক চিঠিতে তাবলীগী জামাত ও তার কর্মধারা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ লিখে পাঠিয়েছেন। ঘটনাচক্রে গত শাওওয়াল মাসে এক সফরে তার জবাব লেখার সুযোগ হয়। ঐ সফরেই কতক তাবলীগী বন্ধুবরের কাছে জানতে পারলাম যে এখানেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে এ ধরনের সমালোচনা বিস্তার লাভ করছে। তাই এ জবাবটি সাধারণভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

মুহাম্মদ মনজুর নোমানী
(আফাল্লাহু আনহু)

শ্রদ্ধেয় জনাব

বাদ সালাম মছনুন। আশা করি আল্লাহ ভাল রেখেছেন।

আপনার চিঠির জবাব লিখতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেল। আমার অনেকটা অভ্যাসের মত হয়ে গিয়েছে যে, দীর্ঘ জবাব লিখতে হবে এমন চিঠিগুলোর জবাব লিখতে সময় সুযোগের অপেক্ষা করতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ; বরং অনেক সময় কয়েক মাস বিলম্বিত হয়ে যায়। আপনার চিঠির ব্যাপারেও তাই হয়েছে। এ মুহূর্তে সফরে ট্রেণে বসে আপনার চিঠির জবাব লিখছি। হয়ত আপনি অপেক্ষায় বেশ বিরক্ত হচ্ছিলেন। আশা করি অপারগ মনে করে ক্ষমা করে দিবেন।

আপনি তাবলীগ জামাত এবং তার কর্মধারা সম্পর্কে কিছু অভিযোগ অনুযোগ ও সংশোধন লিখে পাঠিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আরয হল, আপনি আমাকে জামাতের একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা এবং জিম্মাদার মনে করেই আমাকে লিখেছেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র বিনয় নয়; বরং বাস্তব সত্য যে, আমি সে স্তরের ব্যক্তি নই। যদিও আমিও মৌলিকভাবে এ কাজকে অত্যন্ত মোবারক ও মকবুল কাজ মনে করি এবং মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু পরিস্থিতি ও নিজস্ব ব্যস্ততার কারণে এ কাজে খুব কম সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়। আর

যেহেতু এ কাজ সম্পূর্ণ 'আমলী'; এতে কোন পদ কিংবা চেয়ার নেই। তাই আমি এ জামাতের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে পরিগণিত হওয়ারও যোগ্য নই। সুতরাং আপনার কিংবা অন্য কারো যদি এ কাজ সম্পর্কে কোন একনিষ্ঠ পরামর্শ কিংবা কোন সংশোধনের ইচ্ছা হয় তাহলে এ কাজের মূল মারকাজ 'নিযামুদ্দীন' লিখা উচিত; বরং তার চেয়েও ভাল। এ কাজের প্রাণকেন্দ্র হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে সরাসরি মৌখিক আলোচনা করা।

তবুও যেহেতু এ জামাতের কর্মকর্তাদের এবং তাঁদের চিন্তাধারার সাথে বেশ পরিচিত। তাই আপনার এ চিঠির নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে কয়েকটি কথা আরজ করছি।

আপনার চিঠি থেকে অনুভূত হয় যে, এ কাজের হাকীকত সম্পর্কে আপনার আদৌ ধারণা নেই; বরং নিছক তাবলীগ শব্দটি থেকে আপনি যে চিত্র কল্পনা করছেন তারই ভিত্তিতে এ মত ও পরামর্শ পেশ করেছেন। এ জন্যই দেখা যায় আপনার বক্তব্যের অধিকাংশ বিষয়ই মূল কাজের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই। 'দাখেলী' ও 'খারেজী' তাবলীগ নামে যে দীর্ঘ আলোচনাটি আপনি টেনেছেন তা এ বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

বস্তুতঃ আমার মতে একাজের জন্য তাবলীগ শব্দটি এবং এ কাজের কর্মীদের জন্য তাবলীগ জামাত শব্দটি[১] অনেক দ্বিধা-সংশয়ের মূল উৎস। তাবলীগ শব্দটি থেকে মানুষের ভ্রম হয় যে, এটি ওয়াজ-নসীহতের একটি আন্দোলন। আর 'তাবলীগ জামাত' হলো ওয়াজ-নসীহতকারী একটি দল। তাই তাদের ধারণায় এ জামাতের প্রতিটি সদস্যের জন্য ওয়াজ-নসীহতের জন্য আবশ্যক এতটুকু জ্ঞান অপরিহার্য এবং কর্মক্ষেত্রেও তাকে উল্লেখযোগ্য ত্রুটিমুক্ত

টীকা

(১) আমি হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পুরাতন বন্ধুর সূত্রে হযরতের এ বক্তব্য শুনেছি যে, এ কাজের নাম 'তাবলীগ' কিংবা 'তাবলীগ জামাত' আমি রাখিনি; বরং এ বিষয়ে কখনো চিন্তাও করিনি। নিজে নিজেই এ নাম প্রচলিত হয়ে গিয়েছে এবং এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, অনেক সময় আমি নিজেও এ নাম নিয়ে থাকি।

হতে হবে। তারপর যখন তাঁরা লক্ষ্য করতে পান এ জামাতে এমন লোকও রয়েছে যারা বিশুদ্ধভাবে ওজুও করতে জানে না। এমনকি যাদের জাহেরী সুরতও সুন্নত পরিপন্থী। তখন স্বভাবতই তাদের মনে জটিল সংশয়ের উদ্রেক হয়। অনুরূপভাবে বাড়ী-ঘর ছেড়ে দীর্ঘ সফরের জন্য তাবলীগ জামাতের পীড়াপিড়ী থেকেও তাদের এ সংশয়ের উদ্রেক হয় যে, যদি শুধু নসীহত করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো আশেপাশের এলাকাতেই বহুলোক রয়েছে তাদেরকে ছেড়ে এ দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করার কি হেতু? এবং অনর্থ গাড়ীঘোড়ার যাতায়াতে আল্লাহর বান্দাদের পয়সা খরচ করার কারণই বা কি?

মোটকথা, এ ধরনের প্রশ্ন শুধু এজন্যই সৃষ্টি হয় যে, তাবলীগ জামাতের এ আন্দোলনকে নিছক ওয়াজ-নসীহত মনে করা হয়। অথচ প্রকৃত বিষয় এই যে, এখানে তাবলীগ অর্থ একটি বিশেষ কর্মধারা অর্থাৎ দ্বীন ও দাওয়াতের বিশেষ পরিবেশে বিশেষ কতগুলো উসূলের সাথে বিশেষ কতগুলো আমলের পাবন্দীর সাথে বিশেষ প্রোগ্রাম মুতাবেক জীবন পরিচালনা করা। যাতে ঈমানী হালতে উন্নতি সাধিত হয়। দ্বীনের সাথে সম্পর্ক এবং ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং আমল ও আখলাকের কিছুটা সংস্কার সাধিত হয় এবং দ্বীনের জন্য জান ও মাল কুরবান করার অভ্যাস হয়।

মোটকথা, এই বিশেষ আমলী প্রোগ্রামই হল 'তাবলীগ'। এ জন্য এলেম আমল যত কমই হোক না কেন প্রত্যেক মুসলমানকেই এ কাজের দাওয়াত দেয়া হয়; বরং যথাসম্ভব টেনে আনার চেষ্টা করা হয় এবং সাথে নিয়ে নেয়ার জন্য কোন প্রকার শর্তারোপ করা হয় না; বরং এই আশায় সাথে নিয়ে নেয়া হয় যে, জামাতের পরিবেশে এসে ইনশাআল্লাহ তার মাঝে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং প্রকৃত হেদায়েত দানকারী ও মানুষের মনের পরিবর্তন সাধনকারী আমাদের সকলের উপর অনুগ্রহ করবেন। এজন্যই দেখা যায়, জামাতের মধ্যে সব ধরনের এবং সব শ্রেণীর লোকই রয়েছে।

অবশ্য আপনার এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, জামাতের মধ্যে অনেক সময় এ ভুল হয়ে থাকে যে, সাধারণ মাজমায়ে অনেক সময় এমন ব্যক্তিও বয়ান করতে দাঁড়িয়ে যান, যিনি বয়ান করার যোগ্য নন; বরং এ কাজ সম্পর্কেও তার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। অধিকন্তু তিনি কথা বলার সময় নিজের জ্ঞানের পরিধির

প্রতিও লক্ষ্য রাখে না। এ বিষয়টিকে আপনি যেমন ভুল বলে সনাক্ত করছেন জামাতের কর্মকর্তারাও এটিকে ভুল এবং এর সংশোধন আবশ্যক মনে করেন।

জামাতগুলো রওনা হওয়ার সময় যে হেদায়েত দিয়ে দেয়া হয়, তাতে এ বিষয়ে হেদায়েত দেয়া হয় যে, আলোচনা কে করবে এবং কি ধরনের করবে। এ হেদায়েতগুলো যত্ন সহকারে পালিত হলে এ ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু বাস্তব সত্য যে, এ ধরনের ভুল প্রচুর হয়ে থাকে। এ কাজের কর্মকর্তাদের জন্য এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে চিন্তা ও লক্ষ্য করার বিষয়।

আমার মতে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মৌখিক হেদায়েতের পাশাপাশি লিখিত আকারে দিয়ে দিলে এ ধরনের ভুলের সংখ্যা অনেক লাঘব পাবে বলে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায়।

অতঃপর আপনার চিঠির সর্বশেষ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আরয করছি। আপনি লিখেছেনঃ তাবলীগ জামাতের লোকেরা দ্বীনী মাদারেস এবং আহলে মাদারেসের বিরোধিতা করে থাকেন এবং তাবলীগ জামাতে যারা অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন মাদ্রাসাগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক গৌণ হয়ে যায়।

বলাবাহুল্য যে, মন্তব্যটি একেবারেই স্বাভাবিক নয়। আমার ধারণা এ স্পর্শকাতর মন্তব্য করার পূর্বে এর সত্যাসত্য সম্পর্কে যতটুকু যাচাই করা আবশ্যক ছিল আপনি তা করেননি। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে এ মন্তব্য করে থাকেন তাহলে অসম্ভব কিছু নয়। আমি এই কেবল আরয করে আসলাম যে, বর্তমান মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্ব শ্রেণীর এবং সবধরনের মনমানসিকতার লোক এখানে অংশগ্রহণ করে কিন্তু ঢালাওভাবে এ কথা বলে দেয়া যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা মাদ্রাসার বিরোধিতা করে-নিছক বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

আপনার এতটুকু চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এ কাজের সাথে জড়িত এমন বহু লোক আছেন যাঁরা নিজেরাই বহু মাদ্রাসার পরিচালনা করেন কিংবা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এ কাজের প্রাণকেন্দ্র এবং সবচে' বড় যিম্মাদার হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেবও একটি মাদ্রাসা 'কাশেফুল উলুম'-এর পরিচালনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন এবং নিজেও তাতে দরস দান করছেন। তার

একান্ত আপনজন মাওলানা এনামুল হাসান ছাহেব ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ছাহেবেরও একই অবস্থা। আমাকেও আপনি এ জামাতের সাথে জড়িত মনে করেন। সেই সাথে মাদ্রাসার সাথে আমার সম্পর্কের কথা আপনার অজানা নেই। আমি নিজেও দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিশে শুরার সদস্য। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার সাথে আমার একই সম্পর্ক, বরং কিছু দিন যাবৎ আমি এখানে অধ্যাপনার দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছি। এ ধরনের আরও বহুলোক সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন, যারা একই সাথে তাবলীগ জামাতের সাথেও জড়িত এবং মাদ্রাসার সাথেও জড়িত। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে ঢালাওভাবে এ মন্তব্য করে দেয়া যে, তাবলীগ জামাতের লোকেরা মাদ্রাসা বিদ্বেষী কতটুকু ভুল এবং উদ্ভট তা বলাই বাহুল্য।

আমার দৃষ্টিতে প্রকৃত বিষয় হল যে, অনেক এমন লোকও তাবলীগ জামাতে অংশগ্রহণ করেন যারা আগে থেকেই কোন কারণবশতঃ মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসাওয়ালাদের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিল। এ ধরনের লোক থেকে মাঝে মধ্যে এ ধরনের মন্তব্য বেরিয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে, হয়ত সে ব্যক্তি দ্বীন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও উদাসীন ছিল তাবলীগ জামাতের উসীলায় কিছুটা দ্বীনের আলো পেয়েছে ফলে সে এটাকেই একমাত্র দ্বীনী কাজ এবং দ্বীনী খেদমত মনে করে। অতঃপর যখন সে দেখতে পায় যে, দ্বীনের খেদমতে সবচে' বেশী দায়িত্ব তাদের উপর ছিল এরূপ অনেক ওলামা কেরাম ও আহলে মাদারিস এ কাজে অংশগ্রহণ করছেন না, তখন সে নিজের জ্ঞানের স্বল্পতা ও তারবিয়ত বঞ্চিত হেতু তাঁদের উপর সমালোচনা ও অভিযোগ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু আমি যতটুকু জেনেছি, যতটুকু দেখেছি তার ভিত্তিতে পূর্ণ নিশ্চিতির সাথে বলতে পারি এবং বলি যে, এ ধরনের লোকদের এ কাজের সাথে যত বেশী সম্পর্ক গভীর হতে থাকে এবং মূল কর্মকর্তা ও জিম্মাদারদের সাথে যতবেশী মেলামেশা হয়, সে অনুযায়ী তাদের এ ভুলের সংশোধন হতে থাকে। অবশ্য এখানে অন্যান্য ইলমী ও আমলী ত্রুটিগুলোর মত এ ত্রুটির সংশোধনের জন্য প্রতিবাদ ও সমালোচনার পন্থা অবলম্বন করা হয় না; বরং নিজস্ব ধারায় তাদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়, যা আল্লাহর মেহেরবানীতে অধিকাংশই ফলপ্রসূ হয়।

আমি এমন অনেকের সম্পর্কে জানি যারা প্রথমে মাদ্রাসা ও মাদ্রাসাওয়ালাদের প্রতি অসম্ভব বিতৃষ্ণ ও ঘোর সমালোচক ছিল, কিন্তু এ কাজের সাথে এবং নিজামুদ্দীনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির পর তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং মাদ্রাসাগুলোর মূল্যায়ন করতে শিখেছে, মাদ্রাসার খাদেম হয়ে গিয়েছে।

আমি নিজে হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-কে দেখেছি তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করতেন যে, তার ভক্ত ও অনুরক্তদের ওলামা কেরাম ও মাদ্রাসাগুলোর সাথে ভক্তিপূর্ণ ও সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। হযরত মাওলানা ইউছুফ ছাহেবকেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায়।

আপনার তো জানার কথা নয়, তবে আমি বলছি শুনুন যে; প্রতি মাসে মাওলানার কাছে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর নতুন নতুন অসংখ্য লোক ও জামাত এসে থাকে। আর তার নিয়মিত রুটিন হল এদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গকে তিনি যথাসম্ভব দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবীরদের জেয়ারতের জন্য এবং সেখানকার ইলমী মারকাযগুলো পরিদর্শন করার জন্য পাঠিয়ে থাকেন।

এভাবে তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার শত শত মানুষ আমাদের ইলমী মারকাযগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হচ্ছে এবং এগুলোর প্রতি আযমত ও আমাদের আকাবীরদের প্রতি শ্রদ্ধা মনে নিয়ে নিজ এলাকায় ফিরছে।

এভাবে তাবলীগ জমাত এসব ইলমী মারকাযগুলো এবং তার বিশুদ্ধ চিন্তাধারার এমন এক পরিপূর্ণ ও নীরব খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন যা কোন প্রচেষ্টার বিনিময়েই হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্বয়ং হযরত মাওলানা ইউছুফ সাহেব (রহঃ) দেওবন্দ ও সাহারানপুরের আকাবীরদের সাথে যে গভীর সম্পর্ক রাখেন এবং এ বিষয়ে তার যে কর্মধারা তা জানার পর তার ভক্ত ও অনুরক্তদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব মাদারেস ও আহলে মাদারেসদের বিরোধিতা করা?

তাছাড়া এই তাবলীগ জামাতের উসীলায় মাদ্রাসাগুলোর জন্য সঠিকভাবে

যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে সকলেরই উপলব্ধি হওয়া উচিত। আমার বুঝে আসে না, আপনার মত ব্যক্তিত্বের এ উপলব্ধি কিভাবে হয় না। আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এ তাবলীগ জামাতের উসীলায় আমাদের মাদ্রাসাগুলো ঠিক এমনি উপকৃত হচ্ছে যেমন উপকৃত হয় ক্ষেতখামার ও বাগবাগিচা বৃষ্টির পানি ও অনুকূল বাতাসের দ্বারা। আমি এমন শত শত ব্যক্তি বরং বহু এলাকা সম্পর্কে বলতে পারবো যাদের আমাদের দ্বীনী মাদারেসগুলো এবং আমাদের আকাবীরদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। অতঃপর তাবলীগ জামাতের আনাগোনায় তাদের মাঝে ধর্মীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মাধ্যমেই আমাদের দ্বীনী মাদারেস ও আমাদের আকাবীরদের দ্বীনী খেদমতসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয় এবং সেসব এলাকা থেকে ইলম পিপাসু তালেবুল ইলমও আসতে আরম্ভ করে এবং দ্বীনী মাদারেসগুলোর খেদমতও শুরু হয়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করছি যে, হিন্দুস্তানে আমাদের দ্বীনী মাদারেসগুলো কোলকাতা ও বোম্বাইয়ের আহলে খায়েরদের থেকেই সবচে' বেশী সহযোগিতা পাচ্ছে। আমি নিছক অনুমানভিত্তিক নয় বরং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বলতে পারি যে, এসব এলাকাগুলো থেকে তাবলীগ জামাতের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে যতটুকু সহযোগিতা দ্বীনী মাদারেসে আসত এখন তারচে' কয়েকগুণ বেশী আসে। আহলে মাদারেসদের অনেকেই হয়ত জানবেন দ্বীনী মাদারেসের এ খেদমতের সাথে তাবলীগ জামাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গই বেশী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে আমার ও আপনার মত লোকদের চিন্তা করার বিষয় যে বর্তমান এমন এক সঙকটময় মুহূর্তে যখন ধর্মীয় মাদ্রাসাগুলো এমন সব দ্বীন দরিদ্র পরিবারবর্গের ছাত্র দ্বারাই পরিপূর্ণ যাদের স্কুল কলেজের খরচ বহন করার সামার্থ্য নেই। এমনকি আমরাও যারা যা কিছু পেয়েছি এই মাদ্রাসাগুলো থেকেই পেয়েছি। নিজেদের সন্তানদের আয় উপার্জন করার জন্য স্কুল কলেজে পাঠাতে আরম্ভ করেছি এমন সংকটময় মুহূর্তে এই তবলীগী কাজের উসীলায় সন্তান সন্ততিদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য ইউরোপ আমেরিকায় পাঠানোর ইচ্ছা ছিল এবং পূর্ণ সামর্থ্যও ছিল এমন বহুলোক তাদের সন্তানদের স্কুল কলেজ থেকে

বের করে মাদ্রাসায় নিয়ে আসছেন।

এসবগুলো কথাকে সামনে রেখে একটু ভেবে দেখুন তো মাদ্রাসা সম্পর্কে তাবলীগী ভাইদের বিরুদ্ধে এ মন্তব্য কতটুকু অন্তঃসারশূন্য।

তবে আমি মোটেই এ কথা বলছি না যে, তারা ফেরেশতা এবং তাদের ভুলত্রুটি নেই। নিঃসন্দেহে এ কাজে অনেক ভুলত্রুটি হচ্ছে এবং এ কাজের সাথে জড়িত অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক রয়েছে। এ কাজের ধারাই এমন যে, মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ)-এর বক্তব্য মতে এতো ধোপাখানা। এতে নোংরা অপবিত্র সব ধরনের কাপড়ই রয়েছে।

কিন্তু যে ধরনের অভিযোগ এবং যে পদ্ধতিতে আপনি করেছেন তা আমার দৃষ্টিতে মোটেই সংগত নয়। আমার দৃষ্টিতে যেসব ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তা কর্মকর্তাদের আমার সাধ্যানুযায়ী সতর্ক করে থাকি। অবশ্য কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যা বাহির থেকে ভুল মনে হলেও যারা কাজের সাথে জড়িত এবং এ কাজের নীতি ও ধারার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাদের দৃষ্টিতে সেগুলো ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। এহেন পরিস্থিতিতে নিজের মতামত পেশ করার পর এ কাজের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও নৈতিকতার উপর ভরসা করা উচিত। পূর্বেও বলে এসেছি, এ প্রসঙ্গে আপনার কিছু লিখতে হলে দিল্লীর মারকাযে লিখুন। আমাকে সম্পূর্ণ অপারগ মনে করুন। ওয়াস্‌সালাম

মুহাম্মদ মনজুর নোমানী

(আফাল্লাহু আনহু)